শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য

[প্রথম খণ্ড]

ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৫৭

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর

দিলীপকুমার চৌধুরী

সরস্বতী প্রেস

১২ পটুয়াটোলা লেন,

কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী

খালেদ চৌধুরী

ওঁ

উৎসর্গ

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের

স্মরণে।

একদা রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে তাঁর দর্শনলাভ

করেছিলাম, যাঁর আশীর্বাদে, সেই পরম

শ্রদ্ধেয় স্বামী পুণ্যানন্দজী

এবং

যাঁদের সঙ্গে সেই মহাসাধকের চরণস্পর্শের সৌভাগ্য,

আমার বাবা ও মাকে।

মঙ্গলাচরণ

বর্তমান ভারতের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব জাতীয় জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যুগে যুগে বুদ্ধ, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ চিন্তানায়কগণের প্রভাবে আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাস বিবর্তিত হয়েছে। ভারতের সমগ্র অতীত ইতিহাসের আধ্যাত্মিকতা পুঞ্জীভূত আকারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাধ্যমে নবভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে। আমাদের জীবনে, মননে, আমাদের ভাষায়, কল্পনায়, আমাদের বিশ্বাসে ও আদর্শে তাঁর প্রভাব যে কতখানি সেকথা আমরা সব সময় ভেবে দেখি না।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষাবিভাগের অধ্যাপক ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ এর আগে তাঁর 'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য' গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত অনালোচিত এক মহান প্রতিভার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাংলা সাহিত্যে স্বামীজীর দানের বিস্তৃত ও গভীর সূক্ষ্মদর্শী সমালোচনার কাজ সম্পন্ন করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি বিবেকানন্দ-মানসের মূল উৎস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীসংগ্রহ অবলম্বনে বাংলাসাহিত্যের আর এক বিশাল ও বিস্ময়কর অধ্যায়ের পরিচয়দানে ব্রতী। আধুনিক বাঙালীর ভাষায় ও ভাবনায় এ দুই মহামানবের প্রভাব সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনার দ্বারা জাতীয়-জীবনের মূল সুরটি আমাদের অন্তরে ধ্বনিত হোক—শ্রীভগবানের কাছে এই আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন

২৪. ১.৫৭ উপাচার্য,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা সাহিত্য

বিশ্বসাহিত্যে বাণীই প্রথম, রচনা দ্বিতীয়। বাণী ও রচনা—এ দুয়ের মধ্যে মিল ও অমিল দুইই আছে। মুখের কথা মাত্রেই বাণী নয়। যখন উপলব্ধির তাৎপর্য বা সত্যের পরম প্রকাশ আমাদের প্রতিদিনের ভাষাকেই এক নূতন ব্যঞ্জনায় মহিমান্বিত করে, তখনই তা বাণী। সে বাণী মুখের কথা বা লেখার ভাষা—দুভাবেই দেখা দিতে পারে। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি—সবই একদিন মুখে মুখে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বেদ উপনিষদেই আমাদের সভ্যতার প্রথম বাণীরূপ; রামায়ণ-মহাভারতে সমগ্র জীবনকাহিনীর ভিত্তিতে জাতির অন্তরতম বাণীর রূপায়ণ; প্রথমে এরা সব মুখে মুখে সৃষ্ট হলেও আজ তারা রচনাধর্মী। অবশেষে লিখিতরূপের কারিগরীতে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্যে, পদ্যে এবং গদ্যে সাহিত্যের বহুধাবিস্তৃতি।

কথা আমরা সকলেই বলি, কিন্তু সে যখন আপন বৈশিষ্ট্যে, দীপ্তিতে ও গভীরতায় আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, তখন সে কথার সংগ্রহ রাখতে ইচ্ছে হয়। নিজেদের গোষ্ঠীর বা কালের অনুভূত সত্য ও আনন্দকে উত্তরকালে ছড়িয়ে দেওয়া এমন সংগ্রহের উদ্দেশ্য। সক্রেটিস্, ডঃ জনসন, গোটে, শ্রীরামকৃষ্ণ—এঁদের কথোপকথন তাই যোগাজনের দ্বারা গ্রথিত হয়ে আজ বিশ্বমানবের উত্তরাধিকার। সব সময় এমন মহামানবের সংলাপ সংগ্রহকারী অনুরাগী দেখা যায় না। ফলে বিদ্যাসাগর বা রবীন্দ্রনাথের কথনসম্পদ পেয়েছি অতি সামান্য। কিন্তু ইতিহাসের অমর ব্যক্তিত্ব যে কয়জনার উক্তিসংগ্রহ সম্ভব হয়েছে, তাও কম বিস্ময়কর নয়।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কথা থেকে লেখা। অবশ্য এমন লেখকও সম্ভব যাঁর ব্যক্তিত্ব লেখনীমুখে যতটা প্রকাশিত, প্রতিদিনের আলাপচারীতে ততটা নয়। আবার এমন প্রতিভাও রয়েছেন যাঁদের কথননৈপুণ্যেই প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ, লেখনী অবান্তর। প্রাচীন ইতিহাসে গৌতমবুদ্ধ এবং একালীন ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ তার প্রমাণ। অধ্যাত্মজগতের এ দুই শ্রেষ্ঠ দিশারীই তাঁদের আদর্শ ও অনুভবের কথা বলেছেন সর্বজনের সহজবোধ্য ভাষায়। অথচ বোধ্য বলেই

বক্তব্য তাঁদের সহজ নয়। সেই অসাধারণ বক্তব্যকে প্রকাশে সম্ভব করে তোলার ভাষাশিল্প তাঁরা মুখে মুখেই রচনা করেছেন। গৌতমবুদ্ধের ক্ষেত্রে তা ছন্দোবদ্ধ হয়েছে স্মৃতিশক্তির প্রয়োজনে। এই মুদ্রণের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর ছন্দান্বিত রূপান্তর ততটা প্রয়োজন ছিল না। তাঁর আ নে ভঙ্গীটির যথাসম্ভব সংরক্ষণেই অন্তর্নিহিত কাব্যগুণের স্বতঃপ্রকাশ। তবু অক্ষয়কুমার সেনের 'শ্রীরামকৃষ্ণ পুথি' আমাদের ঐতিহ্যাগত পয়ারে রচিত জীবনচরিতের এক সুন্দর উদাহরণ।

জাতি হিসাবে ভারতীয়রা নাকি ইতিহাসবিমুখ আর বাঙালী আত্মবিস্মৃত। এসব অতি পরিচিত মন্তব্যের গুরুত্ব ততটা না দিলেও জীবনীরচনায় আমাদের অপেক্ষাকৃত অনাগ্রহ যে আমাদের ইতিহাসসচেতনতার অভাব কিছুটা প্রমাণ করে, তাতে সন্দেহ নেই। জীবনীসাহিত্য ইতিহাসের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। সেইকারণেই আত্মজীবনীর মূল্য ইতিহাসে খুব বেশি রকম। মানুষ নিজের কথা যত সার্থকভাবে বলতে পারে, এমন অন্যের কথা নয়। অবশ্য সব মানুষই তা পারে না, এবং সব 'আত্মজীবনী'ই জীবনী আকারে প্রকাশের যোগ্য নয়। তবু মনে হয়, ঘটনা ও ভাবনায় মিলে যে মানুষটি পূর্ণতা পেয়েছে, তার কথা সাধারণ জীবনীর একমাত্রিক অনুধাবনে কখনোই সবটা বলা হয় না। আমাদের দেশে তো জীবনী লেখা মানেই মহাপুরুষ তৈরী করার প্রচেষ্টা। ফলে এদেশে আত্মজীবনীও সামগ্রিক সত্য নিয়ে দেখা দিতে পারে না। কিন্তু সংখ্যায় অল্প হলেও যে কটি আত্মচরিত বাংলা-সাহিত্যে দেখা যায়, তারা সাহিত্য ও ইতিহাস উভয় দিক থেকেই মূল্যবান। হয়তো সম্পূর্ণ নিরাভরণ ব্যক্তিসত্তাকে এ সব আত্মচরিতে মেলে না, যা মেলে তার পরিমাণও কম নয়।

আত্মচরিতের অপরিহার্য আর দুটি উপাদান—চিঠিপত্র এবং ডায়েরী। মধুসূদন, বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথকে আমরা কতটুকু জানতাম, যদি তাঁদের পত্রাবলী সংরক্ষিত না হতো? ডায়েরী বা দিনলিপি অবশ্য এদেশে খুব বেশী প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু পূর্বোক্ত মনীষীদের পত্রগুলিই অনেক সময় তাঁদের দিনলিপির কাজ করেছে। এ দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের কালানুক্রমিক একত্রে প্রকাশ কখনো সম্ভব হলে হয়তো দেখা যাবে, তাঁর ডায়েরী না লেখার সঙ্কল্প ('পঞ্চভূত' স্মরণীয়) সম্পূর্ণ রক্ষা পায় নি।

চিঠিপত্র ও ডায়েরীর পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য আলাপচারী বা কথোপকথন।

সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তার সংলাপ যেমন চরিত্রবৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, অসাধারণদের ক্ষেত্রেও তাঁদের সংলাপ তেমনি মানবমানসের দিগ্দর্শন। পৃথিবীর অনেক মহৎ ব্যক্তিত্বের পরিচয়ই আমরা তাঁদের কর্মে, সংগ্রামে, সাধনায় পাই, প্রতিদিনের আলাপচারীতে পাই না। তার ফলে তাঁদের ব্যক্তিত্বে বিভিন্ন স্তরের বৈচিত্র্য আমাদের অপরিচিতই থেকে যায়। বাস্তবিক, রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্ব আরো কতো উজ্জ্বল হতে পারতো যদি তাঁদের প্রতিদিনের (অন্ততঃ অল্প কয়েক বছরের) আলাপচারী কোনো উৎসাহী অনুরাগী লিপিবদ্ধ করে রাখতেন! জীবনীকারেরা অতি সামান্যই তা পেরেছেন, কিন্তু যতটুকু পেরেছেন, তার দ্বারা ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে অবনীন্দ্রনাথের 'জোড়াসাঁকোর ধারে' এবং 'ঘরোয়া'র কথা-সংগ্রহ বাংলা সাহিত্যে রাণী চন্দের নাম চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

মানবসাধনার ইতিহাসে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব দেখা দেন, যাঁদের ধ্যানধারণা, উদ্যম ও কর্মরূপে, উপদেশ ও আলোচনায় সমগ্র মানবজাতির পথ-নির্দেশ। দেশ-বিদেশের এমন সব মহামানবের কথা কতো ভাষান্তরে আমরা পাঠ করে থাকি। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই সব বাণী আমাদের নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করে। বিশেষ দেশে কালে বা ভাষায় তাঁদের আবির্ভাব; তবু তাঁদের বাণী সর্বকালের— তাই ভাষান্তরেও তারা মূল প্রাণসত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে মানবজীবনপ্রবাহকে গতিময় করে রাখে। এমন একটি মহাগ্রন্থ বাইবেল।

ওল্ড টেস্টামেন্টের (বাইবেলের প্রাচীন অংশের) কথা বলছি না, নিউ টেস্টামেন্টে (বাইবেলের আধুনিক বা যীশু-জীবন-সংক্রান্ত অংশে) বিধৃত যীশুর জীবন ও বাণীর কথাই মনে জাগছে। বাইবেল যে পাশ্চাত্যজগতে সবচেয়ে প্রচারিত ও বিক্রীত, তার মূল কারণ যীশুর বাণীর অপূর্ব সরলতা, প্রত্যক্ষ প্রাণবেগ ও অনুভূতিসঞ্জাত বাণী-সৌন্দর্য। অধ্যাত্ম-অনুভব স্বপ্রকাশ সূর্যের মতো বাইবেলের বাণীর দ্বারা আপনিই সঞ্চারিত হয়, কোনো তর্ক বা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

এই অনুভূতির অপরিমেয় ঐশ্বর্যই বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদের ভাষায় এতো সারল্য এনে দিয়েছে। অনুবাদকমণ্ডলীর কৃতিত্বের কথা মনে রেখেই একথা বলা চলে। অনুভব ও প্রজ্ঞা—এরাই প্রকাশের তারতম্যে ভাষার প্রধান নিয়ামকশক্তি। একদা ইংরেজী বাইবেল তার সাহিত্য-সৌন্দর্যের জন্যই

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। ভারতে ইংরেজসাম্রাজ্য যত লাঞ্ছনাই এনে থাকুক, 'বাইবেল' তার শত অপরাধের নিশ্চিত মার্জনা।

বাঙালীর তথা ভারতবাসীর মননগত জাগরণে এই বাইবেলের ভূমিকা যে কতো ব্যাপক, সেকথা আমাদের মনে থাকে না। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—মনীষীচতুষ্টয়ের জীবনবেদে যীশুর বাণীর ত্যাগ, ক্ষমা, করুণা ও শান্তি ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ বাইবেল ও বাইবেলের কেন্দ্রপুরুষ যীশুখ্রীষ্টকে নতুন করে আবিষ্কার করে জাতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্লীন করে নিয়েছে। সমগ্র ব্রাহ্ম আন্দোলনে তো বটেই, ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার-আন্দোলনের প্রায় সবকটিতেই খ্রীষ্টজীবন ও ধর্মাদর্শের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব।

বাইবেলে যীশুর উপদেশ যে ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ, বাংলায় মিশনরীরা চেষ্টা করেছেন তাঁদের অনুবাদের মাধ্যমে সেই ভঙ্গিটি সঞ্চারিত করতে, কিন্তু এর ফল সব সময় ভালো হয় নি। মিশনরীদের বাংলার কৃত্রিমতা আজও হাস্যকর উদাহরণ সৃষ্টি করে থাকে। এদিক থেকে কেশবচন্দ্রের ভাষণ, উপদেশাবলী এবং তাঁর 'জীবনবেদ' মামে আত্মজীবনমূলক গ্রন্থখানি স্মরণীয়। পরিমিত বাক্যবন্ধে, ভাষাগত স্বচ্ছতায়, সহজাত কবিত্বগুণে ও উপলব্ধিজাত প্রেরণাশক্তিতে কেশবচন্দ্রের বাংলা রচনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং সে বৈশিষ্ট্যের মূলে বাইবেলের প্রভাব স্মরণীয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় দেশবিদেশের মনীষীদের সান্নিধ্যে কেশবচন্দ্রের পক্ষে যে পরিশীলিত মনন স্বাভাবিক, তা সর্বক্ষেত্রে আশা করা যায় না। তবু দেখি আমাদের সাহিত্যে, বিশেষতঃ গীতিময় কাব্যসাহিত্যে গভীর অনুভূতির সহজ প্রকাশের একটি ধারা বৈষ্ণবপদাবলী, সহজিয়া, দেহতত্ত্ব, বাউল বা মুর্শিদ্যাগানে বহুযুগ থেকেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। শাক্তপদ রচয়িতাদের মধ্যে রামপ্রসাদ বা কমলাকান্তের গান মূলতঃ সাধারণ মানুষের চলিত কথার সৌন্দর্য থেকেই সম্পদ আহরণ করেছে।

গ্রন্থবদ্ধ জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি আমাদের গণসংস্কৃতির ধারায় যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী, তর্জা প্রভৃতির মাধ্যমে বহুযুগ ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রশক্তি ধর্ম-চেতনার একটি সক্রিয় সচেতন অস্তিত্ব এদেশে চিরকাল বজায় রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মনন ও সাধনার পটভূমিতে এই লোক-সংস্কৃতির ধর্মচেতনা

বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অবশ্য ভারতীয় বেদ-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের চিরায়ত ধারার সঙ্গেও তাঁর গভীর যোগ ছিল। কিন্তু সে সব যোগাযোগই নানা মত ও পথের সাধকদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগাযোগের ফল। বইপড়া বিদ্যার জায়গায় তাঁর জীবনে জ্ঞানচর্চা এসেছে শ্রুতির পথ ধরে। প্রথম জীবন থেকেই তিনি 'শুনেছেন' অনেক, আর এক হিসাবে এই 'শ্রুতি'পথে জ্ঞানই ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রশস্ত পদ্ধতি।

অথচ একেবারে যে নিরক্ষর তিনি ছিলেন তা নয়। পাঠশালে শুভঙ্করী ধাঁধা লাগতো বটে, কিন্তু হাতের লেখাটি অতি নিপুণ অর্থাৎ পড়াশুনোর যে কার্যকরী দিক—এ যুগের 'চাকুরীজীবী'-শিক্ষা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় 'চালকলাবাঁধা বিদ্যা'—এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ না থাকলেও, তাঁর নিজস্ব অন্বেষণের জগতে তিনি তত্ত্বজ্ঞ মনীষী। তাঁর কথাসংগ্রহ যে কেউ একটু মন দিয়ে লক্ষ্য করবেন, তিনিই বুঝবেন ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার বিভিন্ন পন্থায় কী পরিমাণ অধিকার থাকলে তবে এ জাতীয় আলোচনার মর্মদেশে পৌঁছান যায়।

বহুযুগের সাধনায় এ জাতির সাধারণতম মানুষও অধ্যাত্মবিদ্যার মূল বক্তব্যের কিছু কিছু ধারণা রাখে—সেকথা এ দেশের দীন-দরিদ্র চাষী, মজুর, ভিখারী, বাউল প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেই বুঝতে পারা যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চতম আদর্শের অধিকার তার লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বর্তেছে। সংস্কৃতির এই আদান প্রদান সভ্যতার মর্মবিশ্লেষণে বিশেষ কৌতূহলের বিষয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিন্তাধারায় এ দুই সংস্কৃতির গভীর মিলন ঘটেছিল। তারই ফলে নিতান্ত সাধারণ মানুষ থেকে জ্ঞানী গুণী অসাধারণ অবধি সব শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁর সহজ ও সমান সম্বন্ধ। মানুষকে তিনি অন্তরের সত্যে বড়ো করে দেখতেন, তার বিত্তে বা পদমর্যাদায় নয়। যে সব তরুণ সত্যান্বেষীরা তাঁর কাছে সমবেত হতো, তাদের অনেকেরই সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র অবস্থা। এই সব তরুণদের প্রতি তাঁর আহ্বানও সর্বস্ব-ত্যাগের। পরম সত্যের জন্য এই ত্যাগের অগ্নিমন্ত্র তরুণ বাঙালীদের চিত্তে সঞ্চার করে তিনি ভারতের অধ্যাত্ম আদর্শকে নবযুগের জীবনসত্যে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। সে মহাসত্যের জীবন্ত প্রতীক তিনি নিজে, আর তাঁর বাণী। তাঁর কথায় তাঁর আপন জীবনটিও অনেক পরিমাণে প্রকাশিত। বস্তুতঃ 'কথামৃত' সঙ্কলনের উদ্দেশ্যই ছিল তাঁরই কথায় তাঁর 'চরিতামৃত' প্রকাশ

করা। সঙ্কলয়িতার অকালপ্রয়াণে 'কথামৃত' অসমাপ্ত থাকায় তা আর সম্ভব হয় নি।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরিচয়গত ঘনিষ্ঠতার সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব। প্রথম পত্রপত্রিকায় তাঁর বাণী-প্রকাশে কেশবচন্দ্রই অগ্রণী ছিলেন। 'পরমহংসের উক্তি' নামে একটি বাণী-সঙ্কলন কেশবচন্দ্রই প্রকাশ করেছিলেন ১৮৭৮ সালে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুগত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে সুরেশচন্দ্র দত্ত 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি, ১ম ভাগ' প্রকাশ করেছিলেন ১৮৮৪ সালে। এছাড়া আর একজন অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত শিষ্য রামচন্দ্র দত্ত প্রকাশ করেন 'তত্ত্বসার' (১৮৮৫) এবং 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' (১ম খণ্ড—১৮৮৬)। এ কয়টি গ্রন্থ ছাড়া আর সবই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পরে প্রকাশিত। ঐতিহাসিক এই প্রকাশনগুলির উল্লেখের কারণ একটি বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। অতীতের মহাপুরুষদের সংলাপ ও রচনাবলী থেকে বাণীসঙ্কলন নানা দেশে নানাভাবে হয়েছে। কিন্তু জীবিতকালেই কোনো মহাপুরুষের বাণীসঙ্কলন প্রকাশিত হওয়ার উদাহরণ একান্ত বিরল। বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ক্ষেত্রে তা ঘটেছে এবং আজ এ কথা নিশ্চিত-ভাবেই বলা চলে যে, নিজেদের অজান্তে কেশবচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র দত্ত, রামচন্দ্র দত্ত এবং সেইসঙ্গে সে যুগের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তির প্রতিবেদকেরা এক নূতন ভাষা ও ভাবের জগতের সূচনা করছিলেন বাংলা-সাহিত্যে, আজ যে সাহিত্যকে আমরা 'শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্য' নামে অভিহিত করতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যা নিজস্ব সৃষ্টি, তাঁর কথার শিল্পগুণ, তাকেই আমরা 'শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্য' বলতে চাই, যদিচ বিস্তৃত অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক যাবতীয় সাহিত্যকীর্তিই এ অভিধা লাভ করতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীতেই যদি আমরা সীমাবদ্ধ রাখি আমাদের আলোচনা, তাহলেই আমাদের বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সে বক্তব্য স্থাপনের আগে সাহিত্যে কথোপকথন বা শুধু কথনের নিজস্ব স্থান-সম্বন্ধে বিশ্বসাহিত্যের নজির স্মরণীয়। সক্রেটিসের বাণী বা কথন-সংগ্রহ করেছিলেন প্লেটো। ডঃ জনসনের কথাসংগ্রহ করে অমর বসওয়েল। গ্যেটের সঙ্গে অ্যাকারমেনের কথোপকথন এক মনীষী কবির সঙ্গ-লাভের সুযোগ এনে দেয়। বাংলাসাহিত্যে এ জাতীয় রচনা শ্রীম বা

মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্কলিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র পাঁচটি খণ্ড এখন অধ্যাত্ম-রসের সাহিত্যরূপে বাংলাসাহিত্যে চিরায়ত সম্মানের অধিকারী। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন—এঁদের আলাপচারী লিখে রাখার কথা সেকালের কোন অনুরাগীর মনে জাগে নি। হয়তো অধ্যাত্ম-ব্যক্তিত্বের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়েছে। তবু আমাদের মনে হয়, সমকালীন শিক্ষিত বাঙালীর বাইবেলের প্রতি অনুরাগও এই বাণী-সংগ্রহের মূলে।

শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রথম জীবনে কেশবচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত। আর কেশবচন্দ্রের জীবনগ্রন্থে বাইবেলের প্রভাবই সর্বাতিশায়ী। প্রথম যুগে যখন ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী সঙ্কলন প্রকাশিত হয়, তখন এর নাম ছিল *'Gospel of Sri Ramkrishna'* (১৮৯৭)। এ নামকরণেও বাইবেলী রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট।

তবে বাইবেলের মতো 'Apostle' বা শিষ্যরা এখানে একাধিক ন'ন, একজন, —অনন্য একজন, যাঁর লেখনী স্মৃতিধর হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকথিত সব ধরনের টুকিটাকি কথা থেকে অদ্বৈত বেদান্ত প্রসঙ্গের চরম শিখর অবধি বিস্তৃত বাণীসম্ভার ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছে। লক্ষণীয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যাঁরা সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছাড়া আর কেউ তাঁর উপদেশ-সংগ্রহ করেন নি।[১] মহেন্দ্রনাথ যেমন বিস্তৃতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণবাণী সংগ্রহ করেছিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেভাবে না করলেও, শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর যথাযথ রূপায়ণে তাঁর সযত্ন সতর্কতা লক্ষণীয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দের গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ লিখিত অমর জীবনীগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ' (পাঁচখণ্ডে সম্পূর্ণ) গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বেশ কিছু মূল্যবান সংলাপ সংগৃহীত। এছাড়া তাঁর অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর নানাজনের স্মৃতিচারণেই তাঁর সুভাষিতাবলীর কিছু কিছু মূল্যবান অংশ পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্বাচিত তাঁর ভাবধারার উত্তরাধিকারী স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিচারণের স্থান এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে।

বাইবেলের অনুরাগী মহেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণবাণীসংগ্রহের কালে যীশুখৃষ্টের-

১ আর এক গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীসংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু সে কাজ ওঁর নয় বলে রামকৃষ্ণদেবের নিষেধাজ্ঞায় আর অগ্রসর হন নি। 'কথামৃত'-সঙ্কলয়িতা মহেন্দ্রনাথের সংগ্রহের কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব জানতেন, কিন্তু তাঁকে তিনি বারণ করেন নি।

পার্ষদমণ্ডলীর স্মৃতিচারণের মতো শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গে নিজের ভূমিকা সবচেয়ে প্রচ্ছন্ন রেখে তাঁর গুরুর জীবন ও বাণীকেই একান্তভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। বাইবেলে যেমন ঘটনাবলীর বিস্তৃত বিবরণের অপেক্ষা যীশুর বাণীই প্রাধান্য লাভ করেছে, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর মাধ্যমেই শ্রীরামকৃষ্ণব্যক্তিত্বকে বিধৃত করার প্রয়াস 'কথামৃতে'ও লক্ষণীয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক আলোচনার উচ্চগ্রামের পাশাপাশি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরিহাসনিপুণ তীক্ষ্ণসন্ধানী মানবিক দৃষ্টি ও আচরণের বর্ণনাও কথামৃতের বৈশিষ্ট্য। মহাপুরুষের ব্যক্তিজীবনের এই নাট্যগুণান্বিত বাস্তব দিকটি আমরা বাইবেলে পাই না। যীশুর জীবন ও বাণীর সারাংশই বাইবেলের 'গস্‌পেল' বাণীসংগ্রহচতুষ্টয়ের বিষয়বস্তু। মহেন্দ্রনাথ তাঁর দিনলিপির মাধ্যমে নানান দিনের চলমান জীবনপ্রবাহের চিত্রটি পাঠকের সামনে ফুটিয়ে তুলে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের বিস্তৃততর পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন।

বাইবেলে যীশুর বাণীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় নানা অনুবাদের মাধ্যমে, তাঁর মুখের কথার ভাষাটি (আরেমিক) জানলে তাঁর ব্যবহৃত শব্দের ও বাক্যবন্ধের নিহিতার্থ আরো স্পষ্ট হতে পারতো। সেদিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীসংগ্রহে 'কথামৃত'কার আমাদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীভঙ্গীটি সার্থকভাবে তুলে ধরে অশেষ কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। অবশ্য আধুনিক টেপরেকর্ডপ্রথা এ বিষয়ে আরো সহায়ক হতে পারতো, কিন্তু মহেন্দ্রনাথ যা রেখে গেছেন তা টেপ-রেকর্ডের কৃতিত্বের সমতুল্য।

সমকালীন পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর কিছু কিছু সঙ্কলন আগে থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস' গ্রন্থটিতে এ-জাতীয় বেশ কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত। কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে প্রকাশিত প্রথম যুগের শ্রীরামকৃষ্ণবাণীসংগ্রহ থেকে আরম্ভ করে 'কথামৃত' অবধি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রথম দিকে প্রচলিত সাধুভাষার পদ্ধতিতেই তাঁর বাণী সংগৃহীত। সুরেশ দত্ত ও রামচন্দ্র দত্তের সংগ্রহেও সাধুভাষায় রূপান্তর লক্ষণীয়। মহেন্দ্রনাথই শ্রীরামকৃষ্ণের চলিত ভাষার উক্তিগুলিকে যথাযথ রেখে সে সব কথার নিজস্ব সৌন্দর্য, সজীবতা ও গহন আধ্যাত্মিকতাকে আপন মহিমায় প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, মহেন্দ্রনাথের এই স্মৃতিবিধৃত বাণীসংগ্রহ কতটা গ্রহণযোগ্য ? এ বিষয়ে বিশ্বসাহিত্যে প্লেটো, অ্যাকারমান, বসওয়েল প্রভৃতির

সাক্ষ্য যদি গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, তাহলে মহেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আপত্তিরও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। মহেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁর দিনলিপিতে লিখে রাখতেন। পরবর্তীকালে নিজের এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীবৃন্দের প্রয়োজনে এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়গুলি অবলম্বনে স্মৃতি থেকে বিভিন্ন দিনের বাণীর পূর্ণাঙ্গরূপ দান করেন।

'কথামৃতে' উল্লেখিত বিভিন্ন ব্যক্তির অধিকাংশই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এই স্মৃতিসংগ্রহ প্রকাশকালে জীবিত। স্বামী বিবেকানন্দের জীবিতকালেই ইংরাজীতে 'কথামৃতে'র দুটি ছোট আকারের খণ্ড এবং বাংলা 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত : প্রথম ভাগ' প্রকাশিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদা দেবী সহ অন্যান্য ভক্তমণ্ডলীর অধিকাংশই 'কথামৃতে'র পাঁচটি খণ্ড প্রকাশকালের মধ্যে জীবিত। অবশ্য শোনা যায়, মহেন্দ্রনাথ সরকার এবং শশধর তর্কচূড়ামণি—তাঁদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথনের প্রতিবেদনের সবটুকু স্বীকার করেন নি। কিন্তু এ দু'জনের কথা বাদ দিলে এত অজস্র ব্যক্তির উপস্থিতি 'কথামৃতে' রয়েছে, যাঁদের অপ্রতিবাদও সমান গুরুত্বপূর্ণ। 'কথামৃত' ছাড়াই সেকালের পত্রপত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর যে কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত, তাও 'কথামৃতে'র অনুকূল সাক্ষ্য। যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, যে অপূর্ব প্রকাশসৌন্দর্য ও আন্তরিক ঈশ্বরতন্ময়তা শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর বৈশিষ্ট্য, তা ভক্তগোষ্ঠীর বাণীসংগ্রহের বাইরেও যথেষ্টই প্রমাণিত। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও স্বামী সারদানন্দের প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা ও বাণীর সঙ্কলনগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনপ্রসঙ্গে এ পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণের অন্যতম। অবশ্য বিস্তৃততর গবেষণার দ্বারা এজাতীয় আরো সংগ্রহ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ভক্তির আতিশয্যে ব্যক্তিগত স্মৃতির অনুরঞ্জন এসে পড়তে পারে কি না? এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়, কোনো ঘটনাবিশেষের বর্ণনায় এ প্রশ্ন দেখা দিলেও, উক্তি-প্রসঙ্গে এ কথা সম্পূর্ণ অবান্তর। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অধ্যাত্ম-উপলব্ধির সঙ্গে সমপর্যায়ের কোনো ব্যক্তিই তাঁর মুখে বানানো কথা বসাতে পারে। অন্যথায় প্রসঙ্গের সামগ্রিকতা বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখে অধ্যাত্মবিষয়ক আলোচনা সংযোজনার ক্ষমতা সেকালে বা একালের কোনো তথাকথিত পণ্ডিত বা ভক্তের নেই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বা তাঁর বাণীকে বড়ো করে দেখানোর জন্য কোনো প্রচারকের প্রয়োজন ছিল না, তাঁর জীবনই তাঁকে প্রচার করেছে

এবং সেই প্রচারের যন্ত্রস্বরূপ যাঁরা হতে পেরেছেন, তাঁরাই এর দ্বারা কৃতার্থ হয়েছেন। একথাও স্মরণীয় যে, ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনার বিভিন্ন শাখায় শ্রীরামকৃষ্ণের মতো পারঙ্গমতা তাঁর কোনো ভক্তশিষ্যের ছিল না—বিবেকানন্দ বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তেরও নয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণবাণীসংগ্রহগুলি যাঁরা অনুধাবন করে দেখবেন তাঁরা সে বাণীর অন্তর্নিহিত ঐক্য, শাস্ত্রীয় প্রামাণ্য এবং প্রকাশকুশলতার বিচারে এ উক্তিরাশিকে অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক বলেই ধারণা করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তুলনীয় আর একজন মহাপুরুষের জীবন ও বাণীর কথা স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে মনে জাগে—তিনি ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশের হৃদয়দেবতা শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্যদেবের কথোপকথনের ছন্দায়িত রূপ আমরা 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থে পাই। কিন্তু চৈতন্যদেবের অনুপ্রেরণায় সৃষ্ট সাহিত্যসম্ভারই বাংলাসাহিত্যে চৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ দান। প্রায় পাঁচশোবছর পরে আজ সেই দানের পরিমাণ ও গভীরতার বিচার চলে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ক্ষেত্রে সে জাতীয় বিচারের সময় এখনও দেখা দেয় নি। তবু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবৎকালেই তাঁর বাণীসংগ্রহে কেশবচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনেক লেখক ও মনীষীর ব্যাকুলতায় প্রমাণিত হয় যে শুধু ভাবের দিক থেকে নয়, প্রকাশকলার দিক থেকেও তাঁর বাণী ও সংলাপের বিশেষ মূল্য রয়েছে।

পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীসংগ্রহের সাহিত্যমূল্য বিচার করতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছিলেন—"আমার মনে হয়, সকল জিনিষের মতো ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন ঐরূপ হয়েছে বলে বোধ হয়। ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় নূতন স্রোত এসেছে। এখন সব নূতন ছাঁদে গড়তে হবে। নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে।"[২] এই 'নূতন প্রতিভার ছাপ' আমরা বিবেকানন্দের রচনায়ই দেখতে পাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বিবেকানন্দ এ কথাগুলি বলেছিলেন তাঁর সাধুগদ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রসঙ্গে। অপরপক্ষে তাঁর চলতি গদ্যের প্রকাশভঙ্গীর ও আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ। এ দুই রীতির ক্ষেত্রেই যে নূতনত্বের চিন্তা স্বামীজীর মনে জেগেছিল তার কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মৌলিকতা।

বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর সেই নিজস্ব ভঙ্গিমাটি আমাদের অন্বিষ্ট।

---

২ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ : শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী : স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা. : ১ম সং ৯ম\খণ্ড. পৃষ্ঠা ৯৩

বিভিন্ন দিক থেকে তাঁর বাণীর সেই সাহিত্যগুণাবলী লক্ষ্য করিতে পারি। বাংলা গদ্যে সাধু ও চলতিভাষার পার্থক্য নিয়ে যে দ্বন্দ্ব—তা সাধারণতঃ অন্য সাহিত্যে দেখা যায় না। এর মূল কারণ, সাধু গদ্যের পদ্ধতিটি সংস্কৃতনির্ভর। প্রথম সাহিত্যরূপ পাবার সময় থেকেই সাধু গদ্য সংস্কৃত পণ্ডিতদের দ্বারা লালিত। অপরপক্ষে বাংলার লোকসাহিত্যে বহুকাল থেকে সাধারণের মুখের ভাষাই সাহিত্যিক বিচারে বেশ উন্নত মানের সৃষ্টি করে এসেছে। তাই উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে যখন বাংলাসাহিত্য বিশেষভাবে গদ্যনির্ভর হয়ে উঠলো, তখন বিভিন্ন লেখকের মনে সাহিত্যের বাহন সম্বন্ধে প্রশ্ন দেখা দিলো। প্যারীচাঁদ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য অনেকটা এই মনোভাবেরই ফল। হুতোম প্যাঁচার বিদ্রোহী ব্যক্তিত্ব স্বাভাবিকভাবেই কলকাতার বিশেষ বুলির (Patois) মধ্যে আপন সার্থকতা আবিষ্কার করে। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুর পরিবারের কৃতী সন্তানদের রচনায় চলতি গদ্যের অনুপ্রেরণা দেখা দিতে থাকে।

সাহিত্যের এই লিখিতরূপের পাশাপাশি অধ্যাত্ম-অনুভবের অমেয় ভাণ্ডার নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকেই তাঁর বাণী বিতরণ করে চলেছেন। বলা বাহুল্য, কোনো সাহিত্যিক আন্দোলন বা যশাকাঙ্ক্ষা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে নি, সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গিতে মানবকল্যাণের প্রয়োজনে তিনি তাঁর অন্তরতম কথাগুলি উচ্চারণ করে গেছেন।

কেশবচন্দ্রের 'সুলভসমাচারে' প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীসংগ্রহের একটি উদাহরণ—"দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসকে কলিকাতার ভদ্রলোকেরা ক্রমেই চিনিতেছেন। তাঁহারা কেহ কেহ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে আনিতেছেন এবং আত্মীয় বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার জীবন্ত ধর্মকথা ও কীর্তনাদি শুনাইয়া সুখী করিতেছেন। উক্ত মহাত্মা দ্বারা কলিকাতার হিন্দুসমাজে ধর্মভাব জাগ্রত হইতেছে। বিগত শনিবার বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার সমাগম হইয়াছিল। তিনি ভাবে বিভোর ও উন্মত্ত হইয়া অনেকগুলি গূঢ় গূঢ় ধর্মকথা বলিয়াছিলেন। তিনি এই একটি কথা বলিলেন যে, পরমাত্মা জীবাত্মার অতি নিকটে রহিয়াছেন তথাচ জীবাত্মা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। সে কথা এইরূপে বুঝাইলেন যে রামচন্দ্র পরমাত্মাসদৃশ, সীতাদেবী মায়া ও লক্ষ্মণ জীবাত্মার প্রতিরূপ। জীবাত্মার প্রতিরূপ লক্ষ্মণ পরমাত্মার ঠিক পশ্চাতেই যাইতেছেন, কিন্তু কেবল মায়ারূপী

সীতার ব্যবধানেই তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না, যখনই সীতা একটু পাশ দেন, তখনই তিনি তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হন। আর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটি সুন্দরভাবে বুঝাইলেন; তিনি বলিলেন যে, পরমাত্মা চুম্বকসদৃশ, জীবাত্মা লৌহশলাকার ন্যায়। চুম্বক স্বাভাবিক অবস্থায় আপনার গুণেই লৌহকে আকর্ষণ করে। কিন্তু লৌহে কাদা মাখান থাকিলে তাহার উপর চুম্বকের কোন বল খাটে না। তদ্রূপ আত্মা কর্দমে পূর্ণ থাকিলে তাহা পরমাত্মার নিকট যাইতে সফল হয় না। কিন্তু অনুতাপের অশ্রুজলের দ্বারা সেই পাপরূপ কর্দম ধৌত হইলে, অনাবৃত লৌহসম আত্মা আপনা আপনিই পরমাত্মারূপ চুম্বকের দিকে ধাবিত হয়।'[৩]

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, মূলতঃ চলতিভাষায় কথিত এই উপমাগুলি সাধুভাষায়ও এদের ভাবসৌন্দর্য বজায় রেখেছে। মহাপুরুষদের বাণীর ভাষা-নিরপেক্ষ এক আত্মিক সৌরভ থাকে—বুদ্ধ বা যীশুর বাণীর অনুবাদের দিকে লক্ষ্য করলে তা বোঝা যায়। কিন্তু এই উপমাগুলিই 'কথামৃতে' যখন চলতিভাষায় পাই, তখন তাদের যথার্থ সাহিত্যগুণ প্রকাশ পায়।

যেমন ধরা যাক, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে মায়াপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমা—'জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।' যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তা হলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই। ...আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র, যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; মধ্যে সীতারূপিণী মায়া ব্যবধান আছে বলে, লক্ষ্মণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখতে পান নাই'।[৪]

চলতিভাষায় প্রকাশিত এ উপমা কিন্তু শাস্ত্রীয় ভাষার প্রায় কাছাকাছি। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে শ্রুতি ও সাধনার দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ যে বিপুল জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী ছিলেন, এ জাতীয় উপমা তার অন্যতম উদাহরণ। আবার উপমার সরলতম প্রয়োগে দুরূহ তত্ত্বকথাও কেমন স্বচ্ছ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত, তার একটি

৩ 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীবমকৃষ্ণ পবমহংস' ২য় সংস্করণ পৃ° ২৫

সুলভ সমাচার: ৩বা পৌষ, ১২৮৮, শনিবার, ১৪ই ডিসেম্বব ১৮৮১

৪ কথামৃত. ১ম ভাগ. পৃঃ ৭৫। ১৩৭৭ সংস্করণ, ৪ই ডিসেম্বব. ১৮৮২ তারিখেব দিনলিপি। স্থান--দক্ষিণেশ্বর।

সূচ ও চুম্বক পাথরের উপমাপ্রসঙ্গে চতুর্থ ভাগ, ১৩ই ডিসেম্বব ১৮৮৩ তারিখের দিনলিপি দ্রষ্টব্য।

উদাহরণ—দক্ষিণেশ্বরে সমবেত ভক্তদের একজন প্রশ্ন করেছিলেন—'শ্যামা এ রূপটি হল কেন?' শ্রীরামকৃষ্ণ—'সে দূর ব'লে। কাছে গেলে কোন রঙই নাই। দীঘির জল দূর থেকে কালো দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে করে তোল কোন রঙ নাই। ঈশ্বরের যত কাছে যাবে, ততই ধারণা হবে তাঁর নাম রূপ নাই। পেছিয়ে একটু দূরে এলে আবার 'আমার শ্যামা মা।'[৫]

বেদান্তের মায়াবাদ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর সহজভঙ্গিমা বাংলাভাষাকে কতটা নিগূঢ়-সত্যের অধিকারী করেছে, তার একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ছোট্ট ঘরটিতে একদিন নানা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হতে হতে বেদান্তবিচারের কথা উঠলো। শ্রোতাদের মধ্যে একজন ছিলেন মহিমাচরণ—বেদান্তবাদী। বিভিন্ন শ্রোতার প্রয়োজন অনুযায়ী ('যার পেটে যা সয়') বক্তব্য উপস্থাপনে লোকশিক্ষক আচার্যরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশিষ্টতাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সাধনার দ্বারা তিনি যেমন বিভিন্নধর্মের প্রাণসত্যকে অনুভব করেছেন, তেমনি মানবমনের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী তাদের মহত্তর সত্যের পথে পরিচালিত করার শক্তিও লাভ করেছিলেন। 'কথামৃতে' বা তাঁর অন্যান্য বাণীসংগ্রহে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর আলাপচারীর বিবরণ বিধৃত। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যে ব্যক্তির যা ভাব, তা রক্ষা করেই তিনি বৃহত্তর উপলব্ধির পথে তাকে পরিচালিত করেছেন। মহিমাচরণকে উপলক্ষ্য করে বেদান্তের মূল বক্তব্য আমাদের প্রতিদিনের চলতিভাষায় এইভাবে প্রকাশিত—

'বেদান্ত বিচারে সংসার মায়াময়,—স্বপ্নের মত, সব মিথ্যা। যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষিস্বরূপ।···স্বপ্নও যত সত্য, জাগরণও সেইরূপ সত্য। একটা গল্প বলি শুন। তোমার ভাবের—

'এক দেশে একটি চাষা থাকে। ভারী জ্ঞানী। চাষ-বাস করে—পরিবার আছে, একটি ছেলে অনেকদিন পরে হয়েছে; নাম হারু। ছেলেটার উপর বাপ মা দু'জনেরই ভালবাসা; কেন না সবে ধন নীলমণি। চাষাটি ধার্মিক, গাঁয়ের সবলোকেই ভালবাসে। একদিন মাঠে কাজ করছে, এমন সময় একজন এসে খবর দিলে, হারুর কলেরা হয়েছে। চাষাটি বাড়ি গিয়ে অনেক চিকিৎসা করলে কিন্তু ছেলেটি মারা গেল। বাড়ির সকলে শোকে কাতর হলো, কিন্তু চাষাটির যেন কিছুই হয় নাই। উল্টে সকলকে বুঝায় যে, শোক করে কি হবে?

৫ তদেব পৃঃ ৯৩ : ২২ জুলাই, ১৮৮৩ তারিখের দিনলিপি

তারপর আবার চাষবাস করতে গেল। বাড়ি ফিরে এসে দেখে, পরিবার আরো কাঁদছে। পরিবার বললে, তুমি নিষ্ঠুর—ছেলেটার জন্য একবার কাঁদলেও না? চাষা তখন স্থির হয়ে বললে, কেন কাঁদছি না বলবো? আমি কাল একটা ভারী স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম যে, রাজা হয়েছি আর আট ছেলের বাপ হয়েছি—খুব সুখে আছি। তারপর ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন মহাভাবনায় পড়েছি—আমার সেই আটছেলের জন্য শোক করবো, না তোমার এই এক ছেলে হারুর জন্য শোক করবো?

'চাষা জ্ঞানী, তাই দেখেছিল, স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা; এক নিত্য বস্তু সেই আত্মা।'[৬]

গল্প বা উদাহরণের দ্বারা দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বক্তব্য উপস্থাপনার রীতিতে বাইবেলে যীশুখৃষ্টের উপদেশাবলীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদ্ধতিগত মিল নিশ্চয় মহেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু বাইবেলে যীশুর বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত, তাই তাঁর গল্পগুলিও সংখ্যায় খুবই কম। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথন অনেক বিস্তৃতভাবে সংগৃহীত বলে এ জাতীয় অজস্র গল্পে 'কথামৃত' পরিপূর্ণ। এ গল্পগুলির উৎস বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, লোকসাহিত্য, জনশ্রুতি—এমনি নানা উপাদান। মনে হয় না যে, কোনোটিই রামকৃষ্ণদেব নিজে তৈরী করেছেন। কিন্তু কথননৈপুণ্যে ও যথাযথ প্রয়োগের ফলে এই গল্পগুলি কাহিনী হিসাবেও অসামান্য সার্থকতার অধিকারী। রূপকধর্মী এই কাহিনীগুলিতে আধ্যাত্মিক বক্তব্যই প্রতিপাদ্য—কিন্তু মানবসংসারের অনেকদিক এই ছোট্ট কাহিনীগুলিতে উদ্ভাসিত, যে দৃষ্টির চমক ও গভীরতা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যপ্রতিভার পক্ষেই সম্ভব।

বেদান্তের সত্য প্রতিপাদনে চাষার গল্পটি অবশ্য সম্পূর্ণ অধ্যাত্মজগতেরই কথা। কিন্তু স্বপ্ন ও জাগরণে সমদৃষ্টির উদাহরণে এ গল্পে বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গী যেভাবে প্রকাশিত তেমন উদাহরণ অন্যত্র দুর্লভ।

অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গীর পাশাপাশি বিশিষ্টাদ্বৈতপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যাখ্যা আমরা মনে করতে পারি। এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসু নরেন্দ্রনাথ। গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছিলেন। নানা কথাপ্রসঙ্গে বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যায় এলেন—"বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে—রামানুজের মত। কিনা, জীব জগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটি।

৬ তদেব: পৃঃ ১৭৯: ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪ তারিখের দিনলিপি

"যেমন একটি বেল। খোলা আলাদা, বীজ আলাদা, শাঁস আলাদা একজন করেছিল। বেলটি কত ওজনের জানবার দরকার হয়েছিল। এখন শুধু শাঁস ওজন করলে কি বেলের ওজন পাওয়া যায়? খোলা, বীচি, শাঁস সব একসঙ্গে ওজন করতে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসটিই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তারপর বিচার করে দেখে,—যে বস্তুর শাঁস, সেই বস্তুরই খোলা আর বীচি। আগে নেতি নেতি করে যেতে হয়। জীব নেতি জগৎ নেতি এইরূপ বিচার করতে হয়; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। তারপর অনুভব হয়, যার শাঁস তারই খোলা, বীচি, যা থেকে ব্রহ্ম বলছো তাই থেকে জীবজগৎ। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। তাই রামানুজ বলতেন, জীবজগৎ বিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।"[৭]

দার্শনিক সিদ্ধান্তের দিক থেকে শঙ্করাচার্য ও রামানুজ এই দুই শ্রেষ্ঠ মনীষীর অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদৈতবাদী ব্যাখ্যা ভারতীয় চিন্তাধারার প্রধান দুটি সূত্র। সাধারণভাবে দার্শনিক ব্যাখ্যার পার্থক্য যে গোষ্ঠীবদ্ধতার সৃষ্টি করে, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে যে তা হতে পারে নি, তার কারণ যুক্তির বিভিন্নতার মধ্যেও যে এক স্তরগত সংযোগ থাকে, এ দুই গুরু-শিষ্য তাঁদের জীবনে, সাধনায় ও দার্শনিকতায় তা প্রমাণ করেছেন। মননগত সিদ্ধান্তের বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরিচয়বিশ্লেষণের যোগ্য অধিকারী দেখা দিলে প্রমাণিত হবে যে বাংলাসাহিত্যের দার্শনিক শাখাটি তাঁর দ্বারা এক অভাবনীয় সমৃদ্ধির অধিকারী হয়েছে। একথাও স্মরণীয় যে, ভারতীয় দর্শনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় সমন্বিত একটি যথার্থ উচ্চমানের বাংলা গ্রন্থের এখনও যথেষ্ট অভাব। অথচ 'কথামৃত' এ বিষয়ে তত্ত্ব ও প্রকাশভঙ্গী—উভয় দিক থেকেই যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্য নিয়ে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে যে বক্তৃতামালা দিয়েছিলেন, সেগুলি একই সঙ্গে সৃজন ও সমালোচনের সুন্দর উদাহরণ। 'কবি' শব্দটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে সাধারণভাবে ব্যবহার করা উচিত ছিল কি না এ নিয়ে সে সময় কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। এখনও কেউ কেউ মনে করেন, যা মূলতঃ ধর্মবিষয়ক, তাকে সাহিত্য বলা কেন?

উপনিষদে 'কবি' শব্দটি মূলতঃ জ্ঞানী অর্থে ব্যবহৃত। পরবর্তীকালে অনুভূতির রূপকার হিসাবেই শব্দটির তাৎপর্য গড়ে উঠেছে। এই দুই পথেই

৭ তদেব: পৃঃ ২০১

শ্রীরামকৃষ্ণ যে কবি, তাঁর অজস্র বাণীর সৌন্দর্যসম্ভারে তার সাক্ষ্য। তবু মনে হয়, কবিতা বা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণার সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। সাহিত্য কথাটির ব্যাপক অর্থের জন্য আমরা এই শব্দটিকে নিয়েই আমাদের প্রচলিত ধারণা যাচাই করে দেখতে পারি। সংস্কৃত সাহিত্যে অজস্র গ্রন্থ রয়েছে। তবু 'উপনিষদ' বিশেষভাবে কাব্যগুণান্বিত। পুরাণ অনেক, 'ভাগবতে'র মতো কবিত্বময় পুরাণ একটিই। বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' অংশ কম বিস্ময়ের নয় (সলোমনের গানগুলির কবিত্ব স্মরণীয়), 'নিউ টেস্টামেণ্টে'র কাব্যগুণ সর্বজনস্বীকৃত। বাংলা সাহিত্যে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মতো বৈষ্ণবদর্শনের সারসংগ্রহ আদ্যন্ত কবিত্বমণ্ডিত।

সত্য যেখানে সুষমায় প্রকাশিত, সেখানেই সাহিত্যগুণের সম্ভাবনা। এবার অন্যদিক থেকে বিষয়টি বিচার করা যায়। যাঁরা ধর্ম ও সাহিত্যের পৃথকীকরণে আগ্রহী তাঁরা বৈষ্ণবপদাবলীর আধ্যাত্মিকতা বাদ দিলে গতানুগতিক নায়ক-নায়িকা বর্ণনায় কতটুকু সাহিত্যসৌন্দর্য লাভ করবেন? রবীন্দ্রনাথের 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' গানটি শুনে যিনি মুগ্ধ হ'ন, তিনি 'করুণাধারায় এসো' অথবা 'ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এসো'—জাতীয় অংশগুলি আধ্যাত্মিক ছাড়া আর কোন অর্থে গ্রহণ করতে পারেন? পুরী বা ভুবনেশ্বরে যখন মন্দিরশিল্পের অপরূপ সৌন্দর্যে কেউ মুগ্ধ হন, কেমন করে তিনি একথা মনে না করে পারেন যে, ওই শিল্প প্রেরণার মূলে রয়েছে বিশেষ ধর্মসাধনার ভক্তিময় অনুপ্রেরণা?

সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে অধ্যাত্ম-অনুভবের শত সহস্র রূপায়ণ যখন অতীত ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, তখন ধর্মের ছোঁয়া লেগেছে বলেই তা সাহিত্য নয়, এমন যুক্তির অর্থ কি? তবে যদি মনে হয় যে ধর্মানুভূতির প্রকাশ কেবল তত্ত্বকথার স্তরেই থেকে গেছে, প্রকাশের লাবণ্যে উদ্ভাসিত হয় নি, তাহলেই প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য এই, কোনো রকম সাহিত্যসৃষ্টির সচেতনতা ছাড়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনলব্ধ সত্য বাংলাভাষার প্রকাশশক্তিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে, নূতন সৌন্দর্যে ও অনুপ্রেরণায় ভরে দিয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই ভাষাগত প্রকাশশক্তির কিছু কিছু উদাহরণ এখন উপস্থাপিত করা যাক। আধ্যাত্মিক আদর্শের দিক থেকে বিশ্লেষণ আমাদের লক্ষ্য নয়, কারণ সেটি আমাদের অসাধ্য। কিন্তু বাংলাভাষার প্রয়োগের দিক

থেকে বিচার করলে তাঁর ভাষার সাহিত্যমূল্য আমাদেব কাছে প্রতিভাত হতে পারে।

(ক) ব্রহ্ম ও শক্তি—পরস্পর সম্বন্ধ—

"জল স্থির থাকলেও জল,—তরঙ্গ হলেও জল।

"সাপ চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ, আবাব তির্যকগতি হয়ে এঁকে বেঁকে চললেও সাপ।

"বাবু যখন চুপ করে আছে তখনও যে ব্যক্তি,—যখন কাজ কবছে তখনও সেই ব্যক্তি"।[৮] নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের নিত্য ও লীলার সম্বন্ধ অথবা ব্রহ্ম ও শক্তির সম্বন্ধ যাঁরা বুঝতে চান, তাঁদের পক্ষে এব চেয়ে সহজ অথচ যথাযথ উপমা আব কি হতে পারে?

(খ) রূপ থেকে অরূপে—

'যত এগিয়ে যাবে ততই ভগবানের উপাধি কম দেখতে পাবে। ভক্ত প্রথমে দর্শন করলে দশভুজা। আরও এগিয়ে দেখলে ষড়ভুজ। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখছে দ্বিভুজ গোপাল। যত এগুচ্ছে, ততই ঐশ্বর্য কমে যাচ্ছে। আবও এগিয়ে গেল, তখন জ্যোতিদর্শন কল্লে—কোনও উপাধি নাই।

'একটু বেদান্তের বিচার শোন। এক রাজাব সামনে একজন ভেলকি দেখাতে এসেছিল। একটু সরে যাওয়ার পর রাজা দেখলে, একজন সওয়ার আসছে। ঘোড়ার উপর চড়ে, খুব সাজগোজ—হাতে অস্ত্রশস্ত্র। সভাসুদ্ধ লোক আব রাজা বিচাব কচ্ছে, এর ভিতর সত্য কি? ঘোড়া ত সত্য নয়, সাজগোজ অস্ত্রশস্ত্রও সত্য নয়। শেষে সত্য সত্য দেখলে যে সওয়ার একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে! কিনা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—বিচার করতে গেলে কিছু টেকে না।

'ক্ষেতে চুরি করতে চোর এসেছে। খড়ের ছবি মানুষের আকার করে রেখে দিয়েছে—ভয় দেখাবার জন্য। চোরেরা কোনও মতে ঢুকতে পারছে না। একজন কাছে গিয়ে দেখলে—খড়ের ছবি। এসে ওদের বললে—ভয় নাই। তবু, ওরা আসতে চায় না—বলে বুক দুড় দুড় করছে। তখন ভুঁয়ে ছবিটাকে শুইয়ে দিলে, আর বলতে লাগলো এ কিছু নয়, 'নেতি' 'নেতি'।'[৯]

৮ কথামৃত: ৪র্থ ভাগ · ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ তারিখের দিনলিপি। পৃঃ ৩২, ১৩৭৭ সংস্করণ।

৯ কথামৃত: ৩য় ভাগ: ১৮ই অক্টোবর, ১৮৮৫ তারিখেব দিনলিপি। স্থান—শ্যামপুকুর কলকাতা।

বিচারমূলক চর্চার দিক থেকে তিনটি উদাহরণ যেমন মনোজ্ঞ, তেমনি নৈপুণ্য ঘরোয়া বাংলায় এদের পরিবেশনা।

(গ) পাণ্ডিত্যের অহংকার—

'একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বেদান্ত পড়ে লোকে মনে করে, আমি সব বুঝে ফেলেছি। চিনির পাহাড়ে একটা পিঁপড়ে গিছলো। এক দানা চিনি খেয়ে তার পেট ভরে গেল। আর এক দানা মুখে করে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে, এবার এসে পাহাড়টা সব নিয়ে যাব!'[১০]

মানবচরিত্রের এমন পরিহাসোজ্জ্বল চিত্ররূপ বক্তার অন্তর্দৃষ্টি ও রসবোধ দুয়েরই সার্থক উদাহরণ।

(ঘ) সাধনার প্রয়োজন—

'সাধনার খুব দরকার, ফস্ করে কি আর ঈশ্বর দর্শন হয়?'

'একজন জিজ্ঞাসা করলে, কৈ ঈশ্বরকে দেখতে পাই না কেন? তা মনে উঠলো, বললুম, বড়মাছ ধরবে, তার আয়োজন কর। চারা কর। হাতসুতো ছিপ যোগাড় কর। গন্ধ পেয়ে গভীর জল থেকে মাছ আসবে। জল নড়লে টের পাবে, বড় মাছ এসেছে।'

'মাখন খেতে ইচ্ছা। তা দুধে আছে মাখন, দুধে আছে মাখন—করলে কি হবে? খাটতে হয় তবে মাখন উঠে।'[১১]

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, একটির পর একটি উপমা আপনিই দেখা দিয়ে যথাযথ প্রকাশে বক্তব্যকে চিত্রময় করে তুলেছে।

(ঙ) ঈশ্বর ও বিদ্যাসাগর—

'পূজা হোম, যাগ যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে তাহলে আর এসব কর্মের বেশী দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার, যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, পাখা রেখে দেওয়া যায়। আর পাখার কি দরকার?'

'তুমি যে সব কর্ম করছো এসব সৎকর্ম। যদি 'আমি কর্তা' এই অহঙ্কার

---

১০ কথামৃত: দ্বিতীয় ভাগ; পৃঃ ১২৫: ১৩৭৭ সংস্করণ: ১লা অক্টোবর, ১৮৪৪ তারিখের দিনলিপি। কলকাতা, অধর সেনের বাড়ী।

১১ কথামৃত: তদেব: পৃঃ ১৩০: ১১ই অক্টোবর, ১৮৮৪ তারিখের দিনলিপি। স্থান—দক্ষিণেশ্বর।

ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পারো, তাহলে খুব ভাল। এই নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়।

'কিন্তু যত তাঁর উপর ভক্তি ভালবাসা আসবে, ততই তোমার কর্ম কমে যাবে। গৃহস্থের বউ, পেটে যখন ছেলে হয়—শাশুড়ী তার কর্ম কমিয়ে দেয়। যতই মাস বাড়ে, শাশুড়ী কর্ম কমায়। দশ মাস হলে আদপে কর্ম করতে দেয় না। পাছে ছেলের কোন হানি হয়, প্রসবের কোন ব্যাঘাত হয়। তুমি যে সব কর্ম করছো এতে তোমার নিজের উপকার। নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে। ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে। জগতের উপকার মানুষে করে না, তিনিই করছেন; যিনি চন্দ্র সূর্য করেছেন, যিনি মা, বাপের ভিতর স্নেহ, যিনি মহতের ভিতর দয়া, যিনি সাধুভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন। যে লোক কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করবে সে নিজেরই মঙ্গল করবে।

'অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে।'[১২]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের আলাপনের অংশটি দু'জন শ্রেষ্ঠ বাঙালীর অসাধারণ আলাপচারীর অংশমাত্র। সমগ্র আলাপটি সংলাপ-সাহিত্যে চিরস্মরণীয়। কিন্তু মূলতঃ শ্রীরামকৃষ্ণই এখানে বক্তা, বিদ্যাসাগর প্রধানতঃ শ্রোতা। আলাপ-আলোচনায় দু'জনেই দক্ষ পরিহাসরসিক এবং আপন আপন অধিকারে শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। আবার সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে একজন সাধুগদ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠাকারী, আর একজন আপন অগোচরে চলতিভাষার মাধ্যমে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার উচ্চতম দর্শনের বক্তব্যরাশি সবচেয়ে সহজ ঘরোয়া ভঙ্গিমায় প্রকাশ করে চলতি গদ্যের ভবিষ্যৎ সার্থকতা স্বতঃপ্রমাণিত করে চলেছেন।

(চ) 'উপমা শ্রীরামকৃষ্ণস্য'—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আপন কবিসত্তা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমালোকটি আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে এ জাতীয় উদাহরণের সমাবেশ পাঠকেরা দেখতে পারেন। এ প্রবন্ধপ্রান্তে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমার অফুরান ভাণ্ডার থেকে একটি

১২ কথামৃত: তৃতীয় ভাগ: পৃঃ ১৫: ৫ই আগষ্ট, ১৮৮২ তারিখের দিনলিপি। স্থান—কলকাতা বিদ্যাসাগরের বাড়ী।

অংশমাত্র উপস্থাপিত করি। উপমেয় এখানে নরেন্দ্রনাথ—শ্রীরামকৃষ্ণদৃষ্টিতে সেই মানুষটি, যাঁকে পরবর্তীকালে কোনো বিদেশী অনুরাগী বলেছিলেন 'He was a king among men.'[১৩] সেই কথাটি অনেক আগেই শ্রীরামকৃষ্ণ-দৃষ্টিতে আভাসিত সম্পূর্ণ বাঙালী জীবনের পরিচিত উপমা-পরম্পরায়—'নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। এত ভক্ত আসছে, ওর মত একটিও নাই।'

'এক একবার বসে বসে আমি খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারুর দশদল, কারুর ষোড়শদল, কারুর শতদল, কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।

'অন্যেরা কলসী, ঘটি এ সব হতে পারে; নরেন্দ্র জালা।'

'ডোবা পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি। যেমন হালদার পুকুর।'

'মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙ্গাচক্ষু বড় রুই, আর সব নানারকম মাছ—পোনা কাঠি-বাটা এই সব।'

'খুব আধার,—অনেক জিনিষ ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ।'

'নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। আসক্তি, ইন্দ্রিয়সুখের বশ নয়। পুরুষ পায়রা। পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট ছিনিয়ে লয়,—মাদি পায়রা চুপ করে থাকে।'[১৪]

উপমা যদি অনিবার্য না হয়, তবে তার শিথিলতা আমাদের স্বভাবতঃই উদ্দীপ্ত করতে পারে না। আবার অতিকথন বা অতি কাল্পনিকতার দ্বারাও উপমা বিক্ষিপ্ত হতে পারে। নরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বপ্রসঙ্গে প্রত্যেকটি উপমা এখানে অর্থে ও চিত্রে সমান ভাস্বর। এই দৃষ্টিই সেই কবিদৃষ্টি যা বিশ্বচরাচরের বিভিন্ন উপাদানের অন্তর্নিহিত যোগটুকু মুহূর্তে ঘটাতে পারে।

অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন কবি, তেমনি মনীষী; যেমন ভক্ত, তেমনি জ্ঞানী; যেমন তন্ময়, তেমনি রসিক—সব মিলিয়ে বিবেকানন্দের ভাষায় 'ভাবরাজ্যের রাজা।' তাঁর বক্তব্য, যা লেখায় নয়, কথায় প্রকাশিত, সেখানেও দেখি তিনি ভাষার সম্পদে রাজাধিরাজ। যে নিভূর্ষণ সারল্যে তাঁর ব্যক্তিসত্তার শুদ্ধতম বিকাশ, সেই সারল্য আর অনুভবের সেই অতলতা তিনি এই বাংলা-ভাষায় রেখে গেছেন। অবহিত হওয়া আমাদেরই সৌভাগ্য।

---

১৩ 'মানুষের মধ্যে তিনি রাজা।'

১৪ কথামৃত: ৫ম ভাগ: পৃঃ ১৫৪: ১৮৮৫, আষাঢ় সংক্রান্তি; স্থান—বলরাম বসুর বাড়ি, বাগবাজার কলকাতা।

বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব

ইতিহাসের সন তারিখ অনুসারে "১২৪২ সালের অথবা ১৭৬৭ শকাব্দের ৬ই ফাল্গুন, ইংরেজী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী"[১] কামারপুকুর গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শুভ আবির্ভাব হয়। কিন্তু ইতিহাসের অনুগামীরা জানেন, কোনো ঘটনাই একদিনে ঘটে না। পৃথিবীর সব ঘটনার পিছনে রয়েছে বহুযুগের বহু-দিনের মিলিত ঘটনাস্রোত। সে ইতিহাসের বিচারে একেবারে নূতন বা একেবারে পুরাতন কিছুই ঘটতে পারে না, হয়তো সে অর্থেই রামচন্দ্রের জন্মপূর্ব-কালেই বাল্মীকির রামায়ণ রচনার প্রবাদ।

একটি সমগ্র জাতির মানস-সমুন্নয়নে যে নরচন্দ্রমার আদর্শ প্রতিভাত হয়, তারই আকর্ষণে জাতীয় চিত্তের উদ্বেল প্রকাশ ঘটে এক এক দেশের এক বা একাধিক মহাকাব্যে। মহাকাব্য তাই জাতীয়চিত্তের অন্তরসত্তার পরিচয়। যে 'রাম' বা যে 'কৃষ্ণ'কে অবলম্বন করে ভারতবর্ষের রামায়ণ ও মহাভারত গড়ে উঠেছে, সে রাম বা কৃষ্ণ শুধুমাত্র ক্ষত্রিয়বীর নন, আদর্শ ধর্মপরায়ণতায়, ধর্মস্থাপনে ও শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের বিকাশে তাঁরা ভারতীয় জাতীয় চেতনার ধর্মবীর। পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আধ্যাত্মিক—মানবজীবনের সর্বতোমুখী বিকাশের প্রতিভূ এ দুই মহামানব চরিত্র আজ অবধি ভারতবর্ষের প্রাণচেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠিত। এঁদের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে না পারলে ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, একথা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান—সকলের পক্ষেই সমান প্রযোজ্য।

ইন্দ্রজিৎ নিধনের প্রাক্‌কালে আপন হাতের ঐন্দ্রাস্ত্রের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণের উক্তি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য—

ধর্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যদি।
পৌরুষে চাপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদৈনং জহি রাবণিম্॥[২]

"যদি দশরথপুত্র রাম ধর্মাত্মা, সত্যসন্ধ এবং পৌরুষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হন, তবে এই রাবণপুত্রকে সংহার কর।"

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ . পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন স্বামী সারদানন্দ : ১৩৬২ সংস্করণ : পৃঃ ৭৫।

২ রামায়ণ

লক্ষণীয়, অস্ত্রবল এখানে প্রধানরূপে গণ্য নয়, রামচন্দ্রের ধর্মবলই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। ধর্মবলের সঙ্গে অস্ত্রবল মিলিত বলেই রামচন্দ্র পৌরুষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সূচনায় অর্জুন নারায়ণীসেনার বদলে স্বয়ং নারায়ণকে চেয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শেষ শ্লোকটিতে কৃষ্ণার্জুনের এই মিলনপ্রসঙ্গে সঞ্জয়ের উক্তি মহাভারতের মূল আদর্শকে সমুজ্জ্বল করে তুলেছে—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।[৩]
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥"

—"যে পক্ষে মহাযোগী কৃষ্ণ এবং ধনুর্ধারী অর্জুন রয়েছেন, সেই পক্ষেই শ্রী, বিজয়, ঐশ্বর্য এবং নীতি নিশ্চিত—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

এক্ষেত্রেও দ্রষ্টব্য, আগে যোগেশ্বর কৃষ্ণের কথা বলা হয়েছে, পরে ধনুর্ধর অর্জুনের বীরত্বপ্রসঙ্গ। ধর্ম এবং অহিংসা এখানে একার্থক নয়। ধর্মযুদ্ধের কারণে যে সংগ্রাম, তারও নেতৃত্ব আসছে শ্রেষ্ঠ যোগীর কাছ থেকে—এইটি মহাভারতের বক্তব্য। আচার্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের আলোচনাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "মৃচ্ছকটিক নাটকে যে সকল পাত্রের উল্লেখ আছে তাহাদিগের মধ্যে দুইজনের চরিত্র পর্যালোচনা করিয়া সাত্ত্বিক এবং রাজস, হিন্দু আর্য এবং ইউরোপীয় আর্য এতদুভয়ের মধ্যে যে চিত্তাদর্শসম্বন্ধীয় লৌকিক ভেদ জন্মিয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। ইউরোপীয় পুরুষ সাহস, নির্ভীকতা এবং স্বৈরাচারকে বীরস্বভাবের প্রধান উপকরণ মনে করেন। তাঁহার মতে যুদ্ধবীরই বীর। সংস্কৃত গ্রন্থকার সাহস এবং নির্ভীকতার গৌরব করিয়াও উহাদিগকে বীরভাবের অতি গৌণ উপাদানই মনে করেন। তাঁহার চক্ষে বীর দেখিতে হইলে দানবীর, সত্যবীর, ক্ষমাবীর, ধৈর্যবীর প্রভৃতি প্রথমে উদিত হয়—যুদ্ধবীর সকলের পশ্চাদ্ভাগে আইসেন।"[৪]

ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের মূল সুরটি যে এই ধর্মচেতনায়, সেকথা উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় আমাদের নবজাগরণের প্রথম পর্বটি আলোচনা করলেই সহজে প্রতিভাত হয়। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূত্রে সমগ্র জাতীয় সত্তার মৌল রূপান্তরের যে আশঙ্কা এদেশে তখন স্বাভাবিক ছিল, তারই ফলে রাজা রামমোহন রায় থেকে রামকৃষ্ণদেব অবধি আমাদের জাতীয় চিত্তসঙ্কটের প্রধান জিজ্ঞাসাই

৩ মহাভারত ভী ৪২।৭৮
৪ বিবিধ প্রবন্ধ (১ম): ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ছিল—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। প্রথম আন্দোলন ব্রাহ্ম আন্দোলন। ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনে আমরা শুধু আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তরই খুঁজি নি,—সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি—জীবনের বিভিন্ন জিজ্ঞাসায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের তরঙ্গ আমাদের জীবনকে আন্দোলিত করে গেছে। শেষ অবধি এই ব্রাহ্ম আন্দোলনের আপাত স্বাতন্ত্র্যকে আত্মস্থ করে নিয়েই বৃহত্তর হিন্দুসমাজ অগ্রসর হয়েছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস সমাজ ও ধর্মচেতনাকে অনেকটা একত্র করে দেখতে অভ্যস্ত। রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে ধর্ম ও জীবনের অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধ বিভিন্ন লোকোত্তর মহাপুরুষকে অবলম্বন করে লোকশ্রেয়ের পথসন্ধানী। এ সম্বন্ধে 'বর্তমান ভারত' নিবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের সারগ্রাহী বিশ্লেষণ—

—"বারংবার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এদেশে তাহা ধর্মের নামে সংসাধিত—।"[৫]

বিপ্লব বলতে সাধারণতঃ উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব, অথবা বিংশ শতাব্দীর রুশ বা চীন বিপ্লবের কথা মনে জাগলেও বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের পরিণতিতে বিপ্লবের আকৃতি, প্রকৃতি ও পরিণামে পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। ভারতের ইতিহাসে "চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্ম-সমাজ, আর্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্ম-তরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ।"[৬]

সুতরাং ভারতবর্ষের সমাজবিপ্লবেও ধর্মই পূর্বগামী। সারথি শ্রীকৃষ্ণ, রথারোহী অর্জুন। সর্বাগ্রে অধ্যাত্ম আদর্শের নিরূপণ, তারপর সামাজিক বা রাষ্ট্রিক পন্থা নির্ধারণ।

সেদিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর জীবন-জিজ্ঞাসা ভারতবর্ষে যে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল, তার আধ্যাত্মিক উত্তর না দিয়ে সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার উপায় আমাদের ছিল না। সে উত্তর এলো বিশেষ কোনো গ্রন্থ, দার্শনিক পন্থা বা অভিজাত সম্প্রদায়ের আধিপত্যচেষ্টায় নয়, দরিদ্র পল্লী অঞ্চলের আপাতসাধারণ পুথিপাণ্ডিত্যহীন সরল সর্বত্যাগী ব্রাহ্মণের জীবনবেদ থেকে।

সে জীবনকথা উপলব্ধির আগে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর যুগপরিবর্তনের পট-ভূমিতে ইংরেজের সুচতুর বাণিজ্য ও রাজ্যবিস্তারের কথা মনে রাখতে পারি।

৫, ৬ বর্তমান ভারত : স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ) : ২য় সং পৃঃ ২৩৭

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতে এই ইংরেজশাসনের যুগ মূলতঃ বৈশ্য যুগ— যার "সম্রাজ্ঞী স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।"[৭] ইংরেজ শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য—

"ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল গুণও আছে। সর্বাপেক্ষা কল্যাণ ইহা যে, পাটলিপুত্রসাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত এ প্রকার শক্তিমান ও সর্বব্যাপী শাসনযন্ত্র অস্মদ্দেশে পরিচালিত হয় নাই। বৈশ্যাধিকারের যে চেষ্টায়, এক প্রান্তের পণ্যদ্রব্য অন্যপ্রান্তে উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে দেশ দেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। এই সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি অতি কল্যাণকর; কতকগুলি অমঙ্গলস্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর— এদেশের যথার্থ কল্যাণ নির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক।"[৮]

পরবর্তীকালে 'কালান্তর' গ্রন্থের সূচনা-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই ইংরেজ আগমনের তাৎপর্যব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে লিখেছেন—"ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার। মানুষ হিসাবে তারা রইল মুসলমানদের চেয়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে, কিন্তু য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীরভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর কোন বিদেশী জাতি কোনদিন এমন করে আসতে পারেনি।"[৯]

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই ভারতীয় নবজাগরণে ইংরেজ ও ইংরেজের মাধ্যমে য়ুরোপীয় মানসের জঙ্গমশক্তির প্রভাবকে বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবু সব মিলিয়ে দেখলে য়ুরোপীয় চেতনার সর্বগাসী ক্ষমতামত্ততা দুজনকেই ভাবিয়ে তুলেছিল। ইংরেজ শোষণের স্বরূপ এবং সেই শোষণের নাগপাশমুক্ত ভবিষ্যৎ ভারত সম্বন্ধে দুজনের উদ্বেগে ও আশাবাদে অপূর্ব মিল দেখা যায়।

ইংরেজ শাসনের গুণ ও দোষ সম্বন্ধে যুগপৎ সচেতনতাই বাঙালীকে ইংরেজের সবচেয়ে কাছে এনেও সবচেয়ে দূরে ঠেলেছে। ভারতের জাতীয় ইতিহাসে য়ুরোপ বা পাশ্চাত্যের ভূমিকা সম্বন্ধে কোনো মোহ লালন না করেও বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের সংস্পর্শে এসে আমাদের যে চিত্তজাগরণ ঘটেছিল তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু যাঁরা ইউরোপীয় সভ্যতাকেই মানবজীবনদর্শনের শেষ

৭, ৮ তদেব: পৃঃ ২৩১, পৃঃ ২৪৩—২৪৪

৯ রবীন্দ্ররচনাবলী · শতবার্ষিকী সংস্করণ : ত্রয়োদশ খণ্ড : পৃঃ ২১৬

কথা মনে করেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথকেও স্বদলে পেতে উৎসুক—যদিচ রবীন্দ্র-সাহিত্যের সামগ্রিক সাক্ষ্য এর বিরুদ্ধে। অন্যান্য সাক্ষ্য বাদ দিলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটিই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সাক্ষ্য প্রমাণ।

প্রাসঙ্গিকবোধে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্দৃষ্টির দুটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হলো—"অতি প্রাচীনকালে একবার ভারতীয় দর্শনবিদ্যা গ্রীক উৎসাহ সম্মিলনে রোমক, ইংরাজী প্রভৃতি জাতিবর্গের অভ্যুদয় সূচিত করে, সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয়ের পর এই দুই মহাজলপ্রপাতের সংঘর্ষে প্রায় অর্ধভূভাগ ঈশাদি নামাখ্যাত অধ্যাত্ম তরঙ্গরাজি উপপ্লাবিত করে। আরবদিগের অভ্যুদয়ের সহিত পুনরায় ঐ প্রকার মিশ্রণ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করে এবং বোধ হয়, আধুনিক সময়ে পুনর্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলনকাল উপস্থিত।

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"[১০]

"প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান হয়। পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়। প্রত্যেক পতনের পর আর্যসমাজও শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে বিগতাময় হইয়া পূর্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্যবান হইতেছে—ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

প্রত্যেক পতনের পর পুনরুত্থিত সমাজ অন্তর্নিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিতেছেন এবং সর্বভূতান্তর্যামী প্রভুও প্রত্যেক অবতারে আত্মরূপ সমধিক অভিব্যক্ত করিতেছেন।

বারংবার এই ভারতভূমি মূর্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং বারংবার ভারতের ভগবান আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন।

কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা গতপ্রায়া বর্তমান গভীর বিষাদরজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য।

এবং সেইজন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পুনর্বোধন সূর্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়। এই পুনরুত্থানের মহাবীর্যের সমক্ষে পুনঃ পুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।"[১১]

১০ বর্তমান সমস্যা : ভাববার কথা : বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ) ২য় সং পৃঃ ৩১

১১ হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ : ভাববার কথা (৬ষ্ঠ) ২য় সং পৃঃ ৫

ভারতভূমির সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামীজীর এই আশাবাদ শুধুমাত্র তাঁর জাতীয় গৌরববোধের নিদর্শন নয়, ইতিহাসের স্বরূপবিশ্লেষণে পারঙ্গম মনীষার সঙ্গে সাধনলব্ধ প্রজ্ঞাদৃষ্টিও এক্ষেত্রে তাঁর সহায়ক। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বগামী মনীষীদের মধ্যে অনেকেই ভারতবর্ষের অভ্যুদয় সম্বন্ধে মোটামুটি নিশ্চিত ছিলেন—দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ অনেকের কথাই এ প্রসঙ্গে মনে আসতে পারে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনুজ বিবেকানন্দের যে সুদৃঢ় প্রত্যয় ও প্রেরণাসঞ্চারী শক্তি পরবর্তী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তীব্র গতি সঞ্চার করেছে, তার সঙ্গে এক বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর-কারও তুলনাই চলে না।

রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তার সূচনা কৈশোরকাল থেকেই। নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বমুখর আধুনিক ভারত সম্বন্ধে রবীন্দ্রভাবনার পরিচায়ক দুটি উদ্ধৃতি এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

১৩০৯ সালের বৈশাখে লেখা (ইংরেজী ১৯০২ এপ্রিল—মে, স্বামীজী তখন জীবিত) 'নববর্ষ' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুববিশ্বাস লক্ষণীয়—"জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক তাহারই জয় হইবে; আমরা যাহারা ইংরেজী বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন কবিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে—'মিলি মিলি যাওব সাগরলহরীসমানা'। তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে; আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্রকন্যাগণকে 'কোটফ্রক পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব তখন সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে, সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না। তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে, পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও।

তিনি কহিবেন . ওঁ ইতি ব্রহ্ম।

তিনি কহিবেন : ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

তিনি কহিবেন : আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।"[১২]

ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্তরালে যে এক চলমান জীবনপ্রবাহ জড়ত্বের বিরুদ্ধে চিরসংগ্রামরত সে কথাটি একদা রবীন্দ্রমানসে এইভাবে ধরা

১২ রবীন্দ্ররচনাবলী : ৪র্থ খণ্ড . স্বদেশ : পৃ. ৩৭৭ (বিশ্বভারতী সং)

দিয়েছিল—"ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা প্রাচীনকাল হইতেই দেখিয়াছি, জড়ত্বের বিরুদ্ধে তাহার চিত্ত বরাবরই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে ;—ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহার উপনিষদ, তাহার গীতা, তাহার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম সমস্তই এই মহাযুদ্ধে জয়লব্ধ সামগ্রী, তাহার শ্রীকৃষ্ণ তাহার শ্রীরামচন্দ্র এই মহাযুদ্ধেরই অধিনায়ক।

"আজ আমরা যে কালের মধ্যে বাস করিতেছি সে কালকে বাহির হইতে সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই না ; তবু অনুভব করিতেছি ভারতবর্ষ আপন সত্যকে, এককে সামঞ্জস্যকে ফিরিয়া পাইবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। নদীতে বাঁধের উপর বাঁধ পড়িয়াছিল, কতকাল হইতে তাহাতে আর স্রোত খেলিতেছিল না, আজ কোথায় তাহার প্রাচীর ভাঙ্গিয়াছে—তাই আজ এই স্থির জলে আবার যেন মহাসমুদ্রের সংস্রব পাইয়াছি, আবার যেন বিশ্বের জোয়ার ভাঁটার আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে। এখনই দেখা যাইতেছে আমাদের সমস্ত নব্য উদ্যোগ সজীব হৃৎপিণ্ড-পরিচালিত রক্তস্রোতের মত একবার বিশ্বের দিকে ছুটিতেছে, একবার আপনদিকে ফিরিতেছে, একবার সার্বজাতিকতা তাহাকে ঘরে ফিরিয়া আনিতেছে, একবার সার্বজাতিকতা তাহাকে ঘরছাড়া করিতেছে।

"...জীবনের কাজ আরম্ভ হইবার এই তো লক্ষণ, এমনি করিয়া দুই ধাক্কার মধ্যে পড়িয়া মাঝখানের সত্য পথটি আমাদের জাতীয় জীবনে চিহ্নিত হইয়া যাইবে এবং এই কথা উপলব্ধি করিব যে স্বজাতির মধ্যে দিয়াই সর্বজাতিকে ও সর্বজাতির মধ্যে দিয়া স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়—এই কথা নিশ্চিতরূপেই বুঝিব যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফলতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।"[১৩]

য়ুরোপ বা পাশ্চাত্য এবং ভারত বা প্রাচ্য—এ দুয়ের মধ্যে কে বেশী আধ্যাত্মিক—এ নিয়ে যে বিতর্ক মাঝে মাঝে শোনা যায় তার উত্তরে বোধ করি ভারতীয় অদ্বৈতদর্শনের মুক্তি বা ব্রহ্মতত্ত্বই শ্রেষ্ঠ যুক্তি। পার্থিব বা অপার্থিব যে কোনো স্তরের বাসনা সম্পূর্ণ বর্জন করে আত্মস্বরূপের উপলব্ধিই যদি যথার্থ আধ্যাত্মিকতার মানদণ্ড হয়ে থাকে, তাহলে ভারতবর্ষে এ আদর্শ যেমন সমগ্র

১৩ রবীন্দ্ররচনাবলী : ১৮ খণ্ড : 'পরিচয়' : পৃঃ ৪৫১ (বিশ্বভারতী সং)

জাতির মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট, তেমন আদর্শ য়ুরোপীয় জীবনধারায় অতি অল্পই মেলে।

আবার এ কথাও ঠিক যে, ব্যবহারিক জীবনের আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতার মানদণ্ডে সাধারণভাবে য়ুরোপীয় মানুষ অনেক উন্নত। ভারতবর্ষের নৈতিক শুচিতা মূলতঃ ব্রহ্মচর্যের আদর্শে গড়ে উঠেছে বলেই রামায়ণের সীতার অগ্নিপরীক্ষা অফুরন্ত, আর বুদ্ধ, শংকর, রামানুজের মতো সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা জাতির নেতৃপদে অভিষিক্ত। কামকাঞ্চনত্যাগের এমনি পরিপূর্ণ প্রকাশ ইদানীংকালের শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি গৃহী হয়েও সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী হয়েও গৃহবাসীর আদর্শ।

অপরপক্ষে য়ুরোপীয় চিন্তাধারায় মুক্তি পরমলক্ষ্য নয় বলেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষায় য়ুরোপের যতটা আগ্রহ, ব্রহ্মচর্য ব্রতে স্থিত আত্মান্বেষণের আগ্রহ সে তুলনায় কম। ক্যাথলিক ধর্মে এই ত্যাগভিত্তি থাকার দরুন রামকৃষ্ণানুগামী বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা সেদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। আর যীশুখ্রীষ্টকেন্দ্রিক এ ধর্মমত কি মূলতঃ প্রাচ্য সাধনারই ফল নয়?

প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির প্রতিটি মানুষের সাধনার পথ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, তবু সব বহিরঙ্গ বিভিন্নতার আড়ালে এক হৃদয়স্পন্দনের মত এক ব্রহ্মচেতনায় নিখিলবিশ্ব বিধৃত। ভারতীয় সাধনার মূলমন্ত্র যে 'একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' —এই শ্রুতিবাক্য, সেকথা বৈদিকযুগ থেকে আধুনিককালের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অবধি মন্ত্রে তন্ত্রে বেদ বেদান্তে নানা মতের ও পথের অন্বেষণে সুপ্রমাণিত। অধ্যাত্মচিন্তার এ উদারতা ও সর্বজনীনতার উত্তরাধিকার বাংলা সাহিত্যেও স্বাভাবিকভাবেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রতিষ্ঠিত।

কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিতে' শিব ও বিষ্ণুর কোনো প্রভেদ দেখেন নি—

শ্রীঃ শ্রয়তি যস্য কণ্ঠং কৃষ্ণং তং বিভ্রতঃ ভুজেনাগম্।

দধতং কং কামজটাবলম্বং-শশিখণ্ডমণ্ডনং বন্দে॥

লক্ষ্মী যাঁর কণ্ঠাশ্রিত (অথবা কৃষ্ণশোভা যাঁর কণ্ঠে), কৃষ্ণ যিনি ভুজে কালীয়নাগকে ধারণ করেছেন (অথবা হাতে যাঁর ফণিবলয়), যিনি সুন্দর (বন) মালাধারী (অথবা সুন্দর জটাজুটধারী) ও বর্হাপীড় (অথবা শশিকলামণ্ডিত), তাঁকে বন্দনা করি।

হাজার বছর আগে বৌদ্ধ দোঁহাকার বলেছেন—

অসরীর কোই সরীরহি লুক্কো।
জো তহি জানই সো তহি মুক্কো॥

'এই দেহের মধ্যেই রয়েছেন দেহাতীত যিনি, যে তাঁকে জানে সে তখনই মুক্ত হয়ে যায়।' নাথযোগী তান্ত্রিক সহজযান ও সমকালীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের অন্যান্য ধারার সমন্বয়ে গঠিত চর্যাগীতিকারদের গীতিধারায় যে সত্যসন্ধানের বিদ্রোহ, তারই দুরান্ত ঢেউ বাংলার বাউল গানে। একালের বাউল যখন গেয়ে থাকেন—

খোদা তোমার ডাক শুন্যাছি
মন্দিরে মসজিদে,
তোমার ডাক শুনি সাঁই, চলতে না পাই,
রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে।

—তখন প্রচলিত ধর্মাচারের বিরুদ্ধে চর্যাগীতিকারদের রচনার প্রতিধ্বনি বাজে।

বাংলার সাধনাই মানবমানসের বিভিন্ন স্তরকে মেলাবার সাধনা। তাই বৈষ্ণব আদর্শের ভাবকল্পনাময় বাঙালীই আবার নব্যন্যায়ের প্রবক্তা। বেদান্ত-সিদ্ধান্তের জ্ঞানমার্গী অদ্বৈতদর্শন বাংলার বৈষ্ণবচূড়ামণির দিব্য জীবনস্পর্শে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদে পরিণত হয়ে রাধাকৃষ্ণলীলার অনন্ত রাসমঞ্চ নির্মাণ করে। শক্তি-সাধকের দিব্যদৃষ্টিতে মৃন্ময়ী মাতৃপ্রতিমা চিন্ময়ী দেবীসত্তারূপে সব রূপের পরপারে অভেদজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলা সাহিত্যের এই সমন্বয়ী পটভূমিটি শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভাবের তাৎপর্য উপলব্ধিতে বিশেষ সহায়ক। মনে রাখতে হবে, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় হলেও বিশেষভাবে বাঙালী মননের আলোকেই আমরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রাণময় বিগ্রহ এই দেবমানবকে বুঝতে পারি।

কবি জয়দেবের পরবর্তীকাল থেকে বাংলাসাহিত্যে প্রধানতঃ দুটি ধারা—মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণবকাব্য। এক হিসাবে সাহিত্যিক বিকাশের দিক থেকে এই দুই ধারা আপাত বিপরীতপন্থী। জয়দেবের যে পদাবলীশ্রবণের জন্য রসিক

জনেরা আমন্ত্রিত, সেই পদাবলীর ধারা চৈতন্যজীবনের আশ্রয়ে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মূল ও অনুবাদজাতীয় গ্রন্থের প্রভাবে চৈতন্যজীবনীকাব্যের ইতিহাস ও পুরাণ সৃষ্টি করেছে।

অপরপক্ষে মঙ্গলকাব্যে মাতৃভাবে ঈশ্বরের উপলব্ধি, ধীরে ধীরে বাস্তবধর্মী কাহিনী থেকে শক্তিগীতি রচনায় নূতন এক সংগীত সাহিত্যের প্রবর্তক। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব বাংলার সমাজজীবনের বহুকালের ঐতিহ্য, কিন্তু আদর্শগত দিক দিয়ে এই দুই সাহিত্যধারা পরস্পরের পরিপূরক। একদিকে বৈষ্ণবের ভাব-বৃন্দাবনে নিত্য প্রেমলীলায় রাধাকৃষ্ণের আবির্ভাব, আর একদিকে বাস্তব সংসারের দুঃখ দৈন্য বেদনায় ক্লিষ্ট অথচ চিরসংগ্রামরত কবিহৃদয়ের জগজ্জননীর সঙ্গে আলাপচারী। কোমলে কঠোরে, মধুরে বাৎসল্যে এমন অপূর্ব পরিপূরণ পৃথিবীর অতি অল্প সাহিত্যেই মেলে।

মঙ্গলকাব্যের দেবতাকে যাঁরা শুধুমাত্র পূজাপ্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বী যশোকামী শক্তিরূপে দেখেন তাঁরা বোধ হয় ভুলে যান যে, চাঁদসদাগর বা ধনপতি ভগবানকেও পুরুষবেশে দেখতে চান, মাতৃরূপে দেখতেই তাঁদের আপত্তি। চাঁদসদাগর আবার যদি বা চণ্ডীকে একটু মানেন, মনসাকে কোনো মতেই নয়। ধনপতি তো মঙ্গলচণ্ডীর পূজা স্ত্রীদেবতার পূজা বলেই খড়্গহস্ত। ঈশ্বরের অনুধ্যানেও যাঁরা নারীপুরুষ ভেদ করেন দেবতার শাস্তিস্বরূপ অনুগ্রহ তাঁদের ললাটলিপি।

আধুনিককালে বৈষ্ণবসাহিত্যের একান্ত মানবিক ব্যাখ্যার প্রতি একশ্রেণীর সমালোচকের আগ্রহ বেশী। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের 'বৈষ্ণব কবিতা' নামে অপূর্ব কবিতাটির দূরপ্রসারী প্রভাবে এ মতের উৎপত্তি ও বিস্তার। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করে দেখলেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের অভিমত তাঁর নিজস্ব কবি-জনোচিত উপলব্ধিজাত। বৈষ্ণব সাধনার উদ্ভব ও বিকাশে কোথাও এজাতীয় সিদ্ধান্তের সমর্থন নেই।

একথা স্মরণীয় যে, মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী, শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি ভক্তহৃদয়ধারায় প্রবাহিত বৈষ্ণবের সাধনসংগীতকে উপলব্ধি করা কোনো ইন্দ্রিয়বদ্ধ জীবের সাধ্য নয়। শ্রীচৈতন্য ও তাঁর অনুগামী বৈষ্ণব কবিকুল আগে সাধক, অবশ্যই প্রেমাভক্তির সাধক, তারপরে তাঁরা কবি। চৈতন্যহৃদয়ের যে উদ্বেল প্রেম জাতি ধর্ম বর্ণের সীমা লঙ্ঘন করে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে

সুগ্রথিত ভাববন্ধনে এক জাতীয় সত্তা এনে দিয়েছে তার মূলে তাঁর সেই দৃষ্টি, যে দৃষ্টিতে—'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।'

দার্শনিক পরিভাষায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এবং অদ্বৈতবাদের পটভূমিকায় বাঙালীর শক্তিবাদ—এ দুয়ের মিলন উপলব্ধি না করলে বাঙালীর নিজস্ব ভাব ও প্রতিভা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা অসম্ভব।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে রামমোহন বেদান্তের অদ্বৈতবাদ অবলম্বনে একধরনের একেশ্বরবাদের প্রবক্তা হয়েও কেন তন্ত্রসাধক হরিহরানন্দস্বামীর অনুসরণে মহানির্বাণতন্ত্রের এত অনুরাগী এবং কেনই বা বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অনীহা—সে দিকটিও উনবিংশ শতাব্দীর মননভূমিবিশ্লেষণে আর একটি প্রয়োজনীয় সূত্র।

অপরপক্ষে রামমোহনের জ্ঞাননিষ্ঠ তর্কপ্রমাণের প্রতিক্রিয়ারূপে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের ভক্তি আন্দোলনের পটভূমিতে যথাক্রমে ঔপনিষদিক, বৈষ্ণব ও খ্রীষ্টীয় ভক্তিরসপ্রবাহের ত্রিবেণীরচনাও এ প্রসঙ্গে সমান স্মরণীয়।

সব মিলিয়ে দেখতে গেলে যুক্তি ও অনুভব, মস্তিষ্ক ও হৃদয়, জ্ঞান ও ভক্তি, অলৌকিকতা ও মানবিকতা—এ দুই বিপরীত মেরুর আন্দোলনই সে-যুগের বাঙালী মননের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

শ্রীরামকৃষ্ণপূর্ব বাংলাসাহিত্যে অমর দুটি জীবনীকাব্য, চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত। প্রথমটিতে শ্রীচৈতন্যজীবনের প্রথমার্ধের প্রাণরসময় অভিব্যক্তি। অনুগামী কৃষ্ণদাস কবিরাজ যথার্থই বলেছেন—

> "মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
> বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥"[১৫]

এ অমর কাব্য যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা পাঁচশো বছর পরেও শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির অনুভবধন্য। চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাসের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কারণ দুটি—'পরিত্রাণায় সাধুনাং' এবং 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'—এ দুটিরও মূলকারণ একটি—'ধর্মস্থাপন'।

ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণ উক্তির মাধ্যমে অবতারপুরুষের আবির্ভাবের এই কারণটি

---

১৪ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত : আদিলীলা : চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বকালের ঈশ্বরকল্প মহামানবদের উদ্দেশ্যেই প্রযোজ্য। রাম বা কৃষ্ণের পৌরাণিক যুগ ছেড়ে দিলেও ঐতিহাসিক বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, শঙ্কর, চৈতন্যপ্রমুখ অবতারপুরুষের জীবনে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য মানসিক বা দৈহিক সংগ্রামের (হজরত মহম্মদ স্মরণীয়) মূলে এই ধর্মসংস্থাপনার্থে মনন ও অনুভবের সংগ্রাম সমকালীন জড়শক্তির আতিশয্যের বিরুদ্ধে চৈতন্যশক্তির অভিঘাত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পিতৃদেব আদর্শ ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম হয়তো তাই গদাধরের আবির্ভাবস্বপ্ন দেখেছিলেন। পিতৃদত্ত গদাধর বা গদাই নামের আড়ালে শ্রীরামকৃষ্ণের সৌম্যসাত্ত্বিক মূর্তিব অন্তর্নিহিত কলিমলপ্রধ্বংসী জ্ঞানশক্তির ক্রিয়া স্মরণীয়।

মধ্যযুগের ও সামগ্রিকভাবে বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ কিন্তু ঈশ্বরাবির্ভাবের কারণটি সম্পূর্ণ অন্যদৃষ্টিতে দেখেছেন। ধর্মসংস্থাপন অবতারের অন্যতম কর্তব্য হতে পারে, আসলে ঈশ্বরের আবির্ভাব তাঁর আনন্দ-লীলার প্রয়োজন। অথবা কোনো প্রয়োজনে নয়, শুধুমাত্র লীলারস-আস্বাদনেই তাঁর আবির্ভাবের সার্থকতা। প্রমাণস্বরূপ চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলার পার্শ্বচর-স্বরূপ গোস্বামীর শ্লোকটি তিনি উপস্থাপিত করেছেন—

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মাদেকা—
আত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্ত
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥"[১৬]

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি :
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঞি॥"[১৭]

বাস্তবিক, প্রেমভক্তির আলোকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তেরা মানুষ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধটি অনেক নিকটতর করে তুলেছেন এই লীলারস-আস্বাদনের ভাবকল্পনায়।

১৬, ১৭ শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত : আদিলীলা : প্রথম ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাসংকটে শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের তাৎপর্য ধর্মসংস্থাপন ও আনন্দলীলার যুগ্মপ্রয়োজনে। পাশ্চাত্য সভ্যতার যা অধ্যাত্মসম্পদ তার দিকে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবাসীর দৃষ্টি অতি অল্পই আকৃষ্ট হয়েছিল, মূলতঃ পাশ্চাত্য জীবনধারার বহিরঙ্গ শক্তি ও প্রগতিই আমাদের মুগ্ধ করেছিল বেশী। যে মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রথমে কথা বলতে পারেন নি, তিনি ওই পাশ্চাত্য জীবনমদিরায় আকৃষ্ট স্বধর্মত্যাগী। এ প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠগ্রন্থ শিবনাথ শাস্ত্রীর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে"র অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন বলে মনে করি। এডওয়ার্ড টমসনের "ডিরোজিও জীবনী" থেকে তৎকালীন হিন্দু কলেজের কেরানী হরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণ উদ্ধৃত করে শিবনাথ শাস্ত্রী দেখিয়েছেন, নব্যবঙ্গের দল কিভাবে হিন্দুধর্ম ও সমাজব্যবস্থার প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিল—

"The most glowing harangues were made at debating clubs which were then numerous. The Hindu religion was denounced as vile and corrupt and unworthy of the regard of rational beings. The degraded state of the Hindus formed the topic of many debates; their ignorance and superstition were declared to be the causes of such a state, and it was then resolved that nothing but a liberal education could enfranchise the minds of the people." তখনকার অসংখ্য বিতর্কসভায় ধ্বনিত হত তীব্রতম আক্রমণ। হিন্দুধর্মকে যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষে গ্রহণের অযোগ্য, নিন্দনীয় ও দুর্নীতিপূর্ণ বলে অভিহিত করা হত। হিন্দুদের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থা নানা বিতর্কের উপাদান হয়ে উঠত এবং এজন্য তাদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে দায়ী করা হতো। জনমানসের উন্নতিকল্পে উদারনীতিক শিক্ষাব্যবস্থাই যে একান্ত উপযোগী সে বিষয়ে এঁরা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

স্বভাবতঃই এমন অবস্থায় প্রগতিপন্থী তরুণ-মানসে ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অনুরাগ দেখা দিল। কথাটা মেকলে বলে থাকলেও, একে গ্রহণ করেছিলেন এদেশের তরুণেরাই—"a single shelf of

a good European library was worth the whole native literatures of India and Arabia." "এক সেল্‌ফ্‌ ইউরোপীয় গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমুদয় ভারতবর্ষ ও আরবদেশের সাহিত্যে তা নেই।" মেকলের অতিভাষণপ্রবণতাব উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসাবে এ উক্তিটি আজ আমাদের যতই হাস্যোদ্রেক করুক, সেকালের তরুণসমাজ একথাকে লুফে নিয়েছিল। অথচ আশ্চর্য এই যে এক রামমোহন ছাড়া আর কেউ সেকালে ইসলাম বা খৃষ্টধর্মের নিরপেক্ষ সমালোচনায় অগ্রসর হতে চান নি। ডিরোজিওপন্থীদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দুধর্ম ও সমাজব্যবস্থা।

শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়—"বলা বাহুল্য, কৃষ্ণমোহন্ বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি হিন্দু কলেজ হইতে নবোত্তীর্ণ যুবকদল সর্বান্তঃকরণের সহিত মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা যে কেবল ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া সর্বত্র ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহা নহে, তাঁহারাও মেকলের ধুয়া ধরিলেন, তদবধি ইহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, সেক্সপীয়ার সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মহাভারত, রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া Edgeworth's Tales সেই স্থানে আসিল। বাইবেলের সমক্ষে বেদ, বেদান্ত, গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এই পাশ্চাত্য পক্ষপাত ইয়ং বেঙ্গলের অধিকাংশেরই জীবনে স্থিতধী প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিমাণে স্তিমিত হয়ে এসেছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শশধর তর্কচূড়ামণি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মুখ্যতঃ হিন্দুচিন্তাধারার প্রচারক ও আন্দোলনকারীদেব কথাও স্মরণীয়। ভারতীয় সাধনার প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন কলকাতার তরুণ সমাজকে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ভগবান লাভের কথা মনে করিয়ে দিলেন, তখন থেকেই দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈতের সোপান-পরম্পরায় অধ্যাত্মচেতনার এক সামগ্রিকরূপ ভারতীয়মানসে ফুটে উঠলো। ধর্ম যে শুধু আচার-বিচার, ছোঁয়া-ছুঁয়ি, শাস্ত্রচর্চা বা লেকচার-বক্তৃতার বিষয় নয়—ধর্ম যে শুধু ঈশ্বর আছেন, এ কথাটুকু জানাই নয়, "যো সো

করে" জগৎসংসারের "বড়বাবু"র সঙ্গে আলাপ করা—"জ্ঞানে"র উপরেও যে "বিজ্ঞান"—সে কথাটি সমস্ত জীবন-ভোর প্রমাণ করে শ্রীরামকৃষ্ণদেব উনবিংশ শতাব্দীর বহির্মুখী জীবনজিজ্ঞাসাকে চিরন্তনের অন্তর্মুখীনতায় পরিবর্তিত করেছিলেন।*

তাই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নলগ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের পঞ্চবটী ঘিরে ভারতাত্মার যুগ-যুগান্তব্যাপী ধ্যান পুঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। সে সাধনার ধারাকে একদিকে বহন করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণপ্রাণা সঙ্ঘজননী সারদাদেবী, তদ্গতপ্রাণ বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ শিষ্যবৃন্দ; আর একদিকে গৃহীসাধক নাগমহাশয়, গিরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র প্রমুখ ভক্তবৃন্দ।

প্রচলিত পুঁথিগত পাণ্ডিত্য ও অনুকরণাত্মক সংস্কারের বিরুদ্ধেই কি সবরকম গর্বগত বিদ্যার বিপরীত প্রান্তে একান্ত ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যের নিষ্কিঞ্চন সরলতায় এমন একটি আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল না? বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরাণী'র কাহিনী শুনবার সময় ভবানী ঠাকুরের কাছে প্রফুল্লর শাস্ত্রচর্চা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্য স্মরণীয়—'এর মানে কি জ্ঞান? না পড়লে শুনলে জ্ঞান হয় না। যে লিখেছে, এসব লোকের এই মত, এরা ভাবে আগে লেখাপড়া, তারপর ঈশ্বর; ঈশ্বরকে জানতে হলে লেখাপড়া চাই। কিন্তু যদু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ করতে হয়, তাহলে তার কখানা বাড়ী, কত টাকা, কত কোম্পানীর কাগজ, এসব আগে আমার অত খবরের কাজ কি? যো সো করে—স্তব করেই হোক, দ্বারবানদের ধাক্কা খেয়েই হোক, কোন মতে বাড়ীর ভিতর ঢুকে যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ কর্তে হয়।...আগে রাম, তারপর রামের ঐশ্বর্য জগৎ।"[১৮]

বাইরে ভক্তিময়, অন্তরে পরমজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণ এক হিসাবে তাঁর প্রিয়তম শিষ্যের বিপরীত ব্যক্তিত্ব। তাঁর দৃষ্টিতে অবশ্য 'শুদ্ধ জ্ঞান' ও 'শুদ্ধা ভক্তি' এক। চৈতন্যজীবনীকারদের মতো জ্ঞান ও ভক্তির তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্বের চিন্তা তাঁকে বিচলিত করে নি। কিন্তু আর এক দিক থেকে মাতৃভাবের আরাধনায় যিনি সহধর্মিণীর মাধ্যমে জগতে মাতৃভাবের শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করে গেলেন, তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য তো শুধু জড়বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়। শ্রীচৈতন্যের

---

* বর্তমান লেখকের 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য' গ্রন্থে 'ডিরোজিও: নবযুগের প্রবর্তক' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৮ কথামৃত: দ্বিতীয় ভাগ: ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৪ সালের দিনলিপি।

মতো তিনিও আনন্দ অমৃতের লীলাময় অধিষ্ঠাতা, জগতের উদ্ধার তাঁর আনন্দ-সত্তার বিকিরণে আপনি ঘটবে—মাতৃভাবের পরিপূর্ণ আস্বাদনেই সেই আনন্দময়ের আবির্ভাবের সার্থকতা।

স্বরূপ দামোদরের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাবের কারণ—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা—
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥[১]

"শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কেমন, আমার প্রতি প্রেমে শ্রীরাধা আমার যে মাধুর্য আস্বাদন করে সে মধুরিমাই বা কেমন এবং এইভাবে আমার অনুভবে শ্রীরাধার যে সুখ হয়, সে সুখই বা কেমন—এই তিনটি অনুভূতির লোভে শচীগর্ভরূপ সিন্ধুতে চৈতন্যচন্দ্রের উদয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণও তেমনি বহুবিচিত্র পথ ও মতের অন্তরালে অদ্বয় ব্রহ্মসত্তার আস্বাদন। বৈষ্ণব শাস্ত্রকারদের ব্যাখ্যা অনুসারে বলা যায়, আপন আনন্দের সেই আস্বাদনই অবতারের আবির্ভাবের মূল কারণ।

বুদ্ধ বা খ্রীষ্টের জীবন যেমন সাহিত্যে শিল্পে সংগীতে জীবনচেতনায় বিচিত্র প্রকাশে পরিব্যাপ্ত, তেমনি শ্রীচৈতন্যদেব বা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে সমগ্র বাঙালীজাতির হৃদয়ে ও মননে যুগযুগান্তব্যাপী স্পন্দনের সূচনা।

সমগ্র মধ্যযুগেব বাংলাসাহিত্যে কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব শ্রীচৈতন্যদেব। আর সমগ্র ভারতীয় প্রজ্ঞার সরলতম প্রকাশ 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।' বাংলাসাহিত্য শুধু একবার নয়, দু'দু'বার ঈশ্বরকল্প মহামানবের শ্রীমুখপ্রসাদে ধন্য। এ যদি কলিকালেই ঘটে থাকে, তবে বৈষ্ণবসাধককবির অনুসরণে একথা বারংবার স্বীকার্য যে,—

"প্রণমহোঁ কলিযুগ সবযুগসার।"

শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্বসূরীরূপে আমরা যেমন জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, মালাধর বসু প্রভৃতি কবিকুল এবং শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈত আচার্য, কেশবভারতী প্রমুখ সাধকবৃন্দের কথা ভাবতে পারি, তেমনি

১। চৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

বক্তৃতা

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সূচনারূপে আমরা রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাশরথি, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাধকবৃন্দের ভক্তিসংগীত এবং বৈষ্ণবপদাবলীর ভাবময় ঐতিহ্যের কথা ভাবতে পারি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলা ও ভারতের বুকে মুহুর্মুহু রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পটভূমিকায়ও যে এমন আশ্চর্য ভাবতন্ময় সংগীত-সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, তা বাংলাসাহিত্যের নিগূঢ় প্রাণশক্তিরই অন্যতর প্রমাণ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনা ও সিদ্ধি কোনো একটি মাত্র বিশেষ পন্থা নয়। অনেকটা ভাগবতের অবধূতের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ যখন যে ভাবের সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধককে সামনে পেয়েছেন তাঁরই কাছে অনুসন্ধিৎসু।

অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে, রামমোহনের ক্ষুরধার মনীষা ও বুদ্ধিগত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এদেশে তুলনামূলক ধর্মচিন্তার যথার্থ সূচনা করে, পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ততটা নয়, যতটা ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে। বৈষ্ণব ও তন্ত্র সাধনায় যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণী; বৈদান্তিক সাধনায় তোতাপুরী, ইসলাম সাধনায় গোবিন্দ রায়, এমনি বিভিন্ন সাধক ও সাধিকার পুণ্যচিন্তাপ্রবাহের অনুগামী হয়েও শিষ্যরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদের সকলের মধ্যে এক মূলগত ঐক্যের সন্ধানে সম্পূর্ণ মৌলিক ভাবাদর্শের পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন গুরুর প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণে তাঁর যেমন কৃতিত্ব, তেমনি কৃতিত্ব তাঁর গুরুদের চিন্তা ও সাধনায় যে অপূর্ণতা ছিল তা পূরণ করায়। ভারতবর্ষে অধ্যাত্মসাধনা ও অধ্যাত্মদর্শনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক মতভেদের প্রবণতা যে কী পরিমাণে ছিল, তার উদাহরণ বাংলাদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব এবং দক্ষিণদেশে শৈব ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের কথা যাঁরা জানেন, তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারবেন। বাস্তবিক, বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদে সিদ্ধান্তগত পার্থক্যগুলি অনুধাবন করলে ভারতমনীষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-শক্তিতে যেমন মুগ্ধ হতে হয়, তেমনি এক পরমসত্যের উপলব্ধির দেশে জন্মেও নিজস্ব মতবাদকেই আঁকড়ে ধরে থাকার গোঁড়ামিও আমাদের বিস্মিত করে।

শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনের[২০] বৈশিষ্ট্যই এই মানব-মনস্তত্ত্বের স্তরপরম্পরা প্রদর্শনে। অদ্বয় সত্য যে বিভিন্নকালে বিভিন্ন মানবমানসে বিভিন্নরূপে উদ্ভাসিত এবং

২০ ধর্মমীমাংসা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন: স্বামী বিবেকানন্দ: বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল রচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থের পরিশিষ্ট এবং বর্তমান লেখকের 'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ধর্ম যে এই স্তরপরম্পরারই প্রকাশ সেকথা যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করেছেন, তেমনি নিশ্চিতভাবেই বলে গেছেন, 'এক সনাতন ধর্মই থাকবে, আর সব আসবে যাবে।' বাস্তবিক বিদেশীর ভুল উচ্চারণে আমরা যাকে 'হিন্দুধর্ম' বলে থাকি, সে যে 'সনাতনধর্ম', একথা শ্রীরামকৃষ্ণসাধনার ঐক্যদৃষ্টি ও উদারতার আলোকেই স্বতঃপ্রমাণিত।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলার মননভূমিতে তিনটি ধর্মচিন্তা মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল—হিন্দু বা সনাতন ধর্ম, ইসলাম এবং খ্রীষ্টান। এদেশে ইসলামের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের তেমন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নি, হয়েছিল হিন্দুধর্মের সঙ্গে। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জবাবে রামমোহন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র অবধি অনেকেই অগ্রসর হয়ে এসেছেন। প্রধানতঃ বুদ্ধিজীবী ও অভিজাত সমাজের এই মননযুদ্ধে টোল-ইস্কুল-কলেজের শিক্ষা-সম্পর্ক-বর্জিত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপস্থিতি যে কী বিপুল প্রভাব বিস্তার করে সমগ্র ভারতসংস্কৃতিকে ধারণ করেছে, তা বিংশশতাব্দীর রাজনৈতিক কোলাহলের যুগে আজ আমাদের কল্পনায় আনা কষ্টসাপেক্ষ। কিন্তু সমাজের সর্বোচ্চ ধর্ম থেকে সর্বনিম্ন স্তর অবধি প্রসারিত ও প্রচলিত অধ্যাত্ম চেতনার প্রতিটি প্রান্তকে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রতিভা মূল ধর্ম-মন্দিরেরই অংশরূপে বিন্যস্ত করে দেখালেন, তখনই পাশ্চাত্যের রজোগুণাত্মক বহির্মুখী জীবনসংবেগ-ধাবনের উপযুক্ত শক্তি ভারতাত্মায় সঞ্চারিত হল। আর তখনই আমরা অনুকরণাত্মক আত্মবিসর্জনের হাত থেকে স্বকীয় আদর্শে স্বপ্রতিষ্ঠ। আমাদের ভারতীয়তাবোধ শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মসাধনার বজ্রভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশ্ববোধের পরম সহায়ক হয়ে উঠেছে।

এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাপ্রয়াণের মাত্র বারোবৎসরের মধ্যে মনীষী ম্যাক্সমুলরের—স্বামী বিবেকানন্দ যাঁকে নবযুগের 'সায়ন' নামে অভিহিত করেছেন—বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। প্রধানতঃ স্বামী বিবেকানন্দের সহায়তায় ম্যাক্সমুলর ইংরেজী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে মোটামুটি বিবরণসহ "The Life and Sayings of the Ramakrishna" (শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী) গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন তার ভূমিকায় লিখেছেন—"If we remember that these utterances of Ramkrishna reveal to us not only his own thoughts, but the faith and hope of millions of human beings,

we may indeed feel hopeful about the future of that country. The Conciousness of the divine in man is there, and is shared by all, even by those who seem to worship idols. This constant sense of the presence of God is indeed the common ground on which we may hope that in time not too distant the great temple of the future can be erected, in which Hindus and non-Hindus may join hands and hearts in worshipping the same supreme spirit—who is not far from every one of us, for in him we live and move and have our being." "আমরা যদি একথা মনে রাখি যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সব উক্তি আমাদের কাছে শুধুমাত্র তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারাই নয়, তাঁর স্বদেশের লক্ষ কোটী মানুষের আশা ও বিশ্বাসের প্রতীক, তা হলে অবশ্যই সে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী হতে পারি। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির এই নিয়ত উপলব্ধির ক্ষেত্রেই আমরা আশা করতে পারি যে, অনতিদূর ভবিষ্যতে এমন এক মন্দির নির্মিত হবে, যে মহামন্দিরে হিন্দু এবং অহিন্দু সকলেই সেই পরমসত্তার উপাসনায় সমবেত হবে,—যিনি কখনোই আমাদের থেকে আলাদা কিছু নন, কেননা তাঁরই মধ্যে বিধৃত আমাদের গতি, স্থিতি ও জীবন।"

ম্যাক্সমূলরের কল্পনায় যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, হিন্দু ও অহিন্দুর মিলন-মন্দিরের স্বপ্ন ধরা দিয়েছিল, বিংশ শতাব্দীতে বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণমন্দির বা রামকৃষ্ণ মিশনের ইনষ্টিট্যুট অফ্ কালচার কি অনেকটা সে স্বপ্নের প্রতিরূপ হয়ে ওঠে নি? বলা বাহুল্য, ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতসভ্যতার রূপান্তরেই এই মিলনমন্দিরের যথার্থ প্রকাশ।

ঈশ্বরের নিজের হাতেগড়া যে কটি আদর্শ মানুষ এ পৃথিবীতে পথপ্রদর্শনের জন্য দেখা দেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তাঁদের একজন ভেবে মনীষী রমঁ্যা রলঁ্যা লিখেছিলেন—

"......his mission was to seek those who were a stage behind him and with them, in fulfilment of the mother's will, to found a new order of men, who would transmit his message and teach to the world of truth containing all

others. This word was "Universal"—the union and unity of all the aspects of God, of all the transport of love, and knowledge, of all forms of humanity. Until then nobody had sought to relive more than one aspect of the being. All must be realised, that was the duty of the present day. And the man who fulfilled it by identifying himself with each and all of his living brethren, taking unto himself their eyes, their senses; their brain and heart, was the pilot and the guide for the needs of the new age."[২১]

যাঁরা তাঁর আদর্শের অনেকটা কাছাকাছি, তাঁদের স্বকীয় আদর্শে উন্নীত করে এক নূতন সঙ্ঘ গড়ে তোলা ছিল তাঁর স্বপ্ন। সেই সঙ্ঘবদ্ধ মানুষেরা সমস্ত জগতে তাঁর বাণী ও উপদেশাবলী ছড়িয়ে দেবে। "বিশ্বজনীনতা"ই তাঁর বাণী—যার মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের সমগ্র অভিব্যক্তি-বৈচিত্র্য, মানব-মানসে ভক্তি ও জ্ঞানের যাবতীয় পন্থা। তাঁর আগে আর সবাই ঈশ্বরের বিশেষ কোনো একটি মাত্র প্রকাশকেই অবলম্বন করেছেন। সর্ব ভাবই তো উপলব্ধি করা প্রয়োজন। আধুনিক যুগের এই তো কর্তব্য। পৃথিবীর সব মানুষের দর্শন শ্রবণ বুদ্ধি হৃদয় নিয়ে যিনি সকলের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছেন, তিনিই নবযুগের গুরু ও সারথি।

শ্রীরামকৃষ্ণসাধনার বিশ্বজনীনতা জার্মানি ও ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দুজন মরমীদৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্বমানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—এইটি প্রমাণ করাই এ দুজন যথার্থ মনীষীর রচনাংশ উদ্ধৃতির কারণ নয়। কী অমেয় ভাবগভীরতায় শ্রীরামকৃষ্ণ দেশ-দেশান্তরের গুণীচিত্তে ভাবস্পন্দন তুলেছেন, সেইটি স্মরণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

রামমোহন, মধুসূদন, কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ যাঁরা পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের দ্বারা প্রাচ্যের ভাববিনিময়ে সহায়তা করেছেন, তাঁদের চেয়ে কায়িক দূরত্বে থেকেও শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন করে বিশ্বভুবনের সব আন্তরিক সাধকদের প্রাণের সঙ্গে মিলে যেতে পারেন, তেমন অতুলনীয়

---

২১. The Life of Ramkrishna : Romain Rolland P. 191-192 ; 1947 Edition.

বিশ্বাত্মতা সব দেশে সব যুগেই একান্ত বিরল। বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যের অন্তর্লীন বিশ্বতোমুখী ভাবাদর্শের প্রাণসত্তা শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণস্বরূপের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধির অধিকারী স্বামী বিবেকানন্দ হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে শ্রীনবগোপাল ঘোষের বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রতিকৃতি-স্থাপনের সময় যে প্রণামমন্ত্রটি রচনা করেন, তাতে শ্রীরামকৃষ্ণসত্তার দুটি বৈশিষ্ট্য স্মরণীয়—তিনি ধর্মসংস্থাপক ও সর্বধর্মস্বরূপ—

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥[২২]

—প্রথম দুটি কারণেই শেষ বিশেষণ অবতারবরিষ্ঠ। পূর্ব পূর্ব ঈশ্বরকল্প মহামানবদের অধ্যাত্মসাধনার মিলিত সমষ্টি শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের কারণ-ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য—"আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত-বিবদমান, আপাত-প্রতীয়মান-বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা প্রতিযোগী, আচারসঙ্কুল সম্প্রদায় সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম নামক যুগ যুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনাদি-বর্তমান, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তার সহযোগী শাস্ত্র কি প্রকারে সংক্ষিপ্তসংস্কার ঋষিহৃদয়ে আবির্ভূত হন, তাহা দেখাইবার জন্য ও এবম্প্রকারে শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইলে ধর্মের পুনরুদ্ধার, পুনঃস্থাপন ও পুনঃপ্রচার হইবে, এইজন্য বেদমূর্তি ভগবান এই কলেবরে বহিঃশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন।"[২৩]

বাংলা ১৩০৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পঞ্চষষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রচারিত এই রচনাটির মূল নাম 'হিন্দুধর্ম কি?' লক্ষণীয় যে, উদ্বোধন পত্রিকা প্রকাশের এক বছর আগে প্রকাশিত এ প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যুগাবতার রূপে

---

২২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড

২৩ হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ২য় সং : পৃঃ ৫

ঘোষণায় স্বামীজী অকুণ্ঠ। পাশ্চাত্যে প্রচারের সময় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর সর্বজনীনতার উপরেই বেশী জোর দিলেও এদেশে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারসত্তার উপরে জোর দেওয়ার কারণ তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস যেমন, তেমনি ভারতীয় চিন্তাধারার পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের বিশিষ্টতা। এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজের উক্তি স্মরণীয়—"এখন মানুষের ভিতর ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ দেখিয়ে দিচ্ছে। যেন বলছে আমি মানুষের ভিতর রইচি, তুমি মানুষ নিয়ে আনন্দ কর। তিনি শুদ্ধ ভক্তের ভিতর বেশী প্রকাশ—তাই নরেন্দ্র, রাখাল এদের জন্য এত ব্যাকুল হই। জলাশয়ের কিনারায় ছোট ছোট গর্ত্ত থাকে, সেইখানে মাছ, কাঁকড়া এসে জমে, তেমনি মানুষের ভিতর ঈশ্বরের প্রকাশ বেশী।

এমন আছে যে শালগ্রাম হতেও বড় মানুষ, নরনারায়ণ। প্রতিমাতে তাঁর আবির্ভাব হয় আর মানুষে হয় না? তিনি নরলীলা করবার জন্য মানুষের ভিতর অবতীর্ণ হন, যেমন রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব। অবতারকে চিন্তা করলেই তাঁর চিন্তা করা হয়।"[২৪]

এক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের পরে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা পাঠকের স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়বে। 'যে রাম যে কৃষ্ণ' তিনিই যে একাধারে রামকৃষ্ণ একথা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর অনুগত ভক্তদের অনেকবার জানিয়ে গেছেন। বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিশ্বাসী যাঁরা ঈশ্বরতত্ত্বের মনোমত গ্রহণ বর্জনে প্রবণতা দেখিয়ে থাকেন, তাঁরা সেকালে বা একালে অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার স্বামী সারদানন্দ তাঁর "শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" (সাধকভাব) গ্রন্থে আধুনিক চিন্তাধারার পটভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে লিখেছেন—"অবতার পুরুষসকলে...দেব এবং মানব উভয় ভাবের একত্র সম্মিলন আজীবন বিদ্যমান থাকায় সাধনকালেই তাঁহাদিগকে কখন কখন সিদ্ধের ন্যায় প্রকাশ ও শক্তিসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দেব এবং মানব উভয় ভূমিতে তাঁহাদিগের স্বভাবতঃ বিচরণ করিবার শক্তি থাকাতে এইরূপ হইয়া থাকে, অথবা ভিতরের দেবভাব তাঁহাদিগের সহজ স্বাভাবিক অবস্থা হওয়ায় উহা তাঁহাদিগকে মানবভাবের বহিরাবরণকে সময়ে সময়ে ভেদ করিয়া ঐরূপে স্বতঃপ্রকাশিত হয়,—মীমাংসা যাহাই হউক না কেন, ঐরূপ

২৪ কথামৃত : ৫ম ভাগ · ১৮৮৪, ৯ই মার্চের দিনলিপি।

ঘটনা কিন্তু অবতার পুরুষসকলের জীবন মানববুদ্ধির নিকটে দুর্ভেদ্য জটিলতাময় করিয়া রাখিয়াছে। ঐ জটিল রহস্যের কখনও যে সম্পূর্ণ ভেদ হইবে, বোধ হয় না। কিন্তু শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উহার অনুশীলনে মানবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, একথা ধ্রুব। প্রাচীন পৌরাণিক যুগে অবতার চরিত্রের মানব ভাবটি ঢাকিয়া চাপিয়া দেবভাবটিরই আলোচনা করা হইয়াছিল—সন্দেহশীল বর্তমান যুগে ঐ চরিত্রের দেবভাবটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া মানবভাবটির আলোচনাই চলিয়াছে। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা ঐ চরিত্রের আলোচনায় উহাতে তদুভয় ভাব যে একত্র একই কালে বিদ্যমান থাকে, এই কথাই পাঠককে বুঝাইতে প্রয়াস করিব।"[২৫]

দেবমানব বা Man God—যে ভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক না কেন, সাধারণ যুক্তি তর্কের পরিমাপে এ দিব্যচরিত্রের উপলব্ধি সম্ভব নয়। তবু আমরা যে তাঁর চরিত্র অনুধ্যানের চেষ্টা করি, তার দ্বারা আমাদেরই মানসসমুন্নয়ন ঘটে মাত্র। সারদাদেবী, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ বিভিন্ন পার্ষদ ও পরিকরবৃন্দের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমার যে পরিচয় আমরা পাই, তা খুব কাছের লোকের দেখা হ'লেও সাধনা ও চারিত্র্যে তাঁরাই শ্রীরামকৃষ্ণরূপ জীবন-সত্যের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। আবার এক হিসাবে যত সময় অতিক্রান্ত হয় ততই কালের কষ্টিপাথরে এ জাতীয় দেবমানবের জীবনসত্য প্রোজ্জ্বল হতে থাকে। বুদ্ধ বা যীশুর জীবনবেদ সম্যক অবধারণের জন্য কয়েকশো বছর অতিবাহিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও একথা সমান সত্য।

অধ্যাত্মরাজ্যের ব্যক্তিত্বকে সাধারণ যুক্তিপ্রমাণের জীবনীর আদর্শে কখনোই পুরো ফুটিয়ে তোলা যায় না। তবু সে প্রয়াসের মূল্য এইখানে যে, পুরাণের অতিরঞ্জন মুছে গেলেই আদর্শের প্রতিফলন সাধারণ জীবনে সম্ভব ও স্বাভাবিক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যাঁরা অবতাররূপে স্বীকার করেছেন, তাঁদের চেয়ে যাঁরা বিশিষ্ট মানবরূপে দেখেছেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এইজন্যই বিশেষভাবে আলোচনাযোগ্য। আচার্য কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গিরিশচন্দ্র সেন, এবং বিদেশী লেখকদের মধ্যে ম্যাক্সমূলর ও রঁম্যা রলাঁ্যার রচনা এদিক থেকে স্মরণ করা চলে। কিন্তু লক্ষণীয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণীর অন্তর্নিহিত আলোকসত্তার বিকিরণ এই রচনাগুলির মধ্যেও এমনভাবে প্রকাশিত যে

২৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ : সাধকভাব : ১৩৬২ সংস্করণ : পৃঃ ৩০-৩১

অবতারতত্ত্ব স্বীকৃতি .বা অস্বীকৃতির কোনো প্রশ্নই উক্ত রচনাবলী পাঠের সময় আমাদের মনে জাগে না।

শ্রীচৈতন্যজীবনী-পাঠকালে যেমন অলৌকিক ঘটনাবলী স্বীকার না করেও চৈতন্যদেবের ত্যাগ, তপস্যা, ভক্তিতন্ময়তা ও অনন্ত প্রেমমহিমায় মুগ্ধ হতে হয়, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী পাঠকালেও আমরা তাঁর জীবনের অলৌকিক প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগদীপ্তি ও ভগবৎ ব্যাকুলতায় মণ্ডিত আনন্দঘন ব্যক্তিত্বে নিবিষ্ট হতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—'মানুষে তাঁর বেশী প্রকাশ।' এই কথাটিই অন্য ভাবে চণ্ডীদাস গেয়েছিলেন—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' মানুষ সত্তার প্রতি এই শ্রদ্ধারই প্রকাশে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি—'জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীব সেবা'।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত Humanism বা মানবিকতাবাদ এবং পাশ্চাত্য সাম্যবাদের অন্তর্নিহিত Materialism বা জড়বাদ—এ যুগে মানুষের ধারণাকে অনেক পরিমাণে ইন্দ্রিয়সীমায় আবদ্ধ করে এনেছে। ভারতবর্ষে বহুকালব্যাপী অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতার চর্চার ফলে আমরা বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলিকে প্রায় ভুলতে বসেছিলুম। যথার্থ মানবিকতাবাদ এই বাস্তব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে ইন্দ্রিয়াতীত অধ্যাত্মসত্যের সম্মেলনেই সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে নরনারায়ণ, বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বিশেষভাবে দরিদ্র-নারায়ণ। মানুষের মধ্যে এই পরমচৈতন্যের উদ্বোধনই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মানবিকতাবাদ। আর এই মানবিকতাবাদই ভারত-ইতিহাস-সম্মত।

আধুনিককালে আমরা সাধারণতঃ যে মানবিকতাবাদের কথা শুনতে পাই, গ্রীক মানবিকতাবাদের অনুসরণে তা মানবজীবনকে মৃত্যুসীমায় আবদ্ধ করে দেখে বলে, মানবচৈতন্যের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি তার অমৃত অভয় সত্তার কথা সে মননে প্রায় উপেক্ষিত। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, "মানুষ কি কম গা। মানুষ ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে, অনন্তকে ধারণায় আনতে পারে।"[২৬] —এইখানেই মানুষের যথার্থ মহিমা। তাই ভারতীয় বেদান্তবাদের ভিত্তিতে পাশ্চাত্য মানবিকতাবাদকে

---

২৬ শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : ৫ম ভাগ : ১৮৮৪, ২৪শে মে তারিখের দিনলিপি। ওই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—'অন্য জীবজন্তুর ভিতরে, গাছপালার ভিতরে, আবার সর্বভূতে তিনি আছেন; কিন্তু মানুষে বেশী প্রকাশ। অগ্নিতত্ত্ব সর্বভূতে আছে, সব জিনিষে আছে; কিন্তু কাঠে বেশী প্রকাশ।

সম্পূর্ণ করে দেখাতেই আমাদের ভাবসমন্বয়ের আদর্শ। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে এই মানুষই অনন্ত মহিমময় ব্রহ্মসমুদ্রের ঢেউ—'অহং ব্রহ্মাস্মি'।

বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে মানসপটভূমির কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম তার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের তাৎপর্যটুকু প্রণিধানের চেষ্টাই বড় ছিল। বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব প্রসঙ্গে এই বক্তব্যের আলোকেই আমরা পরবর্তী আলোচনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হবো।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী আমেরিকা থেকে উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীকে যে চিঠিতে 'বাঙ্গালাভাষা' প্রসঙ্গে কিছু মৌলিক মন্তব্য করে পাঠিয়েছিলেন তাতে "বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা লোকহিতায় এসেছেন, তাঁরা সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন"—বলে চলতি ভাষার সপক্ষে খুব জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু অন্যত্র তিনি এ জাতীয় কথাও বলেছেন যে, সংস্কৃতভাষায় আমাদের শ্রেষ্ঠ চিন্তারাশি নিবদ্ধ থাকার দরুনই ভারতীয় মনীষার চিরন্তন ধৃতিশক্তি। নিজে তিনি 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র পাশাপাশি 'বর্তমান ভারতে'র মতো মন্ত্রগূঢ় গদ্যও লিখেছেন। এদিক থেকে স্বামীজীর চলতি ও সাধু উভয় প্রকার গদ্যই বাংলাভাষাশিল্পে স্মরণীয়। বিবেকানন্দ রচনাবলী যাঁরা বিশেষভাবে অনুধাবন করেছেন তাঁরা লক্ষ্য করবেন যে, বিবেকানন্দ-সাহিত্যে চলতিভাষার যে প্রসাদগুণ, ধ্বনি-সৌন্দর্য, অর্থগভীরতা, চিত্রকারু এসব কিছুর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীমাধুর্যের গভীরতম যোগ। অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথাশিল্পের প্রকাশভঙ্গী আমাদের যতই মুগ্ধ করুক, তার সঙ্গে ভারত-মনীষার বহু সহস্র বৎসরের ধ্যান ধারণা ও ভাব-রূপায়ণের নিবিড় সম্পর্ক, সেকথাটি সর্বাগ্রে স্মরণীয়। অতি সরল উপমাচিত্রল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেছেন, তা 'ল্যাজামুড়ো বাদ দিয়ে' নিলেও বেদ-বেদান্তের চরম কথা। সুতরাং সরলতম প্রকাশ ও গভীরতম মনন—এ দুদিক থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারীর দ্বারা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন।

তাছাড়া প্রত্যেক অবতারকল্প মহাপুরুষের জীবনেই দেখতে পাই, তাঁদের ত্যাগ, তপস্যা ও সাধনাময় মর্ত্যরূপের অন্তরালে একটি কবিত্বময় সূক্ষ্মশরীর থাকে। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শংকর, চৈতন্য—এঁদের সম্বন্ধে একথা তো বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাই এঁদের বাণী শুধু অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্য-

রসাস্বাদনের ক্ষেত্রেও স্মরণীয় এবং মানবমনের অতলান্তরহস্য অনুসন্ধানে এঁদের অন্তর্দৃষ্টি যুগে যুগে-কবিতা, গল্প, নাটক, সংগীত, কথাসাহিত্য প্রভৃতি সাহিত্য-সাধনার বিচিত্র প্রকাশে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। মহৎ জীবনই মহৎ সাহিত্যের উপাদান। সেকথা এঁদের জীবনের দ্বারা যতটা প্রমাণিত তেমন আর কিছুতে নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণজীবন ও বাণীর আড়ালে তেমনি এক স্পন্দমান কবিচেতনার অনুভব আমরা কান পাতলেই শুনতে পাই। আসলে গভীরতম মনন ও কাব্যোপলব্ধিতে কোনো পার্থক্য নেই। মরমী কবি ব্লেক যে কাব্যের সঙ্গে দর্শনের সংযোগে আপত্তি করেছেন, তার কারণ, অনেক সময়ই কাব্যের ছলে তত্ত্ব নিজেকে জাহির করে বসে। কিন্তু মহত্তম তত্ত্ব যেখানে অনুভূতির মন্দাকিনী প্রবাহে সারস্বত সাবলীলতা লাভ করে, কোনো সন্দেহ নেই তখনই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আবির্ভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী-সৌন্দর্যের অনুধ্যানের জন্য এখন সামান্য কিছু উদাহরণ বিভিন্ন সূত্র থেকে আহরণ করা যেতে পারে।

(ক) "যেমন উকীলকে দেখিলে কাছারীর কথা মনে পড়ে, সেইরূপ ভক্তকে দেখিলে জগতের রাজাকে মনে পড়ে।"[২৭]

(খ) "আনন্দময়ী ভৌতিক জগৎরূপ চিক ফেলিয়া দিয়া তাহার ভিতর থাকিয়া খেলা করিতেছেন।"[২৮]

(গ) "এক একবার বেশ ভাব হয়, কিন্তু থাকে না কেন? বেঁশো আগুন নিবে যায়, ফুঁ দিয়া রাখিতে হয়। সাধন চাই।"[২৯]

(ঘ) "যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই, যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলচে, দুলচে, শক্তি বা কালীর উপমা।...কালী 'সাকার আকার নিরাকারা'।"[৩০]

(ঙ) "ঈশ্বর দর্শন করলে কর্মত্যাগ হয়। আমার ঐ রকমে পূজা উঠে গেল। কালীঘরে পূজা করতাম। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময়—কোষাকুষী,

২৭, ২৮, ২৯ সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস

৩০ কথামৃত: ১ম ভাগ: ১৮৮৪, ১৯শে অক্টোবরের দিনলিপি।

বেদীঘরের চৌকাঠ—সব চিন্ময়। মানুষ, জীব, জন্তু—সব চিন্ময়! তখন উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দিকে পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলাম।—যা দেখি তাই পূজা করি।

একদিন পূজার সময় শিবের মাথায় বজ্র দিচ্ছি। এমন সময়ে দেখিয়ে দিলে এই বিরাট মূর্তিই শিব। তখন শিব গড়ে পূজা বন্ধ হলো, ফুল তুলছি হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যে ফুলের গাছগুলি যেন এক একটি ফুলের তোড়া।"[৩১]

(চ) "গোপীদের ভক্তি প্রেমাভক্তি; অব্যভিচারিণী ভক্তি; নিষ্ঠা ভক্তি।"

কি রকম জান? যেমন বাড়ীর বউ। দেওর, ভাসুর শ্বশুর স্বামী সকলের সেবা করে, পা ধোবার জল দেয়, গামছা দেয়, পিঁড়ে পেতে দেয়, কিন্তু এক স্বামীর সঙ্গেই অন্যরকম সম্পর্ক।[৩২]

(ছ) "এই সংসার ধোঁকার টাটি—জ্ঞানী বলছে। যিনি জ্ঞান-অজ্ঞানের পার, তিনি বলছেন 'মজার কুঠি'। সে দ্যাখে ঈশ্বরই জীব জগৎ, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন।

"তাঁকে লাভ করবার পর সংসার করা যেতে পারে। তখন নির্লিপ্ত হতে পারে। ও দেশে ছুতোরদের মেয়েদের দেখেছি—ঢেঁকি নিয়ে চিঁড়ে কোটে, এক হাতে ধান নাড়ে, এক হাতে ছেলেকে মাই দেয়—আবার খরিদ্দারের সঙ্গে কথাও কচ্চে, তোমার কাছে দু' আনা পাওনা আছে—দাম দিয়ে যেও। কিন্তু তার বার আনা মন হাতের উপর—পাছে হাতে ঢেঁকি পড়ে যায়।

"বার আনা মন ঈশ্বরেতে রেখে চার আনা লয়ে কাজ করা।"[৩৩]

(জ) "সৎসঙ্গ সর্বদাই দরকার। গঙ্গার যত কাছে যাবে ততই শীতল হাওয়া পাবে; অগ্নির যত কাছে যাবে ততই উত্তাপ পাবে।

...ছেলেকে ব্যাকুল দেখলে তার বাপ তিন বৎসর আগেই হিস্সে ফেলে দেয়।

মা রাঁধছে, কোলের ছেলে শুয়ে আছে। মা মুখে চুসি দিয়ে গেছে, যখন চুসি ফেলে চীৎকার করে ছেলে কাঁদে, তখন মা হাঁড়ি নামিয়ে কোলে করে ছেলেকে মাই দেয়।

সংসারে থাক আর যেখানেই থাক, ঈশ্বর মনটি দেখেন। বিষয়াসক্ত মন যেমন ভিজে দেশলাই, যত ঘসো জ্বলে না।"

৩১ কথামৃত. ৩য় ভাগ: ১৮৮৪, ২রা মার্চের দিনলিপি।

৩২ তদেব: ২য় ভাগ: ১৮৮৩, ২রা জুনের দিনলিপি।

৩৩ তদেব: ৪র্থ ভাগ: ১৮৮৪, ১৪ই সেপ্টেম্বরের দিনলিপি।

"সকলেরই ভিতরেই তিনি রয়েছেন। তবে গ্যাস কোম্পানীর কাছে আর্জি কর, তোমার ঘরের সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে। তবে ব্যাকুল হয়ে আর্জি করতে হয়। এমনি আছে তিনটান একসঙ্গে হলে ঈশ্বরদর্শন হয়। 'সন্তানের উপর মায়ের টান, সতী স্ত্রীর স্বামীর উপর টান, আর বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান। "ঠিক ভক্তের লক্ষণ আছে, গুরুর উপদেশ শুনে স্থির হয়ে থাকে। বেহুলার গানের কাছে জাতসাপ স্থির হয়ে শুনে, কিন্তু কেউটে নয়। আর একটি লক্ষণ, ঠিক ভক্তের ধারণাশক্তি হয়। শুধু কাঁচের উপর ছবির দাগ পড়ে না, কিন্তু কালি মাখান কাঁচের উপর ছবি ওঠে; যেমন ফটোগ্রাফ; ভক্তিরূপ কালি।"[৩৪]

(ঝ) "যারা তাঁকে ধরে থাকে, তারা···বিষম্ শোকেও একেবারে তলিয়ে যায় না। একটু নাড়াচাড়া খেয়েই সামলে যায়। চুনোপুঁটির মত আধারগুলো একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে বা তলিয়ে যায়। দেখনি? গঙ্গায় স্টীমারগুলো গেলে জেলেডিঙ্গিগুলো কি করে? মনে হয় যেন এইবারে গেল—আর সামলাতে পারলে না। কোনখানা বা উল্টেই গেল। আর বড় বড় হাজারমুনে কিস্তিগুলো দুচারবার টালমাটাল হয়েই যেমন তেমনি—স্থির হলো। দুচারবার নাড়া কিন্তু খেতেই হবে।"[৩৫]

(ঞ) "কালীরূপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দূরে বলে। দূরে বলে সূর্য ছোট দেখায়। কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা করতে পারবে না। আবার কালীরূপ কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূর বলে। যেমন দীঘির জল দূর থেকে সবুজ নীল বা কালোবর্ণ দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে করে জল তুলে দেখ, কোন রঙ নাই।

তাই বলছি বেদান্তদর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তার কি স্বরূপ তা মুখে বলা যায় না, কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য, ঈশ্বরের নানারূপও সত্য। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।"[৩৬]

(ট) "ভক্তেরা—বিজ্ঞানীরা—নিরাকার সাকার দুইই লয়—অরূপ রূপ দুইই গ্রহণ করে। ভক্তিহিমে ঐ জলেরই খানিকটা বরফ হয়ে যায়। আবার জ্ঞানসূর্য উদয় হলে ঐ বরফ গলে আবার যেমন জল তেমি হয়।"[৩৭]

---

৩৪ কথামৃত: ৫ম ভাগ: ১৮৮৩, ১০ই জুনের দিনলিপি।

৩৫ লীলাপ্রসঙ্গ: গুরুভাব: পূর্বার্ধ: ১৩৬২ সং. পৃঃ ২৬-২৭

৩৬ কথামৃত. ১ম ভাগ: ১৮৮২, ২৮শে অক্টোবরের দিনলিপি

৩৭ তদেব: ৪র্থ ভাগ. ১৮৮৫, ১৪ই জুলাইয়ের দিনলিপি

(ঠ) "যতদিন সংসারে ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে ততদিন কর্মত্যাগ করতে পারে না। যতক্ষণ ভোগের আশা ততক্ষণ কর্ম। একটি পাখী জাহাজের মাস্তুলে অন্যমনস্কে বসে ছিল। জাহাজ গঙ্গার ভিতর ছিল, ক্রমে ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে পড়ল। তখন পাখীর চটকা ভাঙলো, সে দেখল চতুর্দিকে কূল-কিনারা নাই। তখন ডাঙ্গায় ফিরে যাবার জন্য উত্তর দিকে উড়ে গেল। অনেক দূর গিয়ে শ্রান্ত হয়ে গেল, তবু কূল-কিনারা দেখতে পেলে না। তখন কি করে, ফিরে এসে আবার মাস্তুলে বসল।

অনেকক্ষণ পরে পাখীটা আবার উড়ে গেল, এবার পূর্ব দিকে গেল। সে দিকে কিছুই দেখতে পেলে না, চারিদিকে কেবল অকূলপাথার। তখন ভারী পরিশ্রান্ত হয়ে আবার জাহাজে ফিরে এসে মাস্তুলের উপর বসল। অনেকক্ষণ জিরিয়ে একবার দক্ষিণদিকে গেল। এইরূপে আবার পশ্চিম দিকে গেল। যখন দেখল কোথাও কূল-কিনারা নেই তখন সেই মাস্তুলের উপর বসল, আর উঠল না। তখন নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল। তখন মনে আর কোনও ব্যস্তভাব বা অশান্তি রইল না। নিশ্চিন্ত হয়েছে, আর কোন চেষ্টা নাই।"[৩৮]

মূলতঃ উপনিষদের এই চিত্রকল্পটি নানা সাধকের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পনাকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু গল্পটি চলতি বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে কাব্যময় এক সুরধ্বনিতে যেভাবে বিন্যস্ত, সেইখানে রামকৃষ্ণদেবের অন্তর্নিহিত কথাশিল্পী-সত্তার কৃতিত্ব।

অধ্যাত্মরাজ্যের সংকেত, প্রতীক, উপলব্ধি, অনুভবের রহস্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত বা তাঁর অন্যান্য বাণীসংগ্রহ ভরপুর। সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশনের লণ্ডন-শাখার কর্মী (জাতিগতভাবে আমেরিকান) স্বামী যোগেশানন্দ তাঁর 'The Visions of Sri Ramakrishna' গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক দিব্যদর্শনের কথা, যা তিনি বিভিন্নসময়ে বিভিন্নজনের কাছে বলেছিলেন, তার একটি সুন্দর সংগ্রহ উপস্থাপিত করেছেন—অবশ্য, ইংরেজী ভাষায়। এ জাতীয় দর্শনের কথা আমরা আধুনিক জীবনচরিতকারের দৃষ্টিতে এড়িয়ে যাওয়াই প্রয়োজন মনে করি। অথচ ঈশ্বরীয় অনুভূতি ও দর্শনের জগৎই এ জাতীয় মহাপুরুষদের যথার্থ মনোজগৎ। সেই জগৎটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথনে যেভাবে রূপে-অরূপে বিভাসিত, তার পরিচয় সাধকদের ক্ষেত্রে তো মূল্যবান বটেই, সাহিত্যের

৩৮ কথামৃত : ৩য় ভাগ : ১৮৮৫, ১৩ই জুনের দিনলিপি।

ক্ষেত্রেও তার মূল্য অপরিসীম। কবিকল্পনায় যে অসীম সত্যকে আভাসিত করার প্রয়াস মেটারলিংক বা রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকে রয়েছে, তার সঙ্গে তুলনায় রামকৃষ্ণদেবের অধ্যাত্মউপলব্ধির নিদর্শন এই 'কথামৃত', প্রত্যক্ষ সত্যের উপস্থাপনায় ও অসীম অনন্তের ব্যঞ্জনায় পাঠকচিত্তকে যথার্থ অধ্যাত্মজগতের সঙ্গে পরিচিত করে। তবু একথা স্মরণীয় যে, তিনি এ জাতীয় উপলব্ধির অতি সামান্যই ভাষায় প্রকাশ করতে পেরেছেন, কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সমাধির মহামৌনতায় স্তব্ধ হয়ে গেছেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য হাজার বছর আগেকার বৌদ্ধ গান ও দোঁহার সময় থেকেই অরূপসত্যের রূপায়ণে সচেষ্ট। বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত পুরাণ-মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব ও শাক্তের সংগীতধারা, বাউল-দেহতত্ত্ব-তর্জা-কবিগান-যাত্রা-কথকতা প্রভৃতি নানা মাধ্যমে এই আত্মিকসত্যের রূপায়ণের প্রবাহে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব। একদিকে সর্বভারতীয় সাধনা এবং অন্যদিকে বাঙালীর নিজস্ব মনন ও কল্পনার ঐতিহ্য—এ সব কিছুকে গ্রহণ করে প্রতিদিনের চলিত কথায় শ্রীরামকৃষ্ণসাহিত্য উচ্চতম দার্শনিক ভাবনাকে আমাদের নিত্যসঙ্গী করে তুলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর মাধ্যমে বাংলা-ভাষায় নিঃশব্দে কয়েকহাজার বছরের অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা এক নিজস্ব ভঙ্গিমায় নিতান্ত ঘরোয়া অথচ নিগূঢ় উপলব্ধির স্পর্শ নিয়ে দেখা দিয়েছে। বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব তাই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঘটনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ : কবিসত্তা

স্বামী বিবেকানন্দের অনুধ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী : 'আমি আদি কবি।'

'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটি স্বামীজী লিখেছিলেন ১৮৯৪-এর গ্রীষ্মঋতুতে আমেরিকায় বসে। অদ্বৈত অনুভবের একাকার সমুদ্রে লীন বিবেকানন্দ-মানস-আকাশে ধ্বনিত হয়েছিল এই রামকৃষ্ণবাণী : 'আমি আদি কবি।'

"মেরুতটে হিমানীপর্বত,
যোজন যোজন সে বিস্তার,
অভ্রভেদী নিরভ্র আকাশে
শত উঠে চূড়া তার।
ঝকমকি উঠে হিমশিলা
শত শত বিজলী প্রকাশ।
উত্তর অয়নে বিবস্বান্,
একীভূত সহস্র কিরণ,
কোটী বজ্রসম করধারা
ঢালে যবে তাহার উপর,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে মূর্ছিত ভাস্কর,
গলে চূড়া শিখর গহ্বর।
বিকট নিনাদে খসে পড়ে গিরিবর
স্বপ্নসম জলে জল যায় মিলে।
সর্ব বৃত্তি মনের যখন
একীভূত তোমার কৃপায়,
কোটী সূর্য অতীত প্রকাশ,
চিৎসূর্য হয় হে বিকাশ,
গলে যায় রবি, শশী, তারা,
আকাশ পাতাল তলাতল,
এ ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ সমান।

... ...

শ্লথ হৃদয়ের তন্ত্রী যত
খুলে যায় সকল বন্ধন,
মায়া মোহ হয় দূর,
বাজে তথা অনাহত ধ্বনি—তব বাণী
—শুনি সসম্ভ্রমে দাস তব প্রস্তুত সতত
সাধিতে তোমার কাজ।—
'আমি বর্তমান।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি যবে,
প্রলয়ের কালে,
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়,
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ,
নাহি থাকে রবি শশী তারা,
সে মহানির্বাণ, নাহি করণ কারণ,
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার বুকে,
আমি বর্তমান।'
... ...

'আমি আদি কবি
মম শক্তি বিকাশ রচনা
জড় জীব আদি যত
আমি করি খেলা শক্তিরূপা মম মায়া সনে
একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।'

'আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশ রচনা
জড় জীব আদি যত,
মম আজ্ঞাবলে
বহে ঝঞ্ঝা পৃথিবী উপর,
গর্জে মেঘ অশনি-নিনাদ,

মৃদুমন্দ মলয়-পবন
আসে যায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে ;
ঢালে শশী হিম করধারা,
তরুলতা করে আচ্ছাদন ধরাবপু,
তোলে মুখ শিশির মার্জিত
ফুল্ল ফুল রবি পানে।'[১]

আমরা জানি বিবেকানন্দ কবি ছিলেন, সেদিক থেকে বিবেকানন্দের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ 'আদি কবি'। শ্রীরামকৃষ্ণের কবিসত্তারই অন্যতর প্রকাশ বিবেকানন্দের কবিহৃদয়। বিবেকানন্দের ধ্যাননেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে বেদান্তের দিক দিয়ে 'আদি কবি'—সব সৃষ্টির পরপারে 'স্বে মহিম্নি' বিরাজিত পরব্রহ্ম, যাঁর সিসৃক্ষার লীলাতরঙ্গে জগতের অভ্যুদয়। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে জগতের অন্যতম সেরা কবিতা ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের ভাষায়—

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং
তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্॥
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যো কবয়ো মনীষা॥
(ঋগ্বেদ-দশম মণ্ডল)

'সৃষ্টির আগে এ জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও সলিলে আবৃত ছিল, এই তুচ্ছ অজ্ঞানে আবৃত জগৎ পরমস্রষ্টার তপস্যার মহিমায় নবজন্ম লাভ করলো। সর্বপ্রাণীর অন্তরের পূর্বকল্পসঞ্চিত কর্মফলের বশে স্রষ্টার অন্তরে সৃষ্টিবাসনার উদয়। কবি বা ত্রিকালদর্শীরা হৃদয় ও মননের দ্বারা বিচার করে বুঝেছিলেন যে বন্ধনের হেতু প্রাণিসমূহের কর্মরাশি অব্যাকৃত কারণে অবস্থিত।'

ইন্দ্রিয়ের ভাষায় অমূর্তসত্যকে প্রকাশের এই প্রচেষ্টা আমাদের এমন এক বিশ্বাস ও উপলব্ধির তীরে নিয়ে যায় যা 'অবাঙ্মনসোগোচরম্'—স্বামীজীর ভাষায় —'বোঝে প্রাণ বোঝে যার।'[২]

বিবেকানন্দ-ভাগীরথীর উৎসগোমুখী হিমগিরি শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি অবতার, যিনি

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : 'গাই গীত শুনাতে তোমায়'

২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : 'প্রলয় বা গভীর সমাধি' গান দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তিরূপে বিশিষ্ট ; আর পরিণতির মহাসমুদ্র সেই শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি অনাদি অনন্ত কারণবারিধি, নির্বিশেষে ব্রহ্মস্বরূপ। ভক্তি ও জ্ঞান, কর্ম ও যোগ—এই পিতাপুত্র ও গুরুশিষ্যের হৃদয়সম্বন্ধে চিরকালের মত ভারতাত্মার পটভূমিতে বিধৃত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিকে নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ অদ্বয় সত্তাই স্বামীজীর ভাষায়—

"ভাস্বর ভাব-সাগর চির উন্মদ প্রেম পাথার।"[৩] তিনি মানুষের কাছে মানুষ হয়ে ধরা দিয়েছেন, ভক্তের জন্য অনুরাগীর জন্য সেই অনন্ত সমুদ্রের নিরন্তর আহ্বান। ঋজুকুটিল নানা পথে জগতের ছোট বড় সব নদী তাঁরই উদ্দেশে ছুটে চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—'আমি বলি, সকলেই তাঁকে ডাকছে, দ্বেষাদ্বেষির দরকার নেই। কেউ বলছে সাকার, কেউ বলছে নিরাকার। আমি বলি যার সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই চিন্তা করুক, যার নিরাকারে বিশ্বাস, সে নিরাকারই চিন্তা করুক। কবীর বলতো, 'সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ, কাকো নিন্দো কাকো বন্দো দোনো পাল্লা ভারী'।"[৪]

শুধু কি ভক্তই তাঁকে ডাকে ? তিনিও কি ভক্তকে ডাকেন না ? নইলে তাঁকে 'চির উন্মদ প্রেম পাথার' বলা কেন ? নদীই কেবল সমুদ্রকে ডাকে না, সমুদ্রও নদীকে ডাকে—শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন একদিন ডেকেছিলেন, 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্ আয়।'

আবার শ্রীরামকৃষ্ণের উপমায়—"প্রদীপ জ্বাললে বাদুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে—ডাকতে হয় না। চুম্বক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস ? এস বলতে হয় না—লোহা আপনি চুম্বক পাথরের টানে ছুটে আসে।"[৫] দক্ষিণেশ্বরের আকাশে বাতাসে সঞ্চারিত শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বান যোগ্যজনের হৃদয়দুয়ারে ধ্বনি তুলেছে, আজও তুলে চলেছে। তিনি খবরের কাগজে লিখে বা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে অথবা দলগত শক্তির জোরে কাউকে ডাকেন নি, কিন্তু সে অমোঘ আহ্বান যার হৃদয়ে বেজেছে তাকে শ্রীরামকৃষ্ণসান্নিধ্যে আসতে হয়েছে, আসতে হবেই, কারণ এ আহ্বান আমাদের অন্তরতম সত্তার আহ্বান। শ্রেষ্ঠ কবির কাজ তাঁর বাণীতে এই অন্তরবাসী সত্তাকে জাগানো।

---

৩ তদেব : শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিক।

৪ কথামৃত

৫ কথামৃত ১ম : ১৫ই জুন, ১৮৮৪ তারিখের দিনলিপি

আদিকবি যিনি আদিস্রষ্টা, তিনি আমাদের স্পন্দিত করে চলেছেন, আবার আমরাও তাঁকে জাগিয়ে তুলি। তাই তো তিনি জাগ্রত দেবতা হয়ে ওঠেন সময় ও স্থান বিশেষে। "ভক্ত যেমন ভগবান না হলে থাকতে পারে না, ভগবানও ভক্ত না হলে থাকতে পারেন না ; তখন ভক্ত হন রস ভগবান হন রসিক, ভক্ত হন পদ্ম ভগবান হন অলি, তিনি নিজের মাধুর্য আস্বাদন কবার জন্য দুটি হয়েছেন, তাই রাধাকৃষ্ণলীলা।"৬

নিত্য থেকে লীলা এবং লীলা থেকে নিত্য—এমনি 'ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'র সাধনাই কবির সাধনা। 'অপাবে কাব্যসংসাবে কবিরেব প্রজাপতি'—কিন্তু স্বয়ং স্রষ্টার মত কবি আর কে? তিনি 'কবির অন্তরে কবি।' পৃথিবীর সব কবিই একভাবে না একভাবে নিজেকে আবিষ্কাব করেছেন, বুঝেছেন যে পবমসত্য আমাদেবই অন্তর্লোকে, অথচ ধরা না দিলে তাঁকে ধরা যায় না—যিনি 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—যাঁকে তিনি স্বয়ং বরণ করেন, তাঁর কাছেই ধরা দেন।

ভক্ত হলে 'আমি তুমি' চাই সন্দেহ নেই, কিন্তু শেষ অবধি তো তুমিই থাকে, তাই অদ্বৈতই কবিতার শেষ কথা। কাব্যরস তখন শুধু ব্রহ্মাস্বাদসহোদর নয়, স্বয়ং ব্রহ্মাস্বাদস্বরূপ। বাচ্যের সংকেতে বচনাতীতকে ধরা—কবিতার এ রীতিরই চবম অভিব্যক্তি বেদ, উপনিষৎ, গীতা, ধম্মপদ, বাইবেল, কোরাণ, কথামৃত—জগতেব শ্রেষ্ঠ ধর্মোপলব্ধির প্রকাশ।

আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৮ তারিখের চিঠিতে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ইংরেজী ভাষায় বক্তব্য প্রকাশের সাধনপ্রচেষ্টার কথা এইভাবে বলেছেন—"To put the Hindu ideas into English and make out of dry philosophy and intricate mytholgy and queer startling psychology, a religion which shall be easy, simple, popular, and at the same time meet the requirments of the highest minds, is a task which only those can understand who have attempted it: the abstract Advaita must become living—poetic—in everyday life ; out of hopelessly intricate Mythology must come concrete moral forms and

---

৬ কথামৃত ৫ম ১০ই অক্টোবর, ১৮৮১

out of bewildering yogism must come most scientific and practical psychology—and all this must be put into such a form that a child may grasp it. That is my life's work."[৭]

"হিন্দুভাবধারাকে ইংরেজীতে প্রকাশ করা এবং শুষ্ক দর্শন, জটিল পুরাণ ও বিচিত্র মনোবিজ্ঞানের মধ্যে থেকে এমন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করা যা একদিকে সহজ, সরল ও হৃদয়গ্রাহী হবে আবার অন্যদিকে উচ্চতম মনীষার উপযোগী হবে—এ এমন দুঃসাধ্য কাজ যে, এ কাজে যারা উদ্যোগী হয়েছে, তারাই এর মর্ম বুঝতে পারবে। বিমূর্ত অদ্বৈততত্ত্বকে প্রতিদিনের জীবনে জীবন্ত ও কবিত্বমণ্ডিত করে তুলতে হবে ; অসম্ভব জটিল পুরাণ কাহিনীর মধ্যে থেকে নৈতিক আদর্শের প্রতিমূর্তি চরিত্ররাশি আবিষ্কার করতে হবে ; আর দুরূহ যোগরাশির মধ্য থেকে সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারোপোযোগী মনস্তত্ত্ব আবিষ্কার করতে হবে, যাতে একটি শিশুও তা বুঝতে পারে, এই আমার জীবনের ব্রত।"

এ ব্রত বাংলাভাষায় উদ্‌যাপন করে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বিবেকানন্দের সঙ্কলিত প্রতিটি সূত্রই শ্রীরামকৃষ্ণসাহিত্যে প্রমাণিত। বিশেষভাবে স্মরণীয় স্বামীজীর এই বাক্যাংশ—"The abstract Advaita must become living—poetic···" "বিমূর্ত অদ্বৈততত্ত্বকে জীবন্ত ও কবিত্বময় করে তুলতে হবে"—এ আদর্শের প্রত্যক্ষ জীবন্ত বিগ্রহের পদপ্রান্তে এসেই তো নরেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দে পরিণতি। স্বল্পসীমার জীবনবৃত্তের শেষপ্রান্তে এসে বিবেকানন্দ তাঁর সেই তরুণজীবনের মুহূর্তটির কথাই মনে করেছেন—"যতই যাই হোক, জো, আমি এখন সেই আগেকার বালক বই, আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত, আর বিভোর হয়ে যেত ···আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর! —যাতে প্রাণের ভেতরটা পর্যন্ত কণ্টকিত করে তুলছে।"[৮]

শ্রীরামকৃষ্ণবাণীমুগ্ধ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নিজেকে প্রশ্ন করেছেন—"আমি কেন তাঁর কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে যাব? শুধু আমি নই, আমার মত আরও বেশ কিছু লোক কেন তাঁর কথা এমনি শুনতে যায়?"—নিজেই উত্তর দিয়েছেন, "পুণ্যাত্মা এই মহাপুরুষ হিন্দুধর্মের মাধুর্য ও গভীরতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

৭ Letters of S. Vivekananda p. 302 1949 Edn.

৮ বাণী ও রচনা : ৮ম খণ্ড : ১ম সংস্করণ : পৃঃ ১৩১।

ইন্দ্রিয়চেতনাকে সম্পূর্ণ দমন করে ইনি প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছেন। তাঁর সবটাই পরম পবিত্রতায়, পরম আনন্দে, আত্মিক সত্যে ও ধর্মচেতনার প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ। সিদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসীরূপে তিনি জগতের অন্তঃসারশূন্যতা ও মিথ্যা স্বরূপের সাক্ষী। ভগবান ছাড়া তাঁর নিষ্কিঞ্চন জীবনে আর অন্য কোন চিন্তা, চেষ্টা, সম্বন্ধ বা বান্ধব নেই। ভগবানই তাঁর পক্ষে একান্ত এবং একমাত্র প্রয়োজনীয়। নিষ্কলুষ পবিত্রতা, বাক্যের অগোচর গভীর আনন্দময় উপলব্ধি এবং ঈশ্বরে সর্বময় ভালোবাসাই তাঁর জীবনে একমাত্র সার্থকতা।"[৯]

অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর অন্তরালে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন। তাঁর ব্যক্তিত্বপ্রভাবে যে গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, তার বাইরে থেকেও প্রতাপচন্দ্রের অনুভবে শ্রীরামকৃষ্ণের যে সত্তাটি ধরা দিয়েছে, তাও তাঁর কবিসত্তার স্বরূপ, আবার শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর আর এক অলোকসামান্য মনীষী ম্যাক্সমূলরের কাছে মনে হয়েছে, 'he was a poet, an enthusiast, or if you like, a dreamer of dreams ;" 'তিনি ছিলেন কবি, প্রেরণাদাতা অথবা যদি আপনারা পছন্দ করেন তো বলতে পাবেন স্বপ্নদ্রষ্টা।'[১০]

অথচ শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর অনন্ত ভাণ্ডারের কতটুকুই বা ম্যাক্সমূলরের গোচরে এসেছিল। ম্যাক্সমূলর অবশ্য একথা উপলব্ধি করেছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণবাণী কেবল তাঁর নিজস্ব কথন নয়, বহু যুগ যুগান্তের ভারতাত্মার পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার বাণী। রমঁ্যা রলঁ্যা অনুভব করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণবাণী বিশ্বজনীন—'Universal'.

আর আমরা যারা বাঙালী, তাদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ পল্লীবাংলার চালচিত্রের পটভূমিতে এক অনিন্দ্যসুন্দর বাক্‌প্রতিমা, যাকে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে যখন তখন যেখানে সেখানে মুগ্ধবিস্ময়ে আবিষ্কার করি নিতান্ত আপনজনের ভালোবাসাকে অনুভব করার মতো। আমাদেরই ঘরকন্না, পথঘাট, সংসার-সমাজ, জীবন ও সাধনা—এসব কিছুর সঙ্গে এত অন্তরঙ্গ, অথচ এত অনন্তসংকেতময় তাঁর প্রতিটি শব্দচিত্র। আবার প্রতিটি শব্দে স্বচ্ছন্দচারী সহজ কথার অনলংকৃত ভঙ্গিমা। শ্রেষ্ঠ অলংকার তো প্রাণের সৌন্দর্যে, তাকে বাইরের ভূষণে সাজাতে

---

৯ The Theistic Quartarly Review. October—December, 1879 PP. 32—39 (সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দ্রষ্টব্য।) মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত।

১০ Ramakrishna : His Life and Sayings : Max Muller : 1st Edition PP. 93—94

হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণবাণী একান্ত বাঙালীর বলেই বিশ্বমনকে এত সহজে স্পর্শ করে। তাঁর জীবনে বা বাণীতে কোথাও কোনো 'ভাবের ঘরে চুরি' বা কৃত্রিমতার ছায়া নেই। অনুবাদের মাধ্যমেও সেই মৌলিক সরসতা বিনষ্ট হয় না। ইংরেজী বাইবেল যে কত অনুবাদের অনুবাদ সে কথা কি আমরা মনে রাখি? আর কথামৃত বা অন্যত্র বিধৃত শ্রীরামকৃষ্ণবাণী তো একেবারে উৎস থেকে আহরিত গঙ্গোদক—বাঙালীর জীবন ও ভাষণকে যা চিরপবিত্র করে চলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীসৌন্দর্যের কয়েকটি ভাগ করা চলে আলোচনার স্তরপরম্পরা বোঝার জন্য। প্রথমতঃ তাঁর ব্যক্তিজীবনের উপলব্ধির কথা। দ্বিতীয়তঃ গ্রামে ও শহরে যে জীবনপরিচয় তাঁর ঘটেছে তার মধ্য থেকে আহরিত উপাদান। তৃতীয়তঃ শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর সাধনার সংযোগে মিলিত অনুভূতির রূপায়ণ।

প্রত্যেক মানুষেরই একটি বিশেষ সংস্কার থাকে, যার দ্বারা তার প্রধান পরিচয়। শিশু গদাই থেকে পরিণত শ্রীরামকৃষ্ণ অবধি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন-কাহিনীর ধারা অনুসরণ করে গেলে আমরা দেখতে পাই আশৈশব শ্রীরামকৃষ্ণ অপার্থিব ভাবলোকের অধিবাসী। তাঁর নিজের ভাষায় ছয় কি সাত বছর বয়সের প্রথম ভাবাবেশ—"সেটা জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাসে হবে·· ···একদিন সকালবেলা টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের আলপথ দিয়ে ক্ষেতে যাচ্ছি। আকাশে একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ উঠেছে—তাই দেখছি ও যাচ্ছি, দেখতে দেখতে মেঘখানা প্রায় আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, এমন সময় এক ঝাঁক সাদা দুধের মত বক ঐ কালো মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো। সে এমন একটা বাহার হলো!—দেখতে দেখতে অপূর্ব তন্ময় হয়ে এমন একটা অবস্থা হলো যে আর হুঁস রইল না। পড়ে গেলুম—মুড়িগুলো আলের ধারে ছড়িয়ে গেল। কতক্ষণ এইভাবে পড়েছিলুম বলতে পারি না। লোকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে বাড়ী নিয়ে এসেছিল। সেই প্রথম ভাবে বেহুঁস হয়ে যাই।"[১১]

দেবী বিশালাক্ষীদর্শনে যাবার পথে গদাধরের ভাবাবেশের কথা আমরা জানি, যাত্রায় শিবের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে শিবভাবের তন্ময়তার কথাও মনে পড়ে—সেই বালক বয়স থেকেই ভাববিভোর এক কবিসত্তা শ্রীরামকৃষ্ণ-হৃদয়ে সদা জাগরূক। কামারপুকুরের পল্লী পরিবেশ থেকে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে পুণ্যবতী রাণী রাসমণির দেবায়তনে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ভাবধারার মিলিত সমাবেশে এবং

১১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ সাধকভাব পৃঃ ৪৭ (১৩৬২ সংস্করণ।)

এখানকার নির্জন উদ্যানের রমণীয়তা ও কলনাদিনী গঙ্গার পরিবেশে এই ভক্ত কবির হৃদয়ে অনন্ত সত্য ও সুন্দরের অনুধ্যানের যোগ্য আবহ সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নেই।

ছোটবেলা থেকেই যাত্রা, কথকতা, পাঁচালির গানে পুরাণের ভক্তিরসমণ্ডিত ভাবসাধনার উত্তরাধিকার তাঁর সহজাত সংস্কারের সহায়ক। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাশরথি এবং বৈষ্ণব পদাবলীর গানে তাঁর ভাবের ভুবনটি পরিপূর্ণ। শাস্ত্রবাক্যের আগে এই গানের জগতের মাধ্যমেই শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মসত্যের সঙ্গে পরিচয়। আবার ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন সাধুপুরুষদের সঙ্গলাভের ফলে শাস্ত্রের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও গভীর। সাধারণ পুঁথিগত বিদ্যার আগে স্মরণীয় এই সব পুথিলেখকদের ধ্যান ও মনন। শ্রীরামকৃষ্ণ চালকলাবাঁধা বিদ্যা শেখেন নি বটে, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে সমবেত সাধুসন্ন্যাসীদের কাছ থেকে অধ্যাত্মবিদ্যা সংগ্রহ করেছেন, আর সে সবই শ্রুতিপথে, এক হিসাবে প্রাচীন ভারতীয় শ্রুতিবিদ্যার ঐতিহ্যই শ্রীরামকৃষ্ণের ঐতিহ্য। ফলে স্বভাবজ কবিধর্ম, বাংলার সংগীত সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় এবং শ্রুতি ও সাধনলব্ধ পরাজ্ঞান—এই ত্রিবেণীসংগমে কবি শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয়।

শৈশবের ভাবতন্ময় গদাধরের কাছে পরমসত্যধরা দিয়েছিলেন জগজ্জননীরূপে। মায়ের সেই ভুবনমোহিনী রূপ—'চাউনিতে জগৎ নড়ছে'—সে রূপ তো সারা জীবনভোর শ্রীরামকৃষ্ণের নয়নে হৃদয়ে বচনে স্বপনে ব্যাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এই প্রথম দিনের দর্শনানন্দ একটু ভাষাগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হলেও জগতের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধির অন্যতম উদাহরণরূপে আমাদের চিরস্মরণীয়—

"মার দেখা পাইলাম না বলিয়া তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা, জলশূন্য করিবার জন্য লোকে যেমন সজোরে গামছা নিঙড়াইয়া থাকে, মনে হইল হৃদয়টাকে ধরিয়া কে যেন তদ্রূপ করিতেছে! মার দেখা বোধ হয় কোন কালেই পাইব না ভাবিয়া ছটফট করিতে লাগিলাম, অস্থির হইয়া ভাবিলাম, তবে আর এ জীবনের আবশ্যক নাই, মার ঘরে যে অসি ছিল, দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পড়িল। এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া উহা ধরিতেছি, এমন সময়ে সহসা মার অদ্ভুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম। তাহার পর বাহিরে কি যে হইয়াছে, কোন দিক দিয়া সেদিন ও তৎপর দিন যে গিয়াছে তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই। অন্তরে কিন্তু একটা অননুভূতপূর্ব

জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং যার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম।"[১২] কিন্তু কি সেই সাক্ষাৎ প্রকাশের রূপ বা অনুভব ?

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষার সামান্য রূপান্তরে তা এইরকম—"ঘরদ্বার মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল,—কোথাও যেন আর কিছুই নাই। আর দেখিতেছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃসমুদ্র।—যে দিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তাহার উজ্জ্বল উর্মিমালা তর্জন গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে। দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল।"[১৩]

এই জ্যোতিঃসমুদ্রের মাঝখানেই কি মহাকালী রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল? শ্রীরামকৃষ্ণ যখন যেভাবের সাধনায় ডুবে যেতেন, তখন সেই ভাবের রূপমূর্তি তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে ধরা দিত। সুতরাং এর পর থেকে যখন মার বরাভয়করা চিন্ময়ী মূর্তি ব্যাকুল ভক্তের কাছে বারে বারেই ধরা দিতেন, তখন এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে এ জ্যোতির তরঙ্গ মহাকালীর আবির্ভাববার্তা ঘোষণা করেছিল। আবার একথাও ঠিক যে রামপ্রসাদের ভাষায় 'কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম', অথবা 'তারা আমার নিরাকারা'—এই ভাবসত্যেরও প্রতিমূর্তিরূপে ঐ জ্যোতিঃসমুদ্রকে গ্রহণ করা চলে।

ভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ মধুরভাবের সাধনায় দেখেছিলেন শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি নাগকেশরের কেশরের মতো, অনেক পরবর্তীকালে স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ ভক্তদের কাছে মাঠ থেকে বিশেষ এক ধরনের [নীলরঙ] ঘাসফুল তুলে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'তখন তখন যে কৃষ্ণমূর্তি দেখতাম তাঁর অঙ্গের এইরকম রঙ ছিল।'[১৪] কত বৈষ্ণব কবিই তো রাধাকৃষ্ণরূপমাধুরীর অনুধ্যানে বিভোর, কল্পনার সে কবিতা আর অধ্যাত্ম প্রত্যক্ষের এই রূপদৃষ্টি—এ দুয়ের মধ্যে সৌন্দর্যরসের ঐক্যটুকু লক্ষণীয়।

মধুর ভাবসাধনায় সিদ্ধিলাভের পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনায় অদ্বৈত-অধিষ্ঠানের যুগ। বিবেকানন্দের ভাষায় 'abstract Advaita'-এর (বিমূর্ত অদ্বৈতের) poetic (কবিত্বময়) প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকাব্যের আর একটি দিক। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে' বিধৃত দুটি ঘটনা আমরা স্বামী সারদানন্দজীর ভাষা

১২, ১৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ . সাধকভাব . পৃঃ ১২৭-২১

১৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ . সাধকভাব পৃঃ ২৯৪, ২৯৮

অবলম্বনেই তুলে ধরছি।—"কালীবাটীর উদ্যানের স্থানবিশেষ নবীন দূর্বাদলে সমাচ্ছন্ন হইয়া এক সময়ে রমণীয়দর্শন হইয়াছিল। ঠাকুর উহা দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, ঐ স্থানকে সর্বতোভাবে নিজ অঙ্গ বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন। সহসা এক ব্যক্তি ঐ সময়ে ঐ স্থানের উপর দিয়া অন্যত্র গমন করিতে লাগিল। তিনি উহাতে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়া এককালে অস্থির হইয়া পড়িলেন। ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "বুকের উপর দিয়া চলিয়া যাইলে যেমন যন্ত্রণার অনুভব হয়, ঐকালে ঠিক সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলাম।"[১৫]

আর একটি ঘটনাও বহুবিদিত। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুভবের অদ্বৈত মহিমাস্মরণে বিশেষভাবে স্মরণীয়—"কালীবাটীর চাঁদনী সমাযুক্ত বৃহৎঘাটে দণ্ডায়মান হইয়া ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে গঙ্গাদর্শন করিতেছিলেন। ঘাটে তখন দুইখানি নৌকা লাগিয়াছিল এবং মাঝিরা কোন বিষয় লইয়া পরস্পর কলহ করিতেছিল। কলহ ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়া সবল ব্যক্তি দুর্বলের পৃষ্ঠদেশে বিষম চপেটাঘাত করিল। ঠাকুর উহাতে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার এই কাতর ক্রন্দন কালীঘরে হৃদয়ের কর্ণে সহসা প্রবেশ করায় সে দ্রুতপদে তথায় আগমনপূর্বক দেখিল, তাঁহার পৃষ্ঠদেশ আরক্তিম হইয়াছে এবং ফুলিয়া উঠিয়াছে। ক্রোধে অধীর হইয়া হৃদয় বারংবার বলিতে লাগিল, "মামা কে তোমায় মারিয়াছে দেখাইয়া দাও, আমি তার মাথাটি ছিঁড়িয়া লই।" পরে ঠাকুর কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে মাঝিদিগের বিবাদ হইতে তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাতজনিত বেদনাচিহ্ন উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, ইহাও কি কখনও সম্ভবপর!"[১৬]

অধ্যাত্মজগতের এই দর্শন ও অনুভবের স্মরণীয় ঘটনাগুলি আপনাদের কাছে পরপর সাজিয়ে দেওয়ার কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্নিহিত সত্তাটির ক্রমবিকাশ আমাদের মননলোকে জাগ্রত করা। অন্তরের এই মানুষটিকে আমরা যত অনুধ্যান করতে পারবো, ততই তাঁর বাণীর গভীরার্থ আমাদের প্রাণে সঞ্চারিত হবে। অনুভূতির এই সর্বোচ্চশিখর থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণবাণীপ্রবাহের অবতরণ।

কবিতাই সাধনা হতে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু যদি এমন সাধক মেলে যার সাধনা ও কবিতা এক, সেই সঙ্গে যিনি নিজেও পরম সাধ্য—তাহলে কি

১৫, ১৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ . সাধকভাব : পৃঃ ৩৩৮-৩৯

ঘটে তা শ্রীচৈতন্যলীলায় আমরা একবার প্রত্যক্ষ করেছি। বাস্তবিক শ্রীচৈতন্য-জীবনের অনন্তপ্রসারিত অনুভবসমুদ্রের দু চারটি হিল্লোল কল্লোলও যাঁরা শুনতে পেয়েছেন, 'নারদভক্তিসূত্রে'র ভাষায় 'পরমবিরহাসক্ত' এই সাধকের ক্রমবর্ধমান দিব্যোন্মাদনার কথা যাঁরা জানেন, তাঁরা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, এমন একটি জীবনই একটি গোটা কবিতা।

যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণীর ভাষায় 'এবার নিত্যানন্দের খোলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব।' বুঝি বা রাধাকৃষ্ণ মিলিতসত্তার প্রকাশরূপে শ্রীচৈতন্যবিগ্রহের কথা স্মরণ করেই গৃহ ও সন্ন্যাস—এ দুয়ের শ্রেষ্ঠ আদর্শের সম্মেলনরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছিলেন যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণী। শ্রীচৈতন্য অবশ্য তাঁর স্বানুভবের কথা কিছু কিছু শ্লোকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, আক্ষরিক অর্থেই কবিতা লিখেছেন তিনি। তেমনি ভাবতে পারি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বা শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-পুরীর কথা। তারও আগে বেদ উপনিষদের জানা অজানা আরও অনেক কবিই অধ্যাত্ম অনুভবের অনবদ্য বাণীরূপ দিয়েছেন ভারতীয় সাহিত্যে। অতীত সম্পদের দু চারটি কণিকা এক্ষেত্রে স্মরণীয়। আমরা রূপ থেকে অরূপের পথে যাবো এই স্মৃতিচারণের মাধ্যমে।

রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তে বিধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিরচিত একটি শ্লোক এই রকম—

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥[১৭]

কৃষ্ণদাস কবিরাজের অনুবাদ—

সংকীর্তন হৈতে পাপসংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥[১৮]

সংস্কৃত শব্দসৌন্দর্যের স্নিগ্ধগম্ভীর ঘোষণায় মহাপ্রভুর মূল শ্লোকখানি একখণ্ড

১৭, ১৮ চৈতন্যচরিতামৃত: অন্ত্যলীলা: বিংশ পরিচ্ছেদ

জলভরা মেঘের মতো ভক্তচিত্তে শ্যামলছায়া বিস্তার করে। শ্রীচৈতন্যদেবের পরম গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সিদ্ধিশ্লোকরূপে পরিচিত আর একটি শ্লোকের তন্ময় ব্যাকুলতার কথা মনে পড়ে—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে,
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরম্,
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥[১৯]

হে দীনদয়াল প্রভু মথুরানাথ, কবে তোমার দেখা পাব? তোমার অদর্শনে কাতর এ হৃদয়। হে দয়িত! ব্যাকুল অন্তর! বলে দাও কী করবো!

অথবা ধরুন লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের আনন্দঘন উপলব্ধির কাব্যপ্রকাশ—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্,
মধুগন্ধিমৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরম্ মধুরম্ মধুরম্ মধুরম্॥[২০]

মধুর—মধুর চেয়ে মধুর প্রভুর (কৃষ্ণের) দেহ। মধুর—মধুর চেয়ে মধুর তাঁর মুখখানি। মধুসৌরভময় তাঁর দেহ, তিনি মধুর, মধুর, মধুর, মধুর।

বিশ্বচরাচরের কেন্দ্রে যে শিবশক্তির লীলা চলেছে আচার্য শঙ্কর তাকেই রূপ দিয়েছেন তাঁর 'হরগৌর্যষ্টকে'—

কস্তুরিকাচন্দনলেপনায়ৈ শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥
... ...
অম্ভোধরশ্যামলকুন্তলায়ৈ বিভূতিভূষাঙ্গ জটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥[২১]

---

১৯ জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেমদান। পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর।
এই শ্লোক পড়ি তেঁহো কৈল অন্তর্দ্ধান। সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্যঠাকুর॥
(চৈতন্যচরিতামৃত · অন্ত্যলীলা : ৮ম পরিচ্ছেদ)

২০ কৃষ্ণকর্ণামৃত

২১ স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানকল্পনায় হিমালয় এই হরগৌরীর মিলিত মূর্তি।

'কস্তুরীচন্দনভূষিতা দেবীকে প্রণাম, প্রণাম শ্মশানভস্মভূষণ দেবদেবকে, সৎকুণ্ডলধারিণীকে প্রণাম, প্রণাম সর্পকুণ্ডলধারীকে, প্রণাম শিবানীকে প্রণাম শিবকে।···মেঘোপম কুন্তলা দেবীকে প্রণাম, প্রণাম বিভূতিভূষণ জটাধারীকে, জগজ্জননীকে প্রণাম, প্রণাম জগতের পিতাকে, প্রণাম শিবানীকে, প্রণাম সেই শিবকে।'

রূপ সৌন্দর্যের পারে অপরূপের জগৎ আমাদের নিরন্তররূপের জগতে আহ্বান করে।

নির্বাণ বা অদ্বৈত মুক্তির প্রেরণায় শঙ্করাচার্যের 'নির্বাণ ষটকম্' স্তোত্রে নেতির সত্যও অপূর্ব কবিতায় পরিণত—

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে॥
ন ব্যোম ন ভূমির্ণ তেজো ন বায়ু—
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্॥[২২]

উপনিষদের কবি তাঁর ব্রহ্মানুভবের সত্যও এমনি নেতির ভাষায় ফুটিয়েছেন—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ॥
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥[২৩]

কঠোপনিষদ স্বামী বিবেকানন্দের কাছে কাব্য ও উপলব্ধির চূড়ান্ত উদাহরণ।

---

২২ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার কিছুই আমি নই, শ্রুতি, জিহ্বা, ঘ্রাণ বা দৃষ্টিশক্তি কিছুই আমি নই, আমি আকাশ, মাটি, আগুন, বাতাস কিছুই নই, আমি শুধু চিদানন্দরূপ শিব, আমি শিব।

২৩ সেই ব্রহ্মকে সূর্য প্রকাশ করেন না, চন্দ্র তারকাও নয়, এই সব বিদ্যুৎও নয়, এই অগ্নি কেমন করে করবে। তিনি প্রকাশমান বলেই সব বস্তু তাঁর অনুযায়ী দীপ্তিমান হয়, তাঁরই দীপ্তিতে নানারূপে যা কিছুর প্রকাশ।

[স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষদ গ্রন্থাবলী (১ম) দ্রষ্টব্য]।

তিনি যা নন, তাঁকে সেদিক থেকে যেমন বোঝা যায়, তেমনি বোঝা যায়, তিনি কি তারই ইতিমূলক অনুধ্যানে—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ (কেনোপনিষৎ)
শ্রবণে যিনি শ্রুতির শ্রুতি, মনের মন মানসে,
প্রাণের প্রাণ হৃদয়ে যিনি, আঁখির আঁখি নয়নে,
বচনে যিনি মন্ত্রসম—যাঁহার আলো পরশে
গরল তরি' পথিক হয় ধন্য সুধা মিলনে।[২৪]

ভারতসাহিত্যের এই সব উদাহরণমালায় বেশ বোঝা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর তাৎপর্য—'তিনি সাকার নিরাকার আরও কত কি! তিনি এ দুয়েরই পার!'

উপনিষদের এই অনামা পুরুষই বৌদ্ধ সাধকের শূন্যতা, সহজিয়া সাধনার সহজতত্ত্ব, বাউলের মনের মানুষ। ভাবরাজ্যের রাজা রামকৃষ্ণ গাইতেন—

মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।
মনের মানুষ হয় যে জনা,
ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা, সে দুই একজনা,
ভাবে ভাসে রসে ডোবে,
ও সে উজানপথে করে আনাগোনা॥

—নবযুগের নবীন বাউল

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর দলবলেরা উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ জুড়ে এমন কতো গানই গেয়েছেন, কিন্তু তাঁদের চিনেছিল কয়জনা?

আর আমরা যারা শ্রীরামকৃষ্ণভাবসমুদ্রের তল পাওয়া চেষ্টা করি, ঠাকুরের গাওয়া সেই রামপ্রসাদী গানটির শেষ চরণদুটি আমাদের স্মরণীয়—

প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধুগমন,
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন।

২৪ অনুবাদ: শ্রীদিলীপকুমার রায়: রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ প্রকাশিত "সঙ্গীতসংগ্রহে"র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে তল নাই পাওয়া গেল, দুচোখ ভরে মায়ের খেলা দেখায় তো কোনো বাধা নেই—এ সব খেপা মায়ের খেলা!

সে যে আপনি খেপা, কর্তা খেপা, খেপা দুটো চেলা।
কি রূপ কি গুণ ভঙ্গী কি ভাব কিছুই যায় না বলা,
যার নাম জপিয়ে কপাল পোড়ে কণ্ঠে বিষের জ্বালা।
সগুণে নির্গুণে বাঁধিয়ে বিবাদ, ঢ্যালা দিয়ে ভাঙছে ঢ্যালা,
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজী নারাজ কেবল কাজের বেলা ॥
প্রসাদ বলে থাকো বসে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা,
যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাব, ভাঁটিয়ে যাব ভাঁটার বেলা ॥

রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্ত—শাক্ত সংগীতের এই দুই শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবরাজ্যের ছবিটি অনেক আগেই আঁকা হয়ে গেছে। এঁদের গান কতবার শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ময় হয়ে গেয়েছেন। সে তন্ময়তারই কাব্যভাষা কমলাকান্তের একটি গানে—

মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হল কামাদি কুসুমসকলে ॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো কালোয় কালোয় মিশে গেল,
সুখ দুখ সমান হলো আনন্দসাগর উথলে ॥
কমলাকান্তের মনে আশা পূর্ণ এত দিনে,
পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥

শ্যামাপদ নীলকমলে নিমজ্জিতপ্রাণ ঐ মধুকরের উপমার শ্রেষ্ঠ উপমান তো স্বয়ং রামকৃষ্ণ। কীর্তনানন্দে মগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ চণ্ডীদাস, বাসুদেব ঘোষ, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সেকাল ও একালের পদরচয়িতাদের গানে বিভোর—এমন অনেক চিত্রই কথামৃতে রয়েছে। তার মধ্যে চৈতন্যসহচর বাসুদেব ঘোষ ও চৈতন্যপূর্ব চণ্ডীদাসের দুটি গান শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসাধনার ছবি হিসাবে আপনাদের কাছে তুলে ধরি—

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি। রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী ॥
রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে। সুরধুনীধারা বহে অরুণ নয়নে ॥
ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে পড়ে যায়। রাধানাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মুরছায় ॥
পুলকে পুরল তনু গদ গদ বোল। বাসু কহে গোরা কেন এত উতরোল ॥

শ্রীরাধার পূর্বরাগচেতনার একটি শ্রেষ্ঠ পদ—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিঃশ্বাস সঘন কদম্বকাননে চায়॥
রাই কেন বা এমন হৈল।
গুরু দুরজন ভয় নাহি মন, কোথা বা কি দেবা পাইল॥*

মধুরভাবের সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাবের কথা তাঁর জীবনীপাঠকেরা জানেন। রাধাভাবের ব্যাকুলতা ও তন্ময়তার উদাহরণরূপে আধুনিককালের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয়, পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ কবিতার পটভূমিতেই এমনি বিপুলভাবের আবহ। শ্রীচৈতন্য বা শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাব তো রাগাত্মিকা ভক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু যাঁরা রাগানুগা ভাবের সাধক অথবা যাঁরা প্রকৃতি, প্রেম, সৌন্দর্যচেতনা—যে কোনো পন্থা অবলম্বনেই পরম সত্যের ঐক্যাভাসে এ জগৎকে বিধৃত দেখেছেন, তাঁরাই কবিতার জগতে এক অখণ্ড উপলব্ধির জগৎ সৃষ্টি করেছেন। য়ুরোপীয় সাহিত্য যাকে বলে 'মিষ্টিক কবিতা'।

'সারদামঙ্গলে'র কবি বিহারীলাল তাঁর 'সরস্বতী' কল্পনায় জগতের সৌন্দর্য-স্বরূপিণীকে প্রত্যক্ষ করে শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভাষায় প্রণাম জানিয়েছিলেন—

যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

কোনো সন্দেহ নেই 'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসনে'র এই সরস্বতীই রবীন্দ্র-কাব্যে জীবনদেবতা—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম!

বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক চেতনার উপলব্ধির পশ্চাৎভূমিতে রয়েছেন তদানীন্তন ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিক কবিতায় ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, শেলী ও কীটস্‌। আশ্চর্যের বিষয়, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের যোগসূত্রেরও অন্যতম কারণ ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের একটি কাব্য—"The Excursion'.

নরেন্দ্রনাথ তখন জেনারেল এসেম্বিলর এফ. এ. ক্লাসের ছাত্র। ইংরেজীর অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে সেদিন ক্লাসে এসেছিলেন কলেজের দার্শনিক অধ্যক্ষ

* আধুনিককালে এ পদটির রচনাকার নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

উইলিয়ম হেষ্টি। পাঠ্যবিষয় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'The Excursion'—প্রসঙ্গে আলোচনা করতে করতে প্রকৃতিধ্যান-তন্ময়তার কথায় হেষ্টি সাহেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধির উল্লেখ করে বলেছিলেন—"Such an experience is the result of purity of mind and concentration on some particular object, and it is rare indeed, particularly in these days. I have seen only one person who has experienced that blessed state of mind, and he is Ramakrishna Pramahansa of Dhakhsineswar."[২৫] শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তাহলে হেষ্টিসাহেব চাক্ষুষ দেখেছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আর কিছু জানতে পারিনি। তবু শ্রীরামকৃষ্ণ ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের এই শুভযোগস্থাপনের জন্য হেষ্টিসাহেবের কাছে নরেন্দ্রনাথের অনুগামী আমরাও ঋণী।

বাংলাসাহিত্যে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি-তন্ময়তা ও সমাধি থেকে জাগ্রত অবস্থায় অপরূপ কথামালার কারুকর্ম—দুয়ের দ্বারাই লাভবান। বক্রোক্তি-জীবিতকার রাজানক কুন্তকের অনুসরণে বলা যায়, ভাব, ভাষা, ছন্দ, উপমা—এ সবই শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে অপৃথগ্‌যত্নসম্পাদ্য হয়ে আসে—তাদের জন্য আলাদা করে চেষ্টা করতে হয় না।

সাধক শ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—'মা রাশ ঠেলে দেন'। শিল্পীর আড়ালে আছেন মহাশিল্পী, কবির অন্তরে আদি কবি। জগৎরহস্যের অন্তরালে যে চিত্রশালা বা যে অনাহত ধ্বনিসংগীত রয়েছে তাকে উন্মেষিত করাই শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও কবির কাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণবাণীসৌন্দর্যের অনুধ্যানে আমরা তাঁর ব্যক্তিজীবনের নিজস্ব উপলব্ধির বাঙ্ময় প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের অনুধ্যান করেছি। এবারে তাঁর সমকালীন জীবনধারার সঙ্গে নানামুখী পরিচয় থেকে আহরিত 'কথা'কাব্যের উপাদানগুলির কথা মনে করা যাক।

ঈশ্বরলাভের ক্ষেত্রে গুরুর ভূমিকা প্রসঙ্গে 'কলকাতা'—"যেমন কলকাতায় যাবার অনেক রাস্তা আছে। একজন অচেনা লোক কলকাতায় যাবার রাস্তা আর একজনকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, এই পথে যাও। খানিক গিয়ে

২৫ The Life of Swami Vivekanan Eastern and Western Disciples.

আর একজনকে জিজ্ঞাসা করায়, সে আর একটা পথ বলে দিলে। এইরকম অনেকে অনেক পথ বলে ও সে খানিক গিয়ে অন্যপথে যায়, তার কলকাতায় পৌঁছানো হল না, সে খালি ঘুরে মরলো। যদি কলকাতায় যেতে চাও, যে জানে এমন একজনের কথায় চলো। সেই রকম ঈশ্বরের নিকটে যেতে চাও তো একজনের কথা মত চল, না হলে ঘুরে মরবে।"[২৬]

মায়া ও ঈশ্বরপ্রসঙ্গে পাড়াগাঁয়ের পানাপুকুর—"পানাপুকুরে নেবে যদি পানাকে সরিয়ে দাও—আবার তখনি পানা এসে জোটে, সেইরকম মায়াকে ঠেলে দিলেও আবার মায়া এসে জোটে। তবে যদি পানাকে সরিয়ে দিয়ে বাঁশ বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে বাঁশ ঠেলে আসতে পারে না। সেইরকম মায়াকে সরিয়ে দিয়ে জ্ঞানভক্তির বেড়া দিতে পারলে আর মায়া তার ভিতর আসতে পারে না। সচ্চিদানন্দই কেবলমাত্র প্রকাশ থাকেন।"[২৭]

ব্রহ্মানন্দলাভের উপমায় কলকাতায় মতিশীলের ঝিল—"দেখ, আমায় বেলঘোরে মতিশীলের ঝিলে গাড়ী করে নিয়ে যাবে? সেখানে মুড়ি ফেলে দাও, মাছ এসে সব মুড়ি খাবে। আহা! মাছগুলি ক্রীড়া করে বেড়াচ্ছে, দেখলে খুব আনন্দ হয়। তোমার উদ্দীপনা হবে, যেন সচ্চিদানন্দ সাগরে আত্মারূপ মীন ক্রীড়া করছে। তেমনি খুব বড় মাঠে দাঁড়ালে ঈশ্বরীয় ভাব হয়। যেন হাঁড়ির মাছ পুকুরে এসেছে।"[২৮]

ঈশ্বরানুভূতির প্রভাব প্রসঙ্গে গঙ্গার দৃশ্য—

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে মানবদেহে ঈশ্বরের ভাব এলে কি হয়, তার উপমা—'যখন ভাব হয় তখন কিছু বোঝা যায় না, অনেকদিন পর শরীরে আঘাত লাগে। আমি দেখেছি বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যখন চলে গেল, তখন কিছু টের পাওয়া গেল না, ওমা, খানিকক্ষণ পরে দেখি, কিনারার উপর জল ধপাস ধপাস করছে, আর তোলপাড় করে দিচ্ছে। হয়ত কিনারার খানিকটা ভেঙ্গে জলে পড়লো।

কুঁড়েঘরে হাতী প্রবেশ করলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙ্গেচুরে দেয়। ভাবহস্তী দেহ ঘরে প্রবেশ করে, আর তোলপাড় করে'।[২৯]

---

২৬ সুরেশচন্দ্র দত্ত সংগৃহীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ : পৃঃ ১৪৩ : ১৫শ সংস্করণ।

২৭ তদেব : পৃঃ ১৭৩।

২৮ কথামৃত : ২য় : ৫ই জুন, ১৮৮৩

২৯ কথামৃত : ২৩শে নভেম্বর, ১৮৮৩ তারিখের দিনলিপি

মায়াবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সাধনায় সদ্‌গুরুর ভূমিকা-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের একটি উদাহরণ—

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীর কাছ দিয়ে তিনি যাচ্ছেন,—"শুনতে পেলুম যে, একটা কোলা ব্যাঙ খুব ডাকছে। বোধ হলো সাপে ধরেছে। অনেকক্ষণ পরে যখন ফিরে আসছি, তখনও দেখি, ব্যাঙটা খুব ডাকছে। একবার উঁকি মেরে দেখলুম কি হয়েছে। দেখি একটা ঢোঁড়ায় ব্যাঙটাকে ধরেছে—ছাড়তেও পাচ্ছে না—গিলতে পাচ্ছে না—ব্যাঙটার যন্ত্রণা ঘুচছে না। তখন ভাবলাম, ওরে! যদি জাতসাপে ধরতো, তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হয়ে যেতো। এ একটা ঢোঁড়ায় ধরেছে কিনা, তাই সাপটারও যন্ত্রণা, ব্যাঙটারও যন্ত্রণা।

যদি সদগুরু হয়, তাহলে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে। গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা।"৩০

উপমার সজীবতায় গুরু ও শিষ্য দুয়েরই অবস্থা লক্ষণীয়।

ঈশ্বরানুভবের স্তর-প্রসঙ্গে গঙ্গার জলে শিকলে বাঁধা কাঠ—

"জপ থেকে ঈশ্বরলাভ হয়, নির্জনে গোপনে তাঁর নাম করতে করতে তাঁর কৃপা হয়। তার পর দর্শন।

যেমন জলের ভিতর ডুবানো বাহাদুরি কাঠ আছে—তীরেতে শিকল দিয়ে বাঁধা, সেই শিকলের এক এক পাব ধরে গেলে শেষে বাহাদুরী কাঠকে স্পর্শ করা যায়।

পূজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। ভাবের চেয়ে মহাভাব প্রেম বড়। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। প্রেম হলে ঈশ্বরকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া গেল"।৩১

শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর আর এক বৈশিষ্ট্য শাস্ত্রবাণীর সঙ্গে তাঁর মিল। এ বিষয়ে সাধারণতঃ ধারণা এই যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাধিলব্ধ প্রেরণায় যা পেয়েছেন তাই বুঝি বাণীর আকারে প্রকাশ করেছেন। মূলতঃ কথাটি স্বীকার্য, তবু বেদবেদান্ত, তন্ত্র, বৈষ্ণব দর্শন—এসবের অনেক সূক্ষ্ম বিচারের পরিভাষাও তিনি যেভাবে তাঁর আলাপচারিতে ব্যবহার করেছেন তাতে মনে হয় সাধক মহাপুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে সেকালের নানা পণ্ডিতজনের সাহচর্য তাঁকে এসব বিষয়ের পুঁথিগত

৩০ কথামৃত : ১ম : ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮৫।
৩১ তদেব ৪র্থ : ২রা অক্টোবর, ১৮৮৪।

পাণ্ডিত্য সম্বন্ধেও যথেষ্ট সজাগ করেছিল। বলাবাহুল্য, গ্রন্থলব্ধ এ বিদ্যাও পূর্বগামীদের সাধনলব্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর এ জাতীয় উদাহরণ—যাতে শাস্ত্রজ্ঞান ও শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর কাব্যময় প্রকাশের আশ্চর্য মিল—সামান্য কিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

যেমন ধরুন, কঠোপনিষদের সেই বিখ্যাত শ্লোক—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ (২।২।৯)

শ্রীরামকৃষ্ণবাণীতে "যিনি শুদ্ধ আত্মা তিনি নির্লিপ্ত। তাতে মায়া বা অবিদ্যা আছে। এই মায়ার ভিতরে তিনগুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। যিনি শুদ্ধ আত্মা তাতে এই তিন গুণ থাকলেও তিনি নির্লিপ্ত। আগুনে যে রংয়ের বড়ি দেবে সেই রং দেখা যাবে।"[৩২]

ব্রহ্মবিদ্যোপনিষদে আছে—

কাংস্য ঘণ্টানিনাদস্তু যথা লীয়েত শান্তয়ে।
ওঁকারস্তু তথা যোজ্যঃ শান্তয়ে সর্বমিচ্ছতা।
যস্মিন স লীয়তে শব্দস্তৎপরং ব্রহ্ম গীয়তে॥ ১২-১৩

ওঁ-কারের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—

"ওঁ-কারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বল অ-কার উ-কার ম-কার। আমি উপমা দিই ঘণ্টার টং শব্দ। ট-অ-অ-ম্‌ ম্‌। লীলা থেকে নিত্যে লয়; স্থূল সূক্ষ্ম কারণ থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার বাজল, যেন মহাসমুদ্রে একটি গুরু জিনিষ পড়ল আর ঢেউ আরম্ভ হল। নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হল, মহাকারণ থেকে স্থূল সূক্ষ্ম কারণশরীর দেখা দিল—সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়ল। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হল। নিত্য ধরে ধরে লীলা, আবার লীলা ধরে ধরে নিত্য। আমি টং শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এই সব দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎসমুদ্র, অন্ত নাই। তাই থেকে এই সব লীলা

---

৩২ কথামৃত : ৪র্থ : ২রা অক্টোবর, ১৮৮৪

উঠলো, আর এতেই লয় হয়ে গেলো। চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার ঐতেই লয় হয়; তোমাদের বই-এ কি আছে, অত আমি জানি না।"[৩৩]

নারদপঞ্চরাত্রের ভাষায় ঈশ্বরের করুণার উপমা—

বিদিতে পরাতত্ত্বে তু সমস্তৈর্নিয়মৈরলম্।

তালবৃন্তেন কিং কার্যং লব্ধে মলয়মারুতে ॥ ৫।১০।৪০

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, "পূজা হোম যাগ যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। যদি তাঁর উপরে ভালবাসা আসে, তাহলে এসব কর্মের বেশী দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায় ততক্ষণই পাখার দরকার। যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, তাহলে আর পাখার দরকার হয় না।"[৩৪]

মানুষ অনন্ত ঈশ্বরকে জানতে পারে কি না—এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—"বাতাস যেমন গায়ে ঠেকে, ঈশ্বরও তেমনি আমার গায়ে ঠেকেন।"[৩৫]

আবার অনুরাগী ভক্তকে বলছেন, "তাঁর কৃপার পবন তো দিনরাতই বইছে, পাল তুলে দাও, তবে হাওয়া লাগবে।"[৩৬]

একাধারে জ্ঞান ও ভক্তি দুয়ের সমাবেশ দুর্লভ। সেই প্রসঙ্গে—"ভক্তি চন্দ্র, জ্ঞান সূর্য। কখনো কখনো আকাশে সূর্য অস্ত না যেতে যেতে চন্দ্রোদয় দেখা যায়। অবতারাদিতে ভক্তি-চন্দ্র জ্ঞান-সূর্য একাধারে দেখা যায়।"[৩৭] এ তাঁর নিজের সম্বন্ধেই কথা।

তিনি বলতেন, আকাশের মতো উদার হতে, আর সমুদ্রের মত গভীর। তাঁর উপমার মতোই অনুপম তাঁর জীবন।

পৃথিবীর ইতিহাসে কতো কবির আবির্ভাব হয়েছে, কতো কবিতা তাঁরা লিখে গেছেন। কিন্তু এমন এক কবিকে অন্তত আমরা পেয়েছি, যাঁকে কবিতা লেখার প্রয়াস করতে হয় নি, যাঁর মুখের কথা আপনিই কবিতা হয়ে উঠেছে। আদিকবির চেতনাসিন্ধুমথিত প্রথম শ্লোকের আবির্ভাবের মতো পরমচৈতন্যের বাণীমূর্তিলাভের প্রেরণায় যাঁর কথাই কবিতা।

---

৩৩ কথামৃত : ১ম : ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪

৩৪ তদেব . ৩য় : ৫ই আগস্ট. ১৮৮২ উদ্ধৃত শেষ দুটি শাস্ত্রীয় শ্লোকের জন্য কুমারকৃষ্ণ নন্দী সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণবাণী ও শাস্ত্রপ্রমাণ" দ্রষ্টব্য।

৩৫ কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'আত্মচরিত' : 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' দ্রষ্টব্য।

৩৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ : সুরেশচন্দ্র দত্ত-সংগৃহীত · পৃঃ ১৩৩

৩৭ কথামৃত : ৫ম . ১৯শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩

শ্রীরামকৃষ্ণমনীষা ও বাংলাসাহিত্য

সাহিত্য মানুষের অনুভব ও বিচারবুদ্ধি—এ দুয়েরই মিলিতসৃষ্টি। বেদে উপনিষদে কবি ও মনীষী শব্দ দুটি অনেকটা একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও পরবর্তী-কালে কল্পনাপ্রধান ও বিচারপ্রধান—দুটি সত্তা হিসাবে আমরা কবি ও মনীষী শব্দ দুটিকে গ্রহণ করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ কবি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মনীষী।

ভাবরাজ্যের রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ যে আশ্চর্য রূপপারঙ্গম ছিলেন, তা আমরা দেখেছি। এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণবাণী অবলম্বনে ভারতীয় দর্শন ও প্রজ্ঞার আধেয়বস্তু। ভারতীয় সাহিত্য বৈদিক, ঔপনিষদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক—নানা অভিব্যক্তিতে মননসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ স্থাপন করেছে। বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, রামকৃষ্ণ শ্রেণীর সাধকেরা সেই উত্তুঙ্গ মননসম্পদকে সর্বজনের ভাষাবোধ্য করবার সাধনা করেছেন। বাংলাসাহিত্যে সেই প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন শ্রীরামকৃষ্ণবাণী-সংগ্রহ।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য প্রকৃতির অনুসরণ, না শ্রেষ্ঠ আদর্শকে জীবনে প্রতিফলন—এ নিয়ে বিতর্ক স্মরণাতীতকালের। "শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে"র "দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ"-খণ্ডে স্বামী সারদানন্দ এ বিষয়ে তরুণ নরেন্দ্রনাথের সাহিত্য-মীমাংসার একটি উদাহরণ দিয়েছেন। নরেন্দ্রনাথের মতে একদল চান যা বাস্তব তাকেই আদর্শায়িত করতে—"They idealise what is apparently real". আর একদল যা আদর্শ তাকেই জীবনে পরিণত করতে চান—"They want to realise the ideal." নরেন্দ্র বিবেকানন্দের সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে এই শেষোক্ত আদর্শ। বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণজীবন ও বাণী সে আদর্শের শ্রেষ্ঠ রূপায়ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণবাণী-সাহিত্যের অজস্র ভাবসৌন্দর্যের উদাহরণমালার কথা স্মরণে রেখেই বলা চলে যে, এর মূলে রয়েছে নানা মতে ও নানা পথে ব্রহ্মোপলব্ধি। একদিকে যেমন উপলব্ধি ও উপদেশাবলীর সংগ্রহ হিসাবে এরা মূল্যবান, অন্যদিকে তেমনি ছোট ছোট কথিকার মাধ্যমে পরমসত্যের এক একটি জ্যোতিঃকণা আমাদের আত্মিক পথনির্দেশের পক্ষে অমূল্য এবং কথাসাহিত্যের

অমরসৃষ্টি। বাংলার লোকজীবন থেকে আহরিত কতো গল্পই যে তিনি আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে তাঁর উপদেশাবলীর উদাহরণরূপে ব্যবহার করেছেন, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। আবার শাস্ত্র ও গুরুপরম্পরাক্রমে যে সব আধ্যাত্মিক রূপককাহিনী প্রাচীনকাল থেকে প্রবহমান, সেগুলিও কথননৈপুণ্যে মণ্ডিত হয়ে তাঁর অধ্যাত্ম-আদর্শকে সজীব ও প্রত্যক্ষ করে তুলেছে। মানবচরিত্র অনুধাবনে তাঁর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা, সহজাত উচ্চাঙ্গ হাস্যরস এবং কবিদৃষ্টি—এ তিনের সম্মেলনে শ্রীরামকৃষ্ণকথিত এই গল্পমালা বাংলা সাহিত্যেব চিব-আদরের সামগ্রী।

শুধু প্রথমখণ্ড 'কথামৃতে'ই গুণে দেখা যাবে—চৌদ্দটি গল্প—মানবমনের বিশ্লেষণে ও আধ্যাত্মিক সত্য অন্বেষণের একাগ্রতায় পাঠক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। অন্যান্য খণ্ডে তো এমন আরো কত গল্প আছে। কিছু গল্প স্বভাবতঃই পুনরাবৃত্ত হয়েছে। কিন্তু শ্রোতাদের সমবেত হাস্যে কোনো বাধা পড়ে নি। বিভিন্ন ব্যক্তি ও কালের উপযোগিতা বুঝে গল্পগুলি ঘুরে ফিরে শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর তাৎপর্য উপলব্ধিতে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে জগতে যত মতবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়েছে তার অধিকাংশের মূলেই যে একদেশদর্শিতা, এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকথিত 'বহুরূপী'র গল্পটি 'কথামৃতে'র প্রথম ভাগ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পপ্রয়োগের ভঙ্গীটুকু অনুধাবনের জন্য উদ্ধৃত করছি—"যে ভক্ত যেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক কোনও গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোনরকমে যদি একবার লাভ করতে পারা যায়, তাহলে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। সে পাড়াতেই গেলে না,—সব খবর পাবে কি করে?

"একটা গল্প শোন—একজন বাহ্যে গিছিল। সে দেখল যে গাছেব উপর একটি জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বললে—দেখ, অমুক গাছে একটি সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলাম। লোকটি উত্তর করলে, 'আমি যখন বাহ্যে গিয়েছিলাম—আমিও দেখেছি—তা সে লাল রঙ হতে যাবে কেন? সে যে সবুজ রঙ?' আর একজন বললে 'না না—আমি দেখেছি হলদে'। এইরূপে আরও কেউ কেউ বললে, 'না জরদা, বেগুনী, নীল ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একটা লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে, 'আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি—তোমরা যা যা বলছ, সব সত্য—সে কখন লাল,

কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন নীল আরও সব কত কি হয়। বহুরূপী। আবার কখনও দেখি, কোনও রঙই নাই। কখনও সগুণ, কখন নির্গুণ।

"অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে, সেই জানতে পারে তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন—তিনি সগুণ, আবার তিনি নির্গুণ। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে বহুরূপীর নানা রঙ—আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।"

[কথামৃত : ১ম : ২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২]

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, গল্পটির প্রয়োগস্থল, বর্ণনাকৌশল এবং রূপকব্যাখ্যায় নৈপুণ্য। হাতী নারায়ণ মাহুত নারায়ণ, সাপের ফোঁস করা, বাঘ (বা সিংহ) ও ভেড়ার দল, রাখৈকশরণ তাঁতী, খানদানী চাষী, তিন চোর, অবধূত, ব্রহ্মচারী ও কাঠুরে, পাহাড়ের উপর কুঁড়েঘর ঝড়ে উড়ে যাওয়া, স্বাতী নক্ষত্রের জল, রঙের গামলা, স্যাকরার দোকানে 'হরি হরি' 'হর হর', খবরের কাগজে সংবাদ—প্রথম খণ্ডের এই গল্পগুলির মতো আরও কতো গল্প কথামৃতের অন্যান্য খণ্ডে ছড়ানো। প্রতিটি খণ্ডের অধ্যাত্মব্যঞ্জনা ব্যাখ্যা করতে গেলে সব মিলিয়ে এক মহাগ্রন্থ হতে পারে।

এ গল্পগুলি বিশ্বসাহিত্যের সেরা কথকের সৃষ্টি। এই বিষয়ে ঈশপ বা বিষ্ণুশর্মার চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আসন অনেক উঁচুতে। বৌদ্ধজাতকের কাহিনীতে দেখি নৈতিক গুরুত্ব যতটা, অধ্যাত্মব্যঞ্জনা ততটা নয়। বরং বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে যীশুখৃষ্টের কয়েকটি গল্পে এই তুরীয় সৌন্দর্যের প্রকাশ আছে। উদাহরণ স্বরূপ ইংরেজী বাইবেলের ভাষায় চাষীর বীজবোনার গল্পটি স্মরণ করা যায়—

"Behold, a sower went forth to sow, and when he sowed, some seeds, fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up ; some fell upon stony places where they had not much earth ; and forthwith they sprang up because they had no deepness of earth ; and because they had no root they withered away. And some fell among thorns ; and the thorns sprung up, and choked them ; but others

fell into good ground, and brought forth fruit some hundred-fold, some sixtyfold, some thirtyfold. Who hath ears to hear let him hear."[১]

শ্রীরামকৃষ্ণমনীষার আলোচনা প্রসঙ্গে যোগবাশিষ্ঠের একটি স্মরণীয় শ্লোকার্ধ—'স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি'; বিশ্বসাহিত্যে এই মননের ক্ষেত্রে Parable বা রূপকাকৃতি কথিকার বিশেষ স্থান রয়েছে। যীশুখ্রীষ্ট এ গল্পগুলি রূপকের আবরণে আচ্ছাদিত করেছিলেন, যাতে যথার্থ জিজ্ঞাসু ছাড়া অন্যেরা এ গল্পের অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান না পায়। যে আন্তরিক, সেই এ কাহিনীর অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদের অধিকারী হবে—এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত গল্পগুলি শুনে যাঁরা আনন্দলাভ করতেন, তাঁরাও যে সকলেই সমানভাবে এ সব গল্পের তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন, তা মনে হয় না। কিন্তু গল্প বলার দিক থেকে এ সব গল্পের বর্ণনা, সরসতা ও চমক যে কোনো সাহিত্য-পাঠককেই মুগ্ধ করে।

'বর্তমান ভারত'-নিবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যোগবাশিষ্ঠের ইঙ্গিতেই মন্তব্য করেছেন—"মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীষী মুনি?" এই মননের অধিকারেরই পরম বিকাশ অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়—"যার ঈশ্বরে মন, সেই তো মানুষ। মানুষ—আর মান হুঁশ। যার হুঁশ আছে, চৈতন্য আছে, যে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য—সেই মান হুঁশ।"[২]

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা ও কথিকা—এ দুই অবলম্বনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজস্ব চিন্তাধারা সম্বন্ধে আমরা ধারণার চেষ্টা করতে পারি। সাধারণতঃ তাঁর দিব্যজ্ঞানকে অলৌকিক উপায়ে আয়ত্ত মনে করা হয় বলে, তাঁর চিন্তাধারাকে যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণের কথা আমাদের মনে জাগে না। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে দেখি শ্রুতি অবলম্বনে বিভিন্ন দর্শন এই স্বতঃসিদ্ধ আপ্তবাক্যরাশিকেও মানবীয় যুক্তিবুদ্ধির কাঠামোয় দাঁড় করাতে চায়। বেদান্তদর্শন বা খ্রীষ্টীয়দর্শন—দুয়ের মূলে যে দিব্যজ্ঞান, শুধুমাত্র তারই উপরে নির্ভর করে দার্শনিকেরা নিশ্চিন্ত থাকেন নি।

শ্রীরামকৃষ্ণসাহিত্যের প্রাণবস্তু ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনপ্রসঙ্গে সর্বাগ্রে স্মরণীয়

---

১ ম্যাথু লিখিত সুসমাচার (New Testament) ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২ কথামৃত : ৩য় : ১৮ই অক্টোবর' ১৮৮৫।

যে, তিনি বিশেষ কোনো একটি ধর্মমতকে যেমন একমাত্র মনে করেন নি, তেমনি বিশেষ কোনো দার্শনিক পন্থাকেও 'একমেব' পন্থারূপে স্বীকৃতি দেন নি। একহিসাবে তিনি কোনো নূতন দার্শনিক মতের স্থাপয়িতা নন। আব এক হিসাবে তিনি যেভাবে মানবমানসের স্তরপরম্পরা অনুসারে সত্যের বিভিন্ন স্তরকে মূলতঃ এক পরমসত্যেরই বিভিন্ন প্রকাশরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন, ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে তা অভিনব। একইসঙ্গে একাধিক চিন্তাপদ্ধতির সার্থকতা মানা দার্শনিকের পক্ষে অবশ্যই কঠিন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যপাঠে তা একান্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গতরূপে প্রতীত হয়। কারণ, অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণজীবন ও সাধনা। সেইসঙ্গে তাঁর অনুপম প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপনের বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। বাংলাভাষায় দার্শনিক বিষয়বস্তুকে সরল অথচ যুক্তিপূর্ণভাবে স্থাপনের দৃষ্টান্তরূপে তিনি অদ্বিতীয়। এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ে আমরা প্রধানতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে সচেষ্ট হবো।

শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবপদাবলীর পটভূমিতে যেমন চৈতন্যজীবন ও দর্শনের ভূমিকা, শ্রীরামকৃষ্ণপূর্ব শাক্তপদাবলীর পটভূমিতে তেমনি রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা বামকৃষ্ণ প্রভৃতি সাধকবৃন্দের অনুভূতি ও কাব্যসাধনা। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রামানন্দ রায়ের কল্পনা যেমন শ্রীচৈতন্যব্যক্তিত্বে রূপায়িত, তেমনি শাক্তপদকর্তাদের মাতৃভাবসাধনাও শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে কেন্দ্রায়িত। বৈষ্ণবপদাবলীতে তত্ত্ব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অলক্ষ্যে নিগূঢ়ভাবে সঞ্চারিত। শাক্তপদাবলীতে ভাব এবং তত্ত্ব অনেকক্ষেত্রে সমান সমান। এমন কি তত্ত্ব কোথাও কোথাও সাহিত্যের দাবীকে অতিক্রম করেছে। কিন্তু শাক্তপদাবলীর এমন অনেক উদাহরণই মেলে, যেখানে রস ও তত্ত্বের অপূর্ব সমন্বয়।

যেমন ধরুন রামপ্রসাদের এই গানটি—

সাবাস মা দক্ষিণা কালী ভুবন ভেলকি লাগিয়ে দিলি।
(তোর) ভেল্কির গুটি চরণ দুটি ভবের ভাগ্যে ফেলে দিলি॥
এমন বাজিকরের মেয়ে, রাখলি বাবারে পাগল সাজায়ে
নিজে গুণময়ী হয়ে পুরুষপ্রকৃতি হলি॥
মনেতে তাই সন্দ করি, যে চরণ পায়নি ত্রিপুরারি,
প্রসাদরে সেই চরণ পাবি—তুইও বুঝি পাগল হলি॥

'ভুবন ভেলকি' হলেও মা যে সত্য, সে কথা এমন শরণাগতির তন্ময়তায় পৃথিবীর খুব কম কবিতাতেই ফুটেছে।

কালীকৃষ্ণ যে একই তত্ত্ব সেকথা পুরাণকাহিনীর পটভূমিতে রামপ্রসাদী গানে—

"যশোদা নাচাতো গো মা বলে নীলমণি,
সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী ?
একবার নাচ গো শ্যামা,
হাসি বাঁশী মিশাইয়ে, মুণ্ডমালা ছেড়ে, বনমালা পরে
অসি ছেড়ে বাঁশী লয়ে, আড় নয়নে চেয়ে চেয়ে…"

অথবা, "কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবর বেশে বৃন্দাবনে।
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে একথা বিষম ভারি।
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী॥"

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর এক কবি ভারতচন্দ্র, যিনি ব্যাসচরিত্রের মাধ্যমে হরিহরের ঐক্য ঘোষণা করেছিলেন ধর্মমত নিয়ে তুচ্ছ দ্বন্দ্বকলহের অবসানকল্পে। যখন যে দেবতার উপাসক, তখন তাঁর প্রতি অতিরিক্ত গোঁড়া ব্যাসদেব যখন বিষ্ণুভক্তিতে শিবনিন্দাকারী তখন তাঁর প্রতি বিষ্ণুর উক্তি—

মোর পূজা বিনা শিব পূজা নাহি হয়।
শিবপূজা না করিলে মোর পূজা নয়॥

আবার বিষ্ণুনিন্দাকারী গোঁড়া শিবভক্ত ব্যাসের উদ্দেশ্যে শিবের উক্তি—

হরিহর দুই মোরা অভেদ শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই জন ধীর॥

ব্যাসকাহিনীর সূচনায় তাই ভারতচন্দ্রের গান—

অভেদভাবে যেই পরম জ্ঞানী সেই
তারে না লাগে পাপক্লেদ।
যে দেহে হরিহরে অভেদরূপে চরে
সে দেহে নাহি তাপস্বেদ॥
একই কলেবরে হইলা হরিহরে
বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ।

যে জানে দুইরূপে সে মজে মোহকূপে
ভারতে নাহি এই খেদ ॥[৩]

উনবিংশ শতব্দীতে দাশরথিরায়ের পাঁচালীগানে 'শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব' পালায় এই অভেদ ভাবনারই আর একটি রসমণ্ডিত রূপায়ণ আছে। অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ঈশ্বরের নানা রূপময় সত্তার অভেদকল্পনার ধারা প্রবাহিত।

হিন্দুমুসলমানের সংস্কৃতি-সম্মেলনের ধারাটিও বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমান নবাবদের 'মহাভারত' অনুবাদ থেকে আরম্ভ করে যবন হরিদাসের হরিনাম তন্ময়তা, আলাওলের সুফীচেতনাশ্রিত উদারতা, দরাফখাঁ গাজীর 'গঙ্গাস্তোত্র', মুসলমান কবিদের বৈষ্ণবপদাবলী ও আধুনিক যুগে কাজী নজরুল ইসলামের মাতৃসংগীত প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলাসাহিত্যে অভেদভাবনার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। ধর্মমঙ্গলকাব্যের ধর্মঠাকুর ও তাঁর সঙ্গিনী আদ্যাদেবী মুসলমানযুগে মহম্মদ ও তাঁর সঙ্গিনী, এমনকি ইংরেজ আমলে ইংরেজ শাসকের রূপেও দেখা দিয়েছেন। মধ্যযুগের সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ তো হিন্দুমুসলমান উপাস্যসমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

বাংলা মঙ্গলকাব্যে মনসা, চণ্ডী বা ধর্ম যে মূলতঃ নিরঞ্জন ব্রহ্মেরই রূপায়িত প্রকাশ, এ সচেতনতা সর্বত্র লক্ষণীয়। সুতরাং এক পরমসত্যকে বহুরূপে উপলব্ধির ঐতিহ্য বাংলাসাহিত্যে ও বাঙালীমানসে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির পাশাপাশিই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। কখনো কখনো খণ্ডিতদৃষ্টির লক্ষণ দেখা দিলেও বিভিন্ন উপাসনার উপাস্যের ঐক্য আমাদের সাহিত্যে খুব কষ্টকল্পনা নয়।

তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে শাক্ত পদাবলীর ধারা মঙ্গলকাব্যের কাহিনী থেকে স্বতন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করলো তাতেই অদ্বৈতবেদান্তের সুর সবচেয়ে স্পষ্ট—

কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন ॥
... ...
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥

---

৩ অন্নদামঙ্গল : সাহিত্যপরিষৎ সংস্করণ : পৃঃ ১৪২

মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন!
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়—'ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, এককে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি;—অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়; দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না'।

"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করেছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এইসব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি, একই ব্যক্তি, নামরূপ ভেদ।" "ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।"[৪]

"স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলচে দুলচে কালী বা শক্তির উপমা।" যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।"[৫]

"তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না, একের পিঠে অনেক শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়। এককে পুঁছে ফেললে শূন্যের কোনও পদার্থ থাকে না।"[৬]

—এমনি নানা উপমায় শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা ও নিত্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রূপায়িত করেছেন।

অনন্তলীলারূপিণী কালীর পাঁচটিরূপ ব্যাখ্যা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ— "মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে।

যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী ছিল না। নিবিড় আঁধার তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন।"[৭] ভক্তসহ কেশবচন্দ্রের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের এই বর্ণনাই পরবর্তীকালে ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালের গান 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি। তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি গুহাবাসী'—সংগীতে রূপায়িত।

---

৪ কথামৃত : ১ম : ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২

৫ তদেব : ১ম : ১৯শে অক্টোবর, ১৮৮৪

৬ তদেব : ৪র্থ : ১লা জানুয়ারী, ১৮৮৩

৭ তদেব : ১ম ভাগ : ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২

তারপর শ্যামাকালীর, রক্ষাকালীর গৃহস্থঘরে পূজনীয় অভয়াবরদামূর্তির কথা বলে শ্মশানকালীর বর্ণনায় তাঁর ব্যাখ্যা—"শ্মশানকালীর সংহার মূর্তি। শব শিবা, ডাকিনী যোগিনীর মধ্যে শ্মশানের উপরে থাকেন। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা; কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয় তখন মা সৃষ্টির বীজসকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীর কাছে যেমন একটা ন্যাতাকাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নি পাঁচরকম জিনিস তুলে রাখে। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন আর জগতের মধ্যে থাকেন। ...ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুই।"[৮]

বিবেকানন্দের 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' ও 'Kali the Mother' কবিতাদুটির কেন্দ্রে এই শ্মশানকালীর ধ্যান। নিরাকার উপাসক নরেন্দ্রনাথকে 'সাকার-আকার-নিরাকারা'র পদতলে নিবেদন করে শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্য ও লীলার সম্বন্ধস্থাপনের সেরা দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—"কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে আর কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে ছাখো কোনো রঙ নাই।"[৯]

দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীমন্দির থেকে অনন্ত আকাশে প্রসারিত শ্রীরামকৃষ্ণ-দৃষ্টির অনুসরণে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর সমকালীন অধ্যাত্মমননের পটভূমিটি পর্যালোচনা করিতে পারি। একদিকে ইসলামশাস্ত্রের একেশ্বরবাদী ধারণা এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্যপ্রভাবে খৃষ্টধর্মের একেশ্বরবাদের কথা মনে রেখেই রামমোহনের অন্তরে বেদান্তের একব্রহ্ম উপাসনার কথা জেগেছিল। কিন্তু মনে রাখা ভালো যে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথশাস্ত্রীদের একেশ্বরবাদ ঠিক অদ্বৈতবাদ নয়, এঁদের উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম, ভক্তি এঁদের উপাসনার প্রধান অবলম্বন। এক রামমোহন ছাড়া ব্রাহ্মসমাজের পরবর্তী কোনো নেতাই বেদান্তের জ্ঞানযোগের চর্চা করেন নি। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ যার যার সাধ্যমত এঁদের জীবনে পালিত হলেও অদ্বৈতসিদ্ধান্তে এঁরা প্রতিষ্ঠিত নন। অপরপক্ষে ঈশ্বরের মাতৃরূপ কালীর সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বৈত থেকে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত থেকে অদ্বৈত—ঈশ্বরচেতনার সব স্তরকে আপন উপলব্ধিসহায়ে

৮, ৯ কথামৃত, ১ম ভাগ : ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২

নিশ্চিত জেনে শাস্ত্রসিদ্ধান্তকে সত্য প্রমাণিত করেছেন। বেদান্তের সর্বাঙ্গীণ ব্যাখার পরিপূর্ণতাই শ্রীরামকৃষ্ণমনীষার বৈশিষ্ট্য।

উনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্মসমাজ একদিকে অদ্বৈত-বেদান্ত সম্বন্ধে অনীহা এবং অন্যদিকে মৃন্ময়ী প্রতিমার আড়ালে চিন্ময়ী সত্তার উপলব্ধিতে অক্ষমতা—এ দুয়ের দ্বারা ভারতীয় অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার প্রধান দুটি ধারাকেই অস্বীকার করে এক গণ্ডীবদ্ধ 'ব্রহ্ম'ধারণার সৃষ্টি করেছিল। সমকালীন শিক্ষিতসমাজকে স্বধর্মচ্যুতির সম্ভাবনা থেকে ব্রাহ্মসমাজ অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতা মনে রেখেই বলা চলে, ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে বিচারসহ কোনো দার্শনিক পদ্ধতি স্থাপন করতে পারেন নি বলেই পরবর্তীকালে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের নেতৃত্ব থেকে তাঁরা স্বেচ্ছানির্বাসিত। অপর পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা ও বাণীর অন্তর্নিহিত সমন্বয়াদর্শ ক্রমে নবযুগধর্মরূপে বিশ্বমানসে পরিগৃহীত।

সাকার ও নিরাকার উপসনাপদ্ধতি নিয়ে ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দের যে দ্বন্দ্ব আমরা উনবিংশ শতাব্দীতে দেখতে পাই, তার প্রাথমিক সূচনা রামমোহনের রচনাবলীতে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর মুণ্ডকোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকার অংশবিশেষ স্মরণীয়—An attentive perusal of this (Mundakopanishad) as well as the remaining books of the Vedanta will, I trust convince every unprejudiced mind, that they with great consistency inculcate the unity of God, instructing men, at the sametime, in the pure mode of adoring him in spirit. It will also appear evident that the Vedas, although they tolerate idolatry for those who are totally incapable of raising their minds to the contemplation of the invisible God of nature, yet repeatedly urge the relinquishment of the rites of idol worship, and the adaptation of a pure system of religion, on the express ground that the observance of idolatrous rites can never be productive of eternal beautitude."

রামমোহনের এ জাতীয় সিদ্ধান্তের মূলে আচার্য শংকরের "সাধকানাং হিতাথায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"—মন্তব্যটি স্মরণীয়। বেদান্তের নানা ব্যাখ্যার মধ্যে রামমোহন প্রধানতঃ আচার্য শংকরের ব্যাখ্যার উপরে জোর দিলেও শেষ অবধি অদ্বৈতবাদের জায়গায় একেশ্বরবাদই তাঁর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বাংলা-

সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ দর্শনচিন্তার শুভসূচনারূপে রামমোহনের বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার এবং ঈশ, কেন, মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদের অনুবাদ বিশেষ মূল্যবান উপকরণ। বস্তুতঃ সমকালীন বাংলাগদ্যের অপরিণত অবস্থায় রামমোহনের দুর্জয় সঙ্কল্পই বাংলা সাধুগদ্যকে এমন দুরূহবিষয় অবলম্বনের সাহস দিয়েছে। তুলনামূলকভাবে রামমোহনের মননপ্রতিদ্বন্দ্বী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ভাষাভঙ্গী অনেক বেশী সংস্কৃতপ্রভাবে আচ্ছন্ন। তবে রামমোহনের সিদ্ধান্তের যেখানে যেখানে ফাঁক রয়েছে মৃত্যুঞ্জয় তা ভালোভাবেই প্রতিপন্ন করেছেন। পরবর্তীকালের বাংলা-সাহিত্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষাভঙ্গীই শাস্ত্রালোচনার ক্ষেত্রে গৃহীত।

রামমোহন-প্রভাবিত দেবেন্দ্রনাথ সাকার উপাসনার পরিবেশে মানুষ হলেও উপনিষদের মন্ত্রবাণী—'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং' লাভ করে আত্মানুসন্ধানের পন্থায় যখন থেকে নিশ্চিত হলেন, তখন থেকে প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব আপোষহীন। দেবেন্দ্রনাথ 'বিশুদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত আত্মপ্রত্যয়ের আলোকে' ব্রাহ্মধর্মকে ভক্তিবাদী আন্দোলনের পথে পরিচালিত করলেন। উপনিষদকে দেবেন্দ্রনাথ নিজের ধারণামতো গ্রহণ বর্জন করেই ব্রাহ্মধর্মের শাস্ত্রীয় ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায় "যখন আমার হৃদয়ের ভাবের প্রতিভাব উপনিষদের পত্রে প্রথম প্রত্যক্ষ দেখিলাম, 'এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কিছু পদার্থ, সমুদায়ই ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে, পাপচিন্তা ও বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর: কাহারও ধনে লোভ করিও না'—তখনই আমার হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল,……উপনিষদের এক এক মহাবাক্যে আমার আত্মা জ্ঞানসোপানে উন্নত হইতে লাগিল।……কিন্তু যখন এই উপনিষদে দেখিলাম 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' 'সোহহমস্মি' 'তত্ত্বমসি'—এই আত্মা ব্রহ্ম, তিনি আমি, তিনি তুমি'—তখনই বুঝিলাম যে ব্রাহ্মধর্মের মূলতত্ত্বের সহিত ইহার সকলবাক্যের কোনো ঐক্য নাই।…আবার যখন তাহাতে দেখিলাম ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মুক্তি নির্বাণমুক্তি, তখন আমার আত্মা তাহাতে ভয় দর্শন করিল। 'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।' যেমন নদীসকল স্যন্দমান হইয়া নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রেতে লীন হয়, সেইপ্রকার ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পূর্ণপুরুষকে প্রাপ্ত হয়। ইহা তো মুক্তির লক্ষণ নহে, ইহা ভয়ানক প্রলয়ের লক্ষণ, কোথায় ব্রাহ্মধর্মে

আত্মার অনন্ত উন্নতি, আর কোথায় তাহার এই নির্বাণমুক্তি ···বেদান্তের এই নির্বাণমুক্তি আমার হৃদয়ে স্থান পাইল না।" [১৮৬৭ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ]

দেবেন্দ্রনাথের এই ভক্তিবাদী সিদ্ধান্তকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে অক্ষয়কুমার দত্ত দেবেন্দ্রনাথকে দিয়েই বেদের অপৌরুষেয়তাকে অস্বীকার করালেন। বেদের অধ্যাত্ম-উপলব্ধির মন্ত্রমালাই যে 'বেদ অভ্রান্ত' এই মতবাদের উৎপত্তির কারণ সেকথা বোধহয় দেবেন্দ্রনাথ বা অক্ষয়কুমার ভেবে দেখেন নি। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিবাদের ফলেই 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে'র মতো গদ্যশিল্পের আবির্ভাব—পরবর্তীকালে যার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালায়। বস্তুত রামমোহনপরবর্তী উনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্মসঙ্গীতে এবং রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মরসের কবিতায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরই ভাবকল্পনার সুদূরপ্রসারী বিস্তার।

পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্র বাইবেল অবলম্বনে যে পাশ্চাত্য ভক্তিবাদের আমদানী করতে চেয়েছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের তা মনঃপূত হয় নি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণসান্নিধ্যে আসার পর থেকে কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে জগতের বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক চর্চার আগ্রহ ক্রমবর্ধমান হয়। রামমোহনের তুলনামূলক ধর্মচর্চার ঐতিহ্য তো ছিলোই। কেশবচন্দ্র তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা বিভিন্ন ধর্ম ও সেই সব ধর্মের সাধকদের জীবন সম্বন্ধে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করিয়েছিলেন। গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়ের 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম', 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তাঁহার স্বভাবনিষ্ঠ যোগ,' ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের 'ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা', 'ঈশাচরিতামৃত', প্রতাপচন্দ্র মজুমদারেব 'Oriental Christ', অঘোরনাথ গুপ্তের 'শাক্যমুনি,' গিরিশচন্দ্র সেনের 'মোহাম্মদেব জীবনী,' 'মহাপুরুষ মোহাম্মদ ও তৎপ্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম,' প্রভৃতি গ্রন্থমালা বাংলাসাহিত্যে অধ্যাত্মমননের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে গিরিশচন্দ্র সেনের 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী,' বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গের প্রথমযুগের দৃষ্টান্ত।

ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকেই সর্বচেয়ে অধ্যাত্মগুণমণ্ডিত মনে করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র পরস্পরকে কতখানি প্রভাবিত করেছিলেন, এ নিয়ে পরবর্তীকালে বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। এ বিষয়ে কেশবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি দিব্যদর্শন স্মরণীয়—"কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবাব আগে তাকে দেখলাম।

সমাধি অবস্থায় দেখলাম, কেশব সেন আর তার দল। একঘর লোক আমার সামনে বসে রয়েছে। কেশবকে দেখাচ্ছে, যেন একটা ময়ূর তার পাখা বিস্তার করে বসে আছে। পাখা অর্থাৎ দলবল, কেশবের মাথায় দেখলাম লালমণি, ওটি রজোগুণের চিহ্ন। কেশব শিষ্যদের বলছে—'ইনি কি বলছেন, তোমরা সব শোন।' মাকে বললাম, 'মা, এদের ইংরাজী মত, এদের বলা কেন?' তারপর মা বুঝিয়ে দিলে যে, কলিতে এরকম হবে। তখন এখান থেকে হরিনাম আর মায়ের নাম ওরা নিয়ে গেল। তাই মা কেশবের দল থেকে বিজয়কে নিলে। কিন্তু আদি সমাজে গেল না।"[১০]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এজাতীয় আরো ভবিষ্যদ্‌দর্শনের কথা বলে গেছেন। বিশেষতঃ নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর দর্শনের কথা আমরা জানি। আলোচ্য কেশব-প্রসঙ্গে দর্শনটির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় আদিব্রাহ্মসমাজে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাবসাধনার প্রভাব বিস্তৃত হয় নি।

কেশবচন্দ্রের বংশধারায় ঐতিহ্যগতভাবে বৈষ্ণবভক্তি তো ছিলই, আর বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে ঈশ্বরের মাতৃনাম তো বহু যুগ থেকে উচ্চারিত। সেক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র যে বিশেষভাবে হরিনাম ও মায়ের নাম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে পেলেন—একথার তাৎপর্য বোধ করি এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণসাধনায় এ দুই নাম নবযুগের অধ্যাত্মপ্রেরণার প্রোজ্জ্বল প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্নেহলাভে ধন্য হয়েছিলেন। নিরাকার উপাসনার অনুগামী হয়েও বিজয়কৃষ্ণ ঈশ্বরের রূপময় প্রকাশ প্রত্যক্ষ করে সাকার সাধনার গভীরে প্রবেশ করেন। শিবনাথ কেশবচন্দ্রের দল থেকে বেরিয়ে এসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুক্ষণ ঈশ্বর-তন্ময়তায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুরাগভাজন হয়েছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অবধি ব্রাহ্ম-আন্দোলনের বিস্তৃতির পর থেকেই এ সমাজের প্রভাব শিক্ষিতসমাজে সঙ্কুচিত হয়ে আসে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মবিবাহ-আইন উপলক্ষ্যে কেশবচন্দ্রের নিজেকে অহিন্দু ঘোষণা, দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরস্বরূপের সগুণ অথচ নিরাকার উপাসনার মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ রাখা ও অন্যদের মতবাদকে ভ্রান্ত মনে করা, তৃতীয়তঃ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক

---

১০ কথামৃত : ৪র্থ : ৯ই আগষ্ট, ১৮৮৫

আন্দোলনের প্রভাবে ক্রমে ঈশ্বর-অন্বেষণের আগ্রহ হ্রাস—এগুলিই ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবলোপের মূল কারণ।

রামমোহন থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী অবধি ব্রাহ্ম-আন্দোলন যুক্তিবাদী আধুনিক চিন্তার আবর্তে ঈশ্বরঅনুধ্যানের স্থিরবিন্দুতে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত তরুণসমাজকে সংহত করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের নীতিপরায়ণতা, সৌন্দর্যরুচি, ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শ যে বাঙালী সংস্কৃতির নবরূপান্তরে অনেক পরিমাণ সহায়তা করেছিল, সে বিষয়ে কোনো মতভেদই থাকতে পারে না। অপরপক্ষে একটি সংকীর্ণ শিক্ষিতগোষ্ঠীর বিশেষ কিছু নেতৃবৃন্দের ধারণা অনুযায়ী ধর্ম ও সমাজের হাজার বছরের বিবর্তন সংহত হয়ে যাবে—এ আশাও বাতুলতা। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবান্দোলনের ফলে ভারতীয় ধর্মচেতনার সর্ববিধ প্রকাশের নিজস্ব সার্থকতা প্রমাণিত হয়ে ব্রাহ্মসমাজের আরব্ধ প্রচেষ্টাকে পূর্ণতা দান করলো এবং সনাতন ধর্মের নিজস্ব প্রাণশক্তিও পৃথিবীর ইতিহাসে ব্যাপ্ততম ও গভীরতম শ্রীরামকৃষ্ণসাধনায় প্রমাণিত হলো। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্রাহ্মভক্তদের বলেছিলেন, "ব্রাহ্মসমাজের তোমরা জ্ঞানী নও, ভক্ত।" ব্রহ্মসাধনার ক্ষেত্রে ভক্ত ও জ্ঞানীর পার্থক্যটুকু মনে রেখে আমরা পরবর্তী আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে ব্রহ্মের দুটি রূপ—"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তঞ্চৈবামূর্তঞ্চ মর্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ।"—মূর্ত ও অমূর্ত, মর ও অমর, পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।"[১১] কঠোপনিষদের কাব্যময় ভাষায়—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।[১২]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়—'আগুনে যে রং-এর বড়ি দেবে সেই রং দেখা যাবে।'[১৩] সুতরাং ঈশ্বরীয় রূপের ইতি করতে যাওয়া চিন্তার সীমাবদ্ধতারই পরিচায়ক। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মশাস্ত্র সেই অসীম অব্যক্তের সামান্য আভাস দিতে পারে মাত্র। তাই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন,—"ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন সব এঁটো হয়ে গেছে। মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—

১১ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ : দ্বিতীয়াধ্যায় : তৃতীয় ব্রাহ্মণ : ১ম শ্লোক।
১২ কঠোপনিষৎ : ২।২।৯
১৩ কথামৃত . ৪র্থ

তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিষ কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিষটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই।"[১৪]

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে আছে—

উচ্ছিষ্টং সর্বশাস্ত্রাণি সর্ববিদ্যা মুখে মুখে।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানমব্যক্তং চেতনাময়ম্॥

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পরিকরবৃন্দের কাছে এই সপ্তমভূমির অনুভূতির কথা বলতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সে চেষ্টার উপক্রমেই স্বস্বরূপে সমাহিত তাঁর পক্ষে আর বক্তার ভূমিকা গ্রহণ সম্ভব হয় নি।

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোনো কোনো সিদ্ধান্ত প্রচলিত দার্শনিক ধারণাকে অতিক্রম করে। যেমন, জ্ঞান, অজ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর উক্তি—"ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। যার জ্ঞান আছে বোধ হয়েছে, তার অজ্ঞানও আছে। বশিষ্ঠ শতপুত্রশোকে কাতর হলেন। লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করাতে রাম বললেন, ভাই, জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও, যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান। পায়ে যদি কাঁটা ফোটে, আর একটি আহরণ করে সেই কাঁটাটি তুলে দিতে হয়। তারপর দ্বিতীয় কাঁটাটিও ফেলে দেয়।...

দেখনা, যার আলো জ্ঞান আছে, তার অন্ধকার জ্ঞান আছে; যার সুখবোধ আছে, তার দুঃখবোধ আছে; যার পুণ্যবোধ আছে, তার পাপ বোধ আছে; যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধ আছে; যার শুচিবোধ আছে, তার অশুচিবোধ আছে; যার আমি বোধ আছে, তার তুমি বোধ আছে।

"বিজ্ঞান কিনা তাঁকে বিশেষরূপে জানা। কাষ্ঠে আছে অগ্নি, এই বোধ—এ বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুনে ভাত রাঁধা, খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান। তাঁর সঙ্গে আলাপ, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা—বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে, দাসভাবে, মধুরভাবে—এরই নাম বিজ্ঞান। জীবজগৎ তিনি হয়েছেন, এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।"[১৫]

সিঁড়ির উপমা দিয়ে তিনি 'বিজ্ঞানের' কথাটি এইভাবে বিশদ করেছেন—"জ্ঞানী নেতি নেতি করে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করে তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাদে পৌঁছানো যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি বিশেষরূপে

---

১৪ কথামৃত : ৩য় : ৫ই আগষ্ট, ১৮৮২

১৫ তদেব : ৩য় : ৯ই সেপ্টম্বর ১৮৮৩

তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন তিনি·আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন ছাদ যে জিনিষে তৈরী, সেই ইঁট, চুন, সুরকিতেই সিঁড়িও তৈরী। ছাদে অনেকক্ষণ লোক থাকতে পারে না, আবার নেমে আসে। যাঁরা সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্মদর্শন করেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীবজগৎ তিনিই হয়েছেন। সা রে গা মা পা ধা নি। 'নি' তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। 'আমি' যায় না, তখন দেখে তিনিই আমি, তিনিই জীবজগৎ সব।"[১৬] উপলব্ধির এই আলোকেই সমাধির স্তর থেকে নেমে এসে মর্ত্যপৃথিবীর মানুষভাইদেব ডেকে বিবেকানন্দ বলেছিলেন—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥

শ্রীরামকৃষ্ণভাবসিন্ধুই বিবেকানন্দ-জীবনকাব্যে উদ্বেলিত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "প্রথম নেতি নেতি করবার সময় জীবজগৎকে ছেড়ে দিতে হয়।···বেলের সার বলতে গেলে শাঁসই বোঝায়, তখন বীচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা ওজনে কত ছিল বলতে গেলে, শুধু শাঁস ওজন করলে হবে না। ওজনের সময় শাঁস, বীচি, খোলা সব নিতে হবে। যারই শাঁস, তারই বীচি, তারই খোলা।

যাঁরই নিত্য, তারই লীলা। তাই আমি নিত্য লীলা সবই লই। মায়া বলে জগৎকে উড়িয়ে দিই না। তা হলে যে ওজনে কম পড়বে।"[১৭] একহিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই মতবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা যেতে পারে। কিন্তু সমাধির উচ্চতম স্তরের থেকে নারদ, শুকদেব, বিবেকানন্দের মতো কজন ফিরে এসে ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকতে পারেন, সে কথা ভেবে দেখলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই বিজ্ঞানতত্ত্ব অদ্বৈতদর্শনের ক্ষেত্রেও নূতন ব্যঞ্জনা। নির্বিকল্প সমাধির জন্য ব্যাকুল নরেন্দ্রনাথকে তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, সমাধির চেয়ে উঁচু অবস্থা আছে।

সমাধির সর্বোচ্চস্তরের ব্রহ্মোপলব্ধিব সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের প্রতি কর্মে ও স্তরে ব্রহ্মবোধকে পরিব্যাপ্ত করার পন্থা হিসাবেও শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্যাখ্যাত নিত্য ও

১৬ কথামৃত: ৩য়. ৫ই আগষ্ট, ১৮৮২
১৭ তদেব: ১ম ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪

লীলাতত্ত্বের উপযোগিতা স্মরণীয়। এই দৃষ্টিতেই বিচার করলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় বলা চলে, 'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।' শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকরদের অন্যতম স্বামী অখণ্ডানন্দ জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে মুর্শিদাবাদের সারগাছি-গ্রামে দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের সেবায় যখন আশ্রমপ্রতিষ্ঠার সূচনা করেন, তখন প্রথম জীবনের 'নেতি', 'নেতি'-বিচারে হিমালয় যাত্রা এবং শেষজীবনে 'ইতি', 'ইতি'-বিচারে বিশ্বচরাচরময় ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধিগত পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করে-ছিলেন। বিবেকানন্দের 'কর্মে পরিণত বেদান্ত' বা Practical Vedanta-এর মূলে নিত্য ও লীলার এই সংযোগ।

প্রশ্ন উঠতে পারে মানবকল্যাণের জন্য আত্মদানের আদর্শই তো মানুষের পক্ষে যথেষ্ট। ব্রহ্মোপলব্ধি, শিবজ্ঞানে জীবসেবা, নরনারায়ণবাদের কি প্রয়োজন ? উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতসমাজে ধ্রুববাদ (Positivism) ও হিতবাদের (Utilitarianism) প্রভাবে একদা মানবিকতাবাদের আগ্রহই প্রাধান্য লাভ করেছিল। একালেও যাঁরা জড়বাদভিত্তিক সাম্যবাদে বা মানবিকতাবাদে বিশ্বাসী তাঁরা ইন্দ্রিয়াতীত অধ্যাত্ম উপলব্ধির সার্থকতা সম্বন্ধে সংশয়াচ্ছন্ন। আধুনিক চিন্তার পটভূমিতে তাই বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটি স্মরণীয়। বিদ্যাসাগরের কর্মধারাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সত্ত্বগুণ-মিশ্রিত চিত্তবৃত্তির প্রকাশরূপে দেখেছিলেন। কিন্তু তবু বিদ্যাসাগরকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, "তুমি যে সব কর্ম করছো, এ সব সৎকর্ম। যদি 'আমি কর্তা' এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পারো, তাহলে খুবই ভালো। এই নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালোবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়।...জগতের উপকার মানুষ করে না, তিনিই করছেন, যিনি চন্দ্রসূর্য করেছেন, যিনি মা বাপের স্নেহ, যিনি মহৎ-এর ভিতর দয়া, যিনি সাধু ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন।...অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে।"[১৮] অপর পক্ষে নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবই বিশ্বজনের কল্যাণে সমাধির আনন্দ লাভের বাসনা তুচ্ছ করে চরম আত্মোৎসর্গের জন্য আহ্বান করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের ছোট্ট ঘরটিতে বসে একদা তিনি 'জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে

---

১৮ কথামৃত : ৩য় : ৫ই আগষ্ট, ১৮৮২

জীবসেবা'-রূপ যে মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, বিবেকানন্দজীবনে তা পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে প্রসারিত হয়ে জীব-ব্রহ্ম ঐক্যঘোষণা করে চলেছে। ঈশ্বরানুভূতিহীন কর্ম মানুষকে অকৃতজ্ঞতা ও অতৃপ্তিতে কতো তিক্ত করে তুলতে পারে, স্বয়ং বিদ্যাসাগরের শেষজীবন তার উদাহরণ। বিদ্যাসাগর ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের গভীরে ডুব দিতে পারেন নি বলেই হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে ঈশ্বরচেতনার কথা বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য আদর্শের মানবিকতার সঙ্গে ভারতীয় নরনারায়ণবাদের মিলনসাধন উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জীবন-জিজ্ঞাসার এক প্রয়োজনীয় সর্ত ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সেবাধর্মে তার পরিণতি।

'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে'র পঞ্চমভাগের পরিশিষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটি সংস্থাপিত। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর—এঁদের দেখতে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই গিয়েছিলেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত অধরলাল সেনের বন্ধুহিসাবে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিম অধরের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্দর্শনে এসেছিলেন। বঙ্কিমের সঙ্গে আলাপেও পরোপকার প্রসঙ্গ উঠেছিল। এক্ষেত্রেও উপকার প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্য—"পরের উপকার, পরের মঙ্গল সে ঈশ্বর করেন…তুমি দয়া কর আর না কর, তিনি কোন না কোন সূত্রে তাঁর কাজ করবেন।"[১৯]

পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা—এ দুয়ের মধ্যে কোনটি আগে?—এ প্রশ্নও উঠেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "কেউ কেউ মনে করে শাস্ত্র না পড়লে, বই না পড়লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তারা মনে করে, আগে জগতের বিষয়, জীবের বিষয় জানতে হয়, আগে সায়েন্স পড়তে হয়। তারা বলে ঈশ্বরের সৃষ্টি এসব না বুঝলে ঈশ্বরকে বোঝা যায় না। তুমি কি বল? আগে Science না আগে ঈশ্বর?" বঙ্কিম—"হ্যাঁ, আগে পাঁচটা জানতে হয়, জগতের বিষয়। একটু এ দিককার জ্ঞান না হলে ঈশ্বর জানবো কেমন করে? আগে পড়াশুনা করে জানতে হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ঐ তোমাদের এক। আগে ঈশ্বর, তারপর সৃষ্টি। তাঁকে লাভ করলে দরকার হয়তো সবই জানতে পারবে। যদি যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে পারো, যো সো করে, তা হলে যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, যদু

১৯ কথামৃত : ৫ম : ৬ই ডিসেম্বর : ১৮৮৪

মল্লিকের ক-খানা বাড়ী, কত কোম্পানীর কাগজ, ক-খানা বাগান এও জানতে পারবে।"[২০]

অনুশীলনধর্মপ্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত দেবী চৌধুরাণীর পাঠ্যতালিকা মনে করলেই এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যেতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বৈষয়িক জ্ঞানকে অধ্যাত্মজ্ঞানের পূর্বসর্তরূপে মানতে রাজী হন নি। তাই 'দেবী চৌধুরাণী' পাঠ শুনবার সময় ভবানী পাঠকের 'দোকানদারীর'র প্রস্তাব তাঁর কাছে অসহ্য ঠেকেছে। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম যে রাধাকাহিনী বা বৃন্দাবনলীলা বর্জন করেছেন সে প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যঙ্গোক্তি—'ওসব কথা ওদের খবরের কাগজে নাই'[২১]—এক্ষেত্রে স্মরণীয়। অপরপক্ষে 'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রফুল্লর সরল স্বামীপ্রেমকে পতিব্রতার ধর্মরূপে তিনি প্রসন্ন সমর্থনও জানিয়াছেন।

বঙ্কিম-সমসাময়িক হিন্দুধর্মের প্রচারকদের মধ্যে পণ্ডিত শশধর তর্ক চূড়ামণির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথন আর একদিক থেকে আলোচনাযোগ্য। লোককল্যাণের জন্য শশধরের ধর্মপ্রচারে আগ্রহের কথা জেনেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরাদেশ ভিন্ন প্রচারকার্যের মূল্য স্বীকার করেন নি। শশধরকে তিনি বলেছিলেন, "যদি আদেশ হয়ে থাকে, তাহলে লোকশিক্ষায় দোষ নাই। আদেশ পেয়ে যদি কেউ লোকশিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না। বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে, তাহলে এমন শক্তি হয় যে বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচো হয়ে যায়।......চুম্বক পাথর কি লোহাকে বলে তুমি আমার কাছে এস ? এস বলতে হয় না,—লোহা আপনি চুম্বক পাথরের টানে ছুটে আসে। এরূপ লোক পণ্ডিত নয় বটে। তা বলে মনে করো না যে তার জ্ঞানের কিছু কমতি হয়। বই পড়ে কি জ্ঞান হয় ? যে আদেশ পেয়েছে, তার জ্ঞানের শেষ নেই, সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, ফুরায় না।

ও-দেশে ধান মাপবার সময় একজন মাপে, আর একজন রাশ ঠেলে দেয়। তেমনি যে আদেশ পায় সে যত লোকশিক্ষা দিতে থাকে, মা আমার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন। সে জ্ঞান আর ফুরায় না।"[২২] এক্ষেত্রে স্মরণীয়, পরবর্তীকালে পণ্ডিত শশধরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সাক্ষাৎকারের ঘটনা নিয়ে 'সাহিত্য' পত্রিকায় বেশ কিছু বাদানুবাদ হয়। বিশেষতঃ 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলা

২০, ২১ কথামৃত : ৫ম : ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪

২২ তদেব : ১ম : ২৫শে জুন, ১৮৮৪

প্রসঙ্গে' বিধৃত বিবরণটিই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। শাস্ত্রপাণ্ডিত্যহীন শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের কাছে সেকালের হিন্দুয়ানির সেরা ব্যাখ্যাতা পণ্ডিতের এতটা বিনয় স্বীকার বোধ করি অনুরাগীদের ভালো লাগে নি এবং পণ্ডিত শশধরও পূর্বসিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে থাকবেন। সে যাই হোক, শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে সেকালের সব পণ্ডিতই যে স্তব্ধ হয়ে শুনতেন এবং নিজেদের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে যেতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণমনীষার যে সামান্যপ্রান্ত আমরা স্পর্শ করার চেষ্টা করলাম, তাতেও দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণেশ্বরের সেই বৃন্দে ঝির কথাই সত্য—প্রথম দিন দর্শনার্থী মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে যে বলেছিল, 'আর বাবা বইটই! সব ওঁর মুখে।'[২৩]

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের পাশাপাশি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলা যায় সমগ্র যুগজিজ্ঞাসার অন্তরতম উত্তর। ভারতীয়তার মর্মবাণী যা, তাই শ্রীরামকৃষ্ণবাণী। একদিক থেকে যা ভারতীয়, অন্যদিক থেকে তাই বিশ্বজনীন। শুধু ভারতবাসীরই নয়, মনের দ্বন্দ্বে সমাচ্ছন্ন পৃথিবীর আজ প্রয়োজন পরম উপলব্ধির ঐক্যবোধ, সমন্বয়, ত্যাগ ও সেবার আদর্শ।

উনবিংশ শতাব্দীর মননলোকে যে প্রাচ্যবাদ বা Orientalism সমগ্র পাশ্চাত্যের কাছে ভারতীয় প্রজ্ঞার এক বিস্ময়কর উদাহরণ স্থাপন করেছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন গল্পে, গানে, উপমায়, রূপকে, অনুভূতিতে ও বিশ্বকল্যাণে আত্মদানে সেই প্রাচ্য প্রজ্ঞার রূপমূর্তি হয়ে ধরা দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণবাণীই সংস্কৃত ও ইংরেজীতে পণ্ডিতজনের তত্ত্বালোচনার 'চন্দ্রচূড়জটাজালে' আবদ্ধ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মর্মপ্রবাহ সর্বজনের কাছে উন্মুক্ত করে দিলো। বাংলা চলতি গদ্য জগতের মহত্তম উপলব্ধির যোগ্যবাহন হয়ে উঠলো। একদিকে দেখা দিলো স্বামী বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা'র সরস রচনাভঙ্গী, আর একদিকে দেখা দিল স্থিতধী মননের সংহত গদ্যে 'বর্তমান ভারত' বা স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' জাতীয় গ্রন্থ। আবার বাংলার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে লোকশিক্ষার এক নতুন প্রেরণা দেখা দিল গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অপরেশচন্দ্র প্রভৃতির নাটকে। স্বামী বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, অক্ষয়কুমার সেন—এমনি কতজনের লেখনী থেকে সংগীত, কবিতা ও জীবনীকাব্যের নব নব প্রস্রবণ

২৩ কথামৃত. ১ম · ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২

দেখা দিল বাংলাসাহিত্যে। তবু সব মিলিয়ে তাঁর জীবন ও কথা আজও তেমনি অন্তহীন রহস্যনিলয়। যিনি যেভাবেই আলোচনা করুন, তাঁকে দেখার ও অনুভবের শেষ নেই।

শাস্ত্রীয় উপলব্ধির পাশাপাশি নিতান্ত ঘরোয়া উদাহরণের দ্বারা বক্তব্য বিষয়কে তিনি একান্ত কাছের জীবন্ত সত্যে পরিণত করেছেন। সেইসঙ্গে ছোট ছোট গল্পের সাহায্যে তত্ত্বকে শ্রোতার হৃদয়ে প্রত্যক্ষ বাস্তব ও সাগ্রহ অনুধ্যানের বিষয় করে তুলেছেন। ভাববৈচিত্র্য ও গল্পকাহিনীর অজস্রতায় শ্রীরামকৃষ্ণবাণী-সংগ্রহ জগতের অন্য যে কোনো মহাপুরুষের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসর। তার কারণ জগতের ইতিহাসে এই প্রথম সকল মত ও পথের সাধনাকে সত্য জেনে সমান শ্রদ্ধায় স্বীকৃতিদান। আবার সর্বভাবের প্রতি শ্রদ্ধাসত্ত্বেও আপন মাতৃভাবে তিনি অবিচল। এই মাতৃভাবই বিবেকানন্দের ভাষায় Mother of all religions—সমস্ত ধর্মের জননীস্বরূপ—সেই অদ্বৈততত্ত্ব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—"যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক, অনেকেই একঘেয়ে। আমি কিন্তু দেখি সব এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত সব মতই সেই একককে লয়ে। যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার, তাঁরই নানা রূপ।

বেদে যাঁর কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা, পুরাণেও তাঁরই কথা। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথা, যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা।

বেদে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ ব্রহ্ম। তন্ত্রে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ শিবঃ কেবলঃ—কেবলঃ শিবঃ। পুরাণে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথাই বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে আছে।"[২৪]

আবার লীলা ও নিত্যের অভেদ সত্ত্বেও নিত্যের দিক্ থেকে দেখলে—"ঈশ্বর সৎ, আর সমস্ত অসৎ, এইটি জানার নাম জ্ঞান।" "সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম নিত্য—তিনি কালেই আছেন—আদি অন্ত রহিত। তাঁকে মুখে বর্ণনা করা যায় না। বলা যায় তিনি চৈতন্যস্বরূপ, তিনি আনন্দস্বরূপ। জগৎ অনিত্য, তিনিই নিত্য। জগৎ ভেল্কীস্বরূপ। বাজীকরই সত্য, বাজীকরের ভেল্কী অনিত্য।"[২৫]

কিন্তু এই অদ্বৈত অধিষ্ঠান থেকে নেমে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবমুখে ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকতেন। এ প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দজীর বিশ্লেষণটি প্রণিধানযোগ্য—

২৪ কথামৃত : ৪র্থ : ৩রা জুলাই, ১৮৮৪

২৫ তদেব : ৪র্থ : ২রা অক্টোবর, ১৮৮৪

"ঠাকুরের মনের স্বভাব আলোচনা করিতে যাইয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নির্বিকল্প ভূমিতে উঠিয়া অদ্বৈত ভাবে ঈশ্বরোপলব্ধিই মানবজীবনের চরমে আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার ঐ ভূমিলব্ধ আধ্যাত্মিক দর্শন সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, 'সব শেয়ালের এক রা,' অর্থাৎ সকল শিয়ালই যেমন একভাবে শব্দ করে তেমনি নির্বিকল্প ভূমিতে যাঁহারাই উঠিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই ঐ ভূমি হইতে দর্শন করিয়া জগৎকারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে একই কথা বলিয়া গিয়াছেন। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধেও ঠাকুর বলিতেন,"হাতীর বাহিরের দাঁত যেমন শত্রুকে মারবার জন্য এবং ভিতরের দাঁত নিজের খাবারের জন্য, সেইরকম মহাপ্রভুর দ্বৈতভাব বাহিরের ও অদ্বৈতভাব ভিতরের জিনিষ ছিল।"[২৬]

সাকার নিরাকার, দ্বৈত অদ্বৈত, নিত্য লীলার তত্ত্বচিন্তা শ্রীরামকৃষ্ণবাণীতে অপরিমেয় কাব্যমাধুরী নিয়ে এইভাবে ফুটেছে—"সাকার নিরাকার দুই সত্য। শুধু নিবাকার বলা কিরূপ জান? যেমন, রসুন চৌকির একজন পোঁ ধরে থাকে—তার বাঁশীর সাত ফোকর থাকা সত্ত্বেও, কিন্তু আর একজন দেখ রাগ-রাগিণী বাজায়। সেইরূপ সাকারবাদীরা দেখ ঈশ্বরকে কতভাবে সম্ভোগ করে। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর—নানাভাবে।

"কি জান অমৃতকুণ্ডে কোনও রকমে পড়া। তা স্তব করেই হোক অথবা কেউ ধাক্কা মেরেছে আর তুমি কুণ্ডে পড়ে গেছ, একই ফল। দুইজনেই অমর হবে।"[২৭]

"......সচ্চিদানন্দ যেমন অনন্ত জলরাশি। মহাসাগরে জল, ঠাণ্ডা দেশে স্থানে স্থানে যেমন বরফের আকার ধারণ করে, সেইরূপ ভক্তিহিমে সেই সচ্চিদানন্দ ভক্তের জন্য সাকার রূপ ধারণ করেন। ঋষিরা সেই অতীন্দ্রিয় চিন্ময় রূপ দর্শন করেছিলেন আবার তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছিলেন। ভক্তের প্রেমের শরীর ভাগবতীতনু দ্বারা সেই চিন্ময়রূপ দর্শন হয়।

"আবার আছে ব্রহ্ম অবাঙ্মনসোগোচর। জ্ঞান সূর্যের তাপে সাকার বরফ গলে যায়......অনন্তকে কে মুখে বোঝাবে। পাখি যত উপরে উঠে, তার উপর আরও আছে।"[২৮]

---

২৬ লীলাপ্রসঙ্গ : গুরুভাব . উত্তরার্ধ : ১৯১-১৯২ । ১৩৬১ সং)

২৭ কথামৃত : ৫ম : ২২শে এপ্রিল, ১৮৮৩

২৮ তদেব

উপলব্ধির এই আনন্দঘন প্রকাশই জগতের সব সাহিত্যসৃষ্টির মৌলপ্রেরণা। সাহিত্য শুধু জীবনের যথাস্থিত অনুকরণ নয়, শুধু ব্যাখ্যা বা সমালোচনা নয়, সাহিত্য সর্বহৃদয়ের সহিত সংযোগ। বিশ্বসাহিত্যে মাঝে মাঝে এমনি সব সাধক-সাহিত্যিক দেখা দিয়েছেন, যাঁদের বাণী ও রচনায় নিখিলমানবের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মসত্তার জাগরণ। বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণবাণী তেমনি সাহিত্যকৃতি।

ভারতীয় সাহিত্যে তাই সহৃদয় হৃদয়ে ব্রহ্মানন্দ-সহোদর কাব্যরসাস্বাদন। আবার এমনও ঘটে যখন কাব্যাস্বাদ ও ব্রহ্মাস্বাদ এক হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমায় ব্রহ্মোপলব্ধির মুহূর্ত—"সাত দেউড়ির পর রাজা। প্রত্যেক দেউড়িতে এক একজন ঐশ্বর্যবান পুরুষ বসে আছেন। প্রত্যেক দেউড়িতেই শিষ্য জিজ্ঞাসা করছে, এই কি রাজা? গুরুও বলছেন, না, নেতি নেতি। সপ্তম দেউড়িতে গিয়ে যা দেখলে, একেবারে অবাক! আনন্দে বিহ্বল। আর জিজ্ঞাসা করতে হল না, এই কি রাজা? দেখেই সব সংশয় চলে গেল।"[২৯]

২৯ কথামৃত : ৫ম : ২২শে এপ্রিল ১৮৮৩

ঈশ্বর-সান্নিধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে, ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। আর সে উদ্দেশ্য যে তিনি আপন জীবনে কতো বৈচিত্র্যে ও কী পরম একাত্মতায় অনুভব করেছিলেন তাঁর সেই সাধকজীবনের পটভূমিটিও অল্পবিস্তর সকলের জানা। পঞ্চবটীর চারধারে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বহস্তবর্ধিত যে লতাপাতার বেড়াটি তাঁর সাধনস্থলকে সকলের চোখের আড়ালে রাখতো, আজ তা অপসৃত। কিন্তু জনকোলাহলে বোধ করি সে সাধনস্থলের প্রচ্ছন্ন মাধুর্য আজ আর বোঝার উপায় নেই—অথচ একদিন এইখানেই সকলের চোখের আড়ালে একের পর এক তাঁর সাধনার বিচিত্র পন্থাগুলি অতিবাহিত হয়েছে। কামারপুকুরের পল্লীপথে যে শিশুটি একদিন শ্যামল মেঘের বুকে শুভ্র বলাকার মালা দেখে তন্ময় হয়েছিল, যে শিশুটি বিশালাক্ষী মন্দিরে যাওয়ার পথে দিব্য আবেশে সংজ্ঞা হারিয়েছিল, সেই তো পরিণত জীবনে একদিন বিশ্বচরাচরের অনন্ত সত্যের প্রতিভাস দেখতে পেয়েছিল, জ্যোতির্ময়ী বিশ্বরূপিণী তাকে চিরকালের মতো আপন অঞ্চলের নিধি করে বুকে নিয়ে ফিরেছিলেন। শুধু ভক্তের ভগবানকে চাওয়া তো নয়, ভগবানের ভক্তকে চাওয়ার ব্যাকুলতা এই দক্ষিণেশ্বরের মন্দির থেকে পঞ্চবটীর ধুলায় ধুলায় আজও মিশে আছে। শ্রীঅরবিন্দ দক্ষিণেশ্বরের যে মাটি তাঁর নিজের ঘরে রেখেছিলেন, সরকারী লোকে তাকে বিপ্লবের মসলা ভেবে খুব ভুল করে নি। জগতের সেরা অধ্যাত্ম-বিপ্লবের মালমসলা যে ওই দক্ষিণেশ্বরের মাটিতে তাতে সন্দেহ কি ?

কচিৎ কখনো অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ আপন স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। সুদীর্ঘ বারো বছর তিনি সাধনা করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে সাধনা করলেই যে-কেউ শ্রীরামকৃষ্ণ হয় না। সেদিন দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, মাষ্টারমশাই, মহিমাচরণ এবং আরো দু'একটি ভক্ত ছিলেন। কথায় কথায় মহিমাচরণকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, 'আমার যা অবস্থা—আপনি বলেন, সাধন করলেই ওরকম হয়, তা নয়। এতে কিছু বিশেষত্ব আছে।' এমন সুদৃঢ়ভাবে বিশেষত্বের দাবী, শ্রীরামকৃষ্ণচরিত্রের বিনয় ও নম্রতার কথা মনে

করলে একটু আশ্চর্য ঠেকে বই কি! কিন্তু মহিমাচরণ সেদিন উপলক্ষ্য, আসল লক্ষ্য অন্তরঙ্গ রাখাল, মাষ্টারমশাই প্রভৃতি। বললেন,—'কথা কয়েছে; শুধু দর্শন নয়—কথা কয়েছে। বটতলায় দেখলাম, গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে—. তারপর কত হাসি! খেলার ছলে আঙ্গুল মটকানো হলো। তারপর কথা।—কথা কয়েছে!

'তিন দিন ধরে কেঁদেছি, আর পুরাণ তন্ত্র—এসব শাস্ত্রে কি আছে—(তিনি) সব দেখিয়ে দিয়েছেন!

'মহামায়ার মায়া যে কি, তা একদিন দেখালে! ঘরের ভিতর ছোট্ট জ্যোতিঃ, ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগলো। আর জগৎকে ঢেকে ফেলতে লাগলো!'

'আশ্চর্য দর্শন সব হয়েছে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন।'

'তাই ভাবি এর (নিজের) ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত লয়ে লীলা করছেন। যখন প্রথম এই অবস্থা হলো, তখন জ্যোতিতে দেহ জলজল করতো। বুক লাল হয়ে যেতো। তখন বললুম, 'মা, বাইরে প্রকাশ হোয়ো না, ঢুকে যাও ঢুকে যাও, তাই এই হীন দেহ।......এখন বাহিরে প্রকাশ নাই। এতে আগাছা পালায়—যারা শুদ্ধ ভক্ত, তারাই কেবল থাকবে।'

'সাধ ছিল—মাকে বলেছিলাম, 'মা, ভক্তের রাজা হব!' আবার মনে উঠলো, 'যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তার এখানে আসতেই হবে। আসতেই হবে! দ্যাখো, তাই হচ্ছে—সেই সব লোকই আসছে!

'এর ভিতর কে আছেন, আমার বাপ জানতো! বাপ গয়াতে স্বপ্নে দেখেছিলেন,—রঘুবীর বলছেন, আমি তোমার ছেলে হব।

'ন্যাংটা বেদান্তের উপদেশ দিলে। তিন দিনেই সমাধি। মাধবীতলায় ঐ সমাধি অবস্থা দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে বলছে, আরে এ কেয়া রে! পরে সে বুঝতে পারলে—এর ভিতর কে আছে। তখন আমায় বলে, তুমি আমায় ছেড়ে দাও! ওকথা শুনে আমার ভাবাবস্থা হয়ে গেল; আমি সেই অবস্থায় বললাম, বেদান্ত বোধ না হলে তোমার যাবার যো নাই!

'কুঠির উপর থেকে আরতির সময় চেঁচাতাম, ওরে তোরা কে আছিস আয়। দ্যাখো এখন সব ক্রমে ক্রমে এসে জুটছে।

'এর ভিতর তিনি নিজে রয়েছেন—যেন নিজে থেকে এই সব ভক্ত লয়ে কাজ করছেন।

'সবরকম সাধন এখানে হয়ে গেছে—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ। হঠযোগ পর্যন্ত—আয়ু বাড়াবার জন্য। এর ভিতর একজন আছে। তা না হলে সমাধির পর ভক্তি ভক্ত লয়ে কেমন করে আছি।'

[৯ই আগষ্ট ১৮৮৫, কথামৃত : চতুর্থ : পৃঃ—৩১৬-৩১৭]

সেদিন উপস্থিত সবাই,—এ কথার গুরুত্ব অর্থাৎ 'এর ভিতর একজন থাকা'র তাৎপর্য যে বুঝেছিলেন তা মনে হয় না। কিন্তু যাঁরা বুঝবার তাঁরা জানতেন, এই ভিতরের একজন আর বাইরের একজন—ভগবান ও ভক্ত—নিত্য আর লীলা দুইরূপ আসলে এক অদ্বয় সত্য। যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণীর ভাষায় এবার 'নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।'

সাধনার অন্তে ঈশ্বরলাভ আর ঈশ্বর লাভান্তে সাধনা—ফুল থেকে ক্রমে ফলে পরিণতি এবং আগে ফল পরে ফুল—দুধরনের ঈশ্বর সান্নিধ্যের কথা আমরা শুনেছি। যেমন ধরুন, বৈষ্ণব ভক্তি—শাস্ত্রের রাগানুগা আর রাগাত্মিকা ভক্তি। রাধাকৃষ্ণ-লীলা সহচারীদের অনুগত হয়ে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে যে ভক্তি তাই রাগানুগা। আর রাগাত্মিকার অধিকারী তাঁরাই যাঁরা জন্মে-জন্মান্তরে তাঁর অংশ, সঙ্গী বা অন্তরঙ্গ। কিন্তু দুয়েরই সাধনা আছে।

শ্রীচৈতন্য গয়াধাম থেকে নবদ্বীপে ফেরার পথে কানাই নাটশালা গ্রামের কাছে শ্রীকৃষ্ণের প্রথম দর্শন পেয়েছিলেন—নবদ্বীপে ফিরে এসে সেই কৃষ্ণদর্শন পাওয়ার ব্যাকুলতা ক্রমবর্দ্ধমান—

"প্রভু বলে, মোহর দুঃখের অন্ত নাঞি।
পাইয়াও হারাইলুঁ জীবন কানাঞি॥
সভার সন্তোষ হৈল রহস্য শুনিতে।
শ্রদ্ধা করি সভে বসিলেন চারিভিতে॥
"কানাঞি নাটশালা-নামে এক গ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিল সেই স্থান॥
তমাল শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জাসহিত কুন্তল মনোহর॥
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ লখিতে না পারি॥

হাথেতে মোহন বংশী পরম সুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর॥
নীলস্তম্ভ জিনি ভুজে রত্ন-অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার॥
কি কহিব সে পীত ধটির পরিধান।
মকর কুণ্ডল শোভে কমল নয়ান॥
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন ভিতে॥ (চৈতন্য:ভাগবত)

চৈতন্যভাগবতকার শ্রীচৈতন্যদেবের এই নবরূপান্তরের নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন—মহাপ্রভু এখন থেকে 'ভাসিলেন নিজ ভক্তি বিরহ সাগরে'। এ ভক্তি তাঁরই স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি। এই ভক্তির বিরহবোধ থেকে তাঁর শেষ জীবনের বারোটি বৎসর দিব্যোন্মাদলীলা। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের শেষাংশের এই দিব্যোন্মাদের সঙ্গে তুলনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শেষ জীবনের কয়েকটি বছর অনুক্ষণ ঈশ্বরতন্ময় থেকে বিশ্বকল্যাণের মহাব্রত উদ্‌যাপনকে স্বামী সারদানন্দ তাঁর লীলাপ্রসঙ্গে 'দিব্যভাব' কথাটির দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন। শ্রীচৈতন্য তাঁর অন্ত্যলীলায় বাইরের পৃথিবী থেকে আপন ভাব-বৃন্দাবনে আপনাকে সংহরণ করে এনেছেন এবং অবশেষে এই অনন্ত প্রেমস্বরূপের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন; আর শ্রীরামকৃষ্ণ আপন সাধনলব্ধ পরমসত্য জগতের কাছে বিতরণের জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাঙ্ময় থেকে একদিকে যেমন অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গদের জীবনে ও হৃদয়ে ভাবসঞ্চার করেছেন, তেমনি জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজে বিশ্বজননীর ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়ে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য যে কী, তা বিশ্বমানবের কাছে ঘোষণা করে গেছেন। ভক্ত-ভগবানের সেই আলাপচারীটি এখন আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয়।

শ্রীরামকৃষ্ণজীবন যদি এক মহাকাব্য হয়, তবে সে কাব্যের মূলরসটি নিশ্চয় মাতৃত্বরস। যার মূলে হয়েছে ঈশ্বরের মাতৃভাব। আবার মাতৃভাব, পিতৃভাব, সখ্যভাব, বাৎসল্যভাব সব ভাবের রাজা ছিলেন বলেই শেষ অবধি অদ্বৈত অনুভবে এসে তাঁর সব সাধনার পরিসমাপ্তি ও পরিপূর্ণতা, কিন্তু সে অদ্বৈত ভূমিতেও তাঁর শেষ কথা মনে হয় নি। জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানে এসে, সানাইয়ের সাতটি ফোকরেই পোঁ দিয়ে, ঝোলে ঝালে চচ্চড়িতে ভাজায় টকে মাছকে সব

রকমে চেখে নিয়েই তাঁর 'রসে বশে থাকা'। 'ভাব থেকে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'র যে কাহিনী তাঁর জীবনের পাতায় পাতায় ছড়ানো, আজ আমরা তারই ত্নচারটি ছবি মনে মনে আবার অনুধ্যানের চেষ্টা করবো।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মৃন্ময়ী ভবতারিণী একদিন অযুত আলোকতরঙ্গে উদ্ভাসিত হয়ে চিন্ময়ীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণচেতনায় আবির্ভূত হলেন। প্রথম সে দর্শনের পর অধ্যাত্ম অনুভবের অখণ্ড জগৎ ধীরে ধীরে তাঁর কাছে ধরা দিতে লাগলো। স্বামী সারদানন্দজীর ভাষায়, "ঠাকুরের পূজাধ্যানাদি এই সময়ে এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছিল। সেই অদ্ভুত তন্ময়ভাব, শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে আশ্রয় করিয়া সেই বালকের ন্যায় সরল বিশ্বাস ও নির্ভরের মাধুর্য্য অপরকে বুঝান কঠিন। প্রবীণের গাম্ভীর্য্য, পুরুষকার অবলম্বনে দেশ কাল···ভেদে বিধিনিষেধ মানিয়া চলা অথবা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকল দিক বজায় রাখিয়া ব্যবহার করা ইত্যাদির কিছুই উহাতে লক্ষিত হইত না। দেখিলে মনে হইত 'মা তোর শরণাগত বালককে যাহা বলিতে ও করিতে হইবে তাহা তুই-ই বলা ও করা' —সর্বান্তঃকরণে ঐরূপ ভাব আশ্রয়পূর্বক ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার ভিতর আপনার ক্ষুদ্র ইচ্ছা ও অভিমানকে ডুবাইয়া দিয়া এককালে যন্ত্রস্বরূপ হইয়াই যেন তিনি যত কিছু কায তখন করিতেছেন।···জগদম্বার বালক এখন তাঁহারই অপাঙ্গ ইঙ্গিতে যাহা করিবার করিতেছিল, ক্ষুব্ধ সংসারের বৃথা কোলাহল তাহার কর্ণে এখন কিছুমাত্র প্রবিষ্ট হইতেছিল না। সে এখন সংসারে থাকিয়াও সংসারে ছিল না। বহির্জগৎ এখন তাঁহার নিকট স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল; চেষ্টা করিয়াও উহাতে সে আর পূর্বের ন্যায় বাস্তবতা আনিতে পারিতেছিল না এবং শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়ী আনন্দঘনমূর্তিই এখন তাহার নিকটে একমাত্র সারপদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল।" [লীলাপ্রসঙ্গ : সাধকভাব]

মা এখন থেকে তাঁর সন্তানকে ইচ্ছাতরঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে চললেন। আপন ইচ্ছা বলতে কিছুই না থাকায় এই দিব্যশিশু জগৎ সংসারের লীলায় আপন ভূমিকাটুকুও যে মায়েরই ইচ্ছার প্রকাশ—একথা জেনে চির আত্মসমর্পণে নির্ভয় হয়ে রইলেন। ভাগ্নে হৃদয় এই সময় ভবতারিণীর পূজারী রামকৃষ্ণের অপূর্ব পূজা দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাঁর সাক্ষ্য-অনুযায়ী, কোনোদিন ঠাকুর হয়তো মায়ের মন্দিরে এসে ভাবে উন্মত্ত মাতালের অবস্থায় টলতে টলতে পূজোর আসন ছেড়ে মায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। সিংহাসনের উপরে

উঠে মায়ের চিবুক ধরে আদর করছেন, গল্প করছেন, ঠাট্টা-ইয়ার্কিও চলছে, আবার হয়তো মায়ের হাত ধরে নৃত্যই শুরু হলো। কোনোদিন বা মায়ের অন্নভোগ-নিবেদনের সময় ভোগের থালাটি নিয়ে একেবারে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, হাতে করে অন্ন তুলে নিয়ে মাকে বলছেন, 'খা মা খা! বেশ করে খা!' পরে হয়তো বললেন, 'আমি খাব? আচ্ছা খাচ্ছি!'—এই বলে নিজে কিছুটা খেয়ে বাকিটুকু মায়ের মুখে দিয়ে বলছেন, 'আমি ত খেয়েছি, এবার তুই খা!'

ভোরবেলা উঠে মায়ের জন্য ফুল তোলার সময় থেকে রাত্রে মায়ের শয়নকাল অবধি অবিশ্রাম মায়ের সঙ্গে কথা, হাসি, আদর-আব্দার, রঙ্গ-পরিহাস, সমানে চলতো। কোনো কোনো দিন রাতে মায়ের শয়নের সময় বলতেন, "আমাকে কাছে শুতে বলছিস—আচ্ছা শুচ্ছি।"

পরবর্তীকালে ভক্ত অনুরাগীদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর এসময়ের দর্শনের বিবরণে বলেছিলেন—"মাকে হাত দিয়ে দেখেছি, মা সত্যি সত্যি নিঃশ্বাস ফেলছেন। তন্ন তন্ন করে দেখেও রাত্রিবেলা দীপালোকে মন্দির দেউলে মার দিব্যাঙ্গের ছায়া কখনও পড়তে দেখিনি। নিজের ঘরে বসে শুনেছি, মা পাঁইজোর পরে ছোট মেয়েটির মতো আনন্দে ঝমঝম করতে করতে মন্দিরের উপরতলায় উঠছেন। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখি, সত্যি সত্যি মা মন্দিরের দোতলার বারান্দায় এলোচুলে দাঁড়িয়ে কখনো কলকাতা এবং কখনো গঙ্গা দর্শন করছেন।" [লীলাপ্রসঙ্গ : সাধকভাব]

সাধনার বিভিন্ন অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেবদেবীদের নানা মূর্তির দিব্যরূপ দেখেছেন—তার মধ্যে দাস্যভাবে সাধনকালে জনমদুখিনী সীতার মূর্তি সর্বাগ্রে। তাছাড়া শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ, রামলালা, তন্ত্রোক্ত ষোড়শী প্রভৃতি মূর্তি দর্শনের পরে এলো বেদান্তদর্শনের অদ্বৈতানুভূতির জগৎ। তোতাপুরী যখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকে উত্তম অধিকারী মনে হচ্ছে, তুমি বেদান্তসাধন করবে?' তার উত্তরেও শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "কি করব না করব আমি জানি না, মা জানেন। মায়ের আদেশ হলে করবো।" মায়ের রূপের জগৎ পার হয়ে অরূপের জগতে যাওয়ার অনুমতিও মা-ই দিলেন। তোতাপুরীর চল্লিশ বছরের সাধনালব্ধ ধন যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিনদিনে আয়ত্ত হলো, তখন তোতাপুরীর বিস্ময় একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আরো বিস্ময়ের বাকী ছিল। যে অদ্বৈত অনুভবের প্রভাবে

কোনো সাধারণ সাধকের পক্ষে একুশদিনের বেশী শরীর ধারণ অসম্ভব, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই নির্বিকল্প সমাধির স্তরে ছয়মাস একাদিক্রমে আরূঢ় রইলেন, আর সেই সময়েই উপলব্ধি করলেন যে, জগতের সব-সাধনপন্থারই শেষ কথা এই অদ্বৈতভাবে অধিষ্ঠান—এই অনুভূতির স্তর থেকেই তাঁর বাণী "যত মত তত পথ।"

অদ্বৈত উপলব্ধিতে বিশ্বচরাচরের সঙ্গে অভেদচেতনায় একদিন কালীবাড়ীর বাগানে সবুজ দূর্বাদলের উপর দিয়ে একজনকে হেঁটে যেতে দেখে যন্ত্রণায় তাঁর বুক লাল হয়ে গেল। মাঝিদের পারস্পরিক কলহে একজনের আর একজনকে চপেটাঘাতে তাঁরও দেহে সমান যন্ত্রণা আরক্তিম হয়ে ফুটে উঠলো। বৃদ্ধ ঘেসেড়া সামর্থ্যের অতিরিক্ত ঘাসের বোঝা বইতে পারছে না দেখে ভাবলেন, 'অন্তরে পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা বিদ্যমান, বাইরে এত নির্বুদ্ধিতা, এত অজ্ঞান। হে রাম! বিচিত্র তোমার লীলা।'

মাতৃভাবের সাধনাকালে তিনি পূজার সময় একদিন উপলব্ধি করেছিলেন, "সব চিন্ময়, কোষাকুষী, বেদী, ঘরের চৌকাঠ, সব চিন্ময়! মানুষ জীব জন্তু সব চিন্ময়! তখন উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দিকে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলাম। যা দেখি তাই পূজা করি!

একদিন পূজার সময় শিবের মাথায় বজ্র দিচ্ছি, এমন সময় দেখিয়ে দিলে এই বিরাট মূর্তিই শিব। তখন শিব গড়ে পূজা বন্ধ হলো। ফুল তুলছি, হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যে ফুলের গাছগুলি যেন এক একটি ফুলের তোড়া।···দেখিয়ে দিলে যেন এক একটি ফুলগাছ এক একটি তোড়া—সেই বিরাট মূর্তির উপর শোভা করছে, সেইদিন থেকে ফুল তোলা বন্ধ হয়ে গেল।" সাকার উপাসনায় এ জগৎকে চিন্ময় দেখার উপলব্ধি তাঁর আগেই ঘটেছিল, নিরাকার উপাসনায় বিশ্বময় ব্রহ্মচেতনার উদ্ভাসন প্রত্যক্ষ করে তাঁর শ্রীমুখ-কথিত জ্ঞানের ঊর্ধ্বে "বিজ্ঞানের" স্তরে তাঁর উত্তরণ ঘটলো। তাই দক্ষিণেশ্বরে একদিন তাঁর এই দিব্যদর্শনের আলোকে বলেছিলেন—"মানুষকেও আমি ঠিক তেমনি দেখি। তিনিই যেন মানুষ শরীরটাকে লয়ে হেলে দুলে বেড়াচ্ছেন—যেমন ঢেউয়ের উপর একটি বালিশ ভাসছে—বালিশটা এদিক ওদিক নড়তে চড়তে চলে যাচ্ছে, কিন্তু ঢেউ লেগে একবার উঁচু হচ্ছে আবার ঢেউয়ের সঙ্গে নীচে এসে পড়ছে।"

[কথামৃত . ৩য় : ২রা মার্চ : ১৮৮৪]

কতো বছর আগে আর এক ২রা মার্চ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রাদি ভক্তের কাছে তাঁর এই সর্বজীবে ব্রহ্মদৃষ্টির কথা ঘোষণা করেছিলেন। জীবের মধ্যে শিব, মানুষের রূপে নারায়ণ আর রূপে রূপে সেই অপরূপকে দেখতে পাওয়ার এই সাধনাই ভারতের চিরন্তন সাধনা, আর সে সাধনার ঘনীভূত মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান বিজ্ঞানচেতনার যুগে জীব-ব্রহ্ম-অভেদতত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। আধুনিক বিজ্ঞানের জড়শক্তির ঐক্যসন্ধান ও ভারতীয় ব্রহ্মবিজ্ঞানের চৈতন্যশক্তির অভেদজ্ঞান মূলতঃ একই সত্য হলেও এদের বহিঃপ্রকাশ বা অন্তর চেতনার বিকাশে কিন্তু পার্থক্য যথেষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত জগতের অন্তর্নিহিত সত্যের মূল প্রেরণা বস্তুগত লাভের প্রতি একান্ত অনাসক্তি। একদিকে এই অনাসক্তি ও আর একদিকে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম-উপলব্ধি—এই দুটি প্রান্তের সংযোগেই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাববিপ্লবের তাৎপর্য গ্রহণীয়। আধুনিককালে যাঁরা রাজনীতি অর্থনীতির বিপ্লবকে আধ্যাত্মিক বিপ্লবের সমার্থক করতে চান, তাঁদের মনে রাখা ভালো যে কোনো বস্তুগত লাভক্ষতির সঙ্গেই অধ্যাত্ম-সাধনার লক্ষ্য জড়িত নয়, বরং অধ্যাত্মচেতনার অধিষ্ঠানেই সমগ্র জীব ও জগৎ বিধৃত—এইটি উপলব্ধি করাই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবেদের প্রধান সূত্র। অর্থনৈতিক সাম্যবাদ যদি মানুষকে অধ্যাত্মদৃষ্টির অভেদজ্ঞানে উপনীত হতে কোন সহায়তা করে তবেই তার যথার্থ সার্থকতা। বিভেদ বিদ্বেষের ক্রমবর্ধমান হিংসানলে সে সার্থকতা কখনো সম্ভব হয় না; ঈশ্বরের নিরন্তর উপলব্ধিতে সব বিভেদের মাঝখানের ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণমানসসন্তান স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদা এ জগতের অসংগতির সমাধান-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়ে, উত্তরে বলেছিলেন, জগতের দিক থেকে দেখলে সামঞ্জস্য করা কঠিন, ঈশ্বরের দিক থেকে দেখলে সামঞ্জস্য করা যায়। বর্ণভেদ, জাতিভেদ, অর্থনৈতিক দলভেদ—এ সবই মানব-মানসের বিভিন্ন স্তরভেদের কথা—এইটি আমাদের মনে থাকে না বলেই সংঘাত। এই দ্বন্দ্ব কলহের পৃথিবীতে তাই তিনি সমন্বয়ের বাণীপ্রচারক।

দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি বলেছিলেন—'সব রাম দেখছি। তোমরা সব বসে আছ, দেখছি রামই সব এক-একটি হয়েছেন।… জীব জগৎ তিনি হয়েছেন।'

জীব জগৎ তিনি হয়েছেন বলেই কাউকে করুণা বা দয়া করার অধিকার তো আমাদের রইলো না। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'সেবা' বা বিবেকানন্দের

ভাষায় 'পূজা' করতে পারি, কখনোই 'সাহায্য' করছি এমন অহংকার করা চলে না। ভক্ত গিরিশচন্দ্র ও জ্ঞান-অসিধারী নরেন্দ্রনাথের বিতর্ক শুনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—'বিচার আর কি করবো। দেখছি—তিনিই সব।...তাও বটে, আবার তাও বটে।'

[কথামৃত : ১ম : ১১ই মার্চ, ১৮৮৫]

ব্রহ্ম যেমন একদিকে সত্য, আবার জীবজগৎ ও সত্য—কারণ এসবই তো ব্রহ্মেরই প্রকাশ। অখণ্ডের ঘরে এ উপলব্ধির পরে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ফিরে এলেন তাঁর মাতৃস্নেহের অঞ্চলতলে। জীবনের শেষ দিন অবধি সর্ব অবস্থায় মা-ই তাঁর ইষ্ট, আশ্রয়দাত্রী, স্নেহময়ী সান্নিধ্যদাত্রী।

নরেন্দ্রনাথ তর্ক করে বলতেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরীয় রূপদর্শনের কথায়—'ও মনের ভুল।' 'তখন অবাক হয়ে ওকে বললাম, কথা কয় যে রে?' নরেন্দ্র বললে, 'ও অমন হয়', তখন মার কাছে এসে কাঁদতে লাগলাম। বললাম, মা একি হলো। এ সব কি মিছে? নরেন্দ্র এমন কথা বললে!' তখন দেখিয়ে দিলে—চৈতন্য—অখণ্ড চৈতন্য—চৈতন্যময় রূপ। আর বললে, 'এসব কথা মেলে কেমন করে, যদি মিথ্যা হবে।'

[কথামৃত : ৩য় : ৯ই মে ১৮৮৫]

মায়ের কাছে আশ্বাস পেয়ে সন্তান রামকৃষ্ণ এসে নরেন্দ্রনাথকে বললেন, 'শালা, তুই আমায় অবিশ্বাস করে দিছলি! তুই আর আসিস নাই!'

কী অসীম নির্ভরতা, পরম সত্যের সঙ্গে কী অন্তরতম আত্মীয়তার কাহিনী শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের ছত্রে ছত্রে অভিব্যক্ত। আপন স্বভাবের পরিচয় তাঁর ভাষায়, "আমার বালক স্বভাব। হৃদে বললে, মামা, মাকে কিছু শক্তির কথা বলো, অমনি মাকে বলতে চললাম। এমনি অবস্থায় রেখেছে যে, যে ব্যক্তি কাছে থাকবে, তার কথা শুনতে হয়!"

[কথামৃত : ৩য় : ১২ই এপ্রিল : ১৮৮৫]

আবার এই বালকই মায়ের কাছে সন্তানদের কল্যাণের আর্জি পেশ করছেন —'মা! তাকে টেনে নিও, আমি আর ভাবতে পারি না!'—সত্ত্বগুণী এক ভক্ত সম্বন্ধে প্রার্থনা। আবার গিরিশচন্দ্রের মতো জীবনের পঙ্কিল স্তরে বিচরণ করেও যাঁরা ঈশ্বরের শরণাগত তাদের জন্য মায়ের কাছে আকুতি—"মা! যে ভালো আছে তাকে ভালো করতে যাওয়া কি বাহাদুরী? মা মরাকে

মেরে কি হবে? যে খাড়া হয়ে রয়েছে তাকে মারলে তবে ত তোমার মহিমা?" এই কথা বলে ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে হঠাৎ একটু জোরে যেন দূর থেকে মায়ের ডাকে সাড়া দিলেন—"আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে এসেছি। যাচ্ছি গো মা।" 'কথামৃতে'র ভাষায়—'যেন একটি ছোট ছেলে দূর হইতে মার ডাক শুনিয়া উত্তর দিতেছে! ঠাকুর আবার নিঃস্পন্দ দেহ, সমাধিস্থ বসিয়া আছেন। ভক্তেরা অনিমেষ লোচনে নিঃশব্দে দেখিতেছেন।'
[কথামৃত : ৩য় · ৬ই এপ্রিল : ১৮৮৫]

তাঁর পরম স্নেহের নরেন্দ্র যে নরনারায়ণ, এখন কিছু মানতে না চাইলেও কালে যে সে সব মানবে, সংসারের বহ্নিতাপে অভিমানী নরেন মুখে যাই বলুক, সে যে কখনো ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হবে না, মায়ের কাজের জন্যই যে তার আসা—এ সবই তাঁকে মা দেখিয়েছিলেন। আবার এই নরেন্দ্রনাথ যখন তাঁর শেষ অসুখের সময় বিশেষভাবে অনুরোধ করে বলেছিলেন—'আপনাকে অসুখ সারাতেই হবে, আমাদের জন্য সারাতে হবে।' উত্তরে তিনি বলেছিলেন—'আমার কি ইচ্ছা রে, যে আমি রোগে ভুগি, আমি তো মনে করি সারুক, কিন্তু সারে কৈ? সারা, না সারা, মার হাত।' নরেন্দ্রনাথ—'তবে মাকে বলুন, সারিয়ে দিতে, তিনি আপনার কথা শুনবেনই শুনবেন।' শ্রীরামকৃষ্ণ—'তোরা তো বলছিস, কিন্তু ও কথা যে মুখ দিয়ে বেরোয় না রে!'

নরেন্দ্রনাথ—'তা হবে না মশাই, আপনাকে বলতেই হবে। আমাদের জন্য বলতে হবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—'আচ্ছা দেখি, পারি তো বলবো।' কয়েক ঘণ্টা পরে নরেন্দ্রনাথ যখন আবার এসে প্রশ্ন করলেন, 'মশায়, বলেছিলেন? মা কি বললেন?'

শ্রীরামকৃষ্ণ—'মাকে বললুম (গলা দেখিয়ে) এইটের দরুন কিছু খেতে পারছি না। যাতে দুটো খেতে পারি করে দে।' তা মা বল্লেন—তোদের সকলকে দেখিয়ে—'কেন? এই যে এত মুখে খাচ্ছিস।' আমি আর লজ্জায় কথাটি বলতে পারলুম না।'

ইচ্ছাময়ীর অনন্ত ইচ্ছার সঙ্গে এমন এক হয়ে যাওয়াই মাতৃভাবসাধনার শেষ কথা এবং অদ্বৈততত্ত্বেরও চরম অভিব্যক্তি।*

---

* ২রা মার্চ, ১৯৭১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যজন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে প্রদত্ত ভাষণ।

জীবনশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ

"ঠাকুর নিজে একজন কত বড় artist ছিলেন!"[১]—স্বামী বিবেকানন্দ

"বাউলের দল হঠাৎ এলো—নাচ্‌লে, গান গাইলে, আবার হঠাৎ চলে গেল। এলো গেল, কেউ চিনলো না।"[২]—শ্রীরামকৃষ্ণ

আত্মপরিচয় ও অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীপরিচয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এই বাউলের উপমাটি দিয়েছিলেন। বাউল দলের আত্ম-তন্ময় গান যাঁরা শুনেছেন, গাইতে গাইতে কখনো তাদের সর্বদেহে ভাবের জোয়ার নৃত্যের ঘূর্ণিতে পরিণত, কখনো তাদের পা দুটি মাটি ছুঁয়ে আছে, কখনো শূন্যে উঠে যাচ্ছে, আবার দ্রুত পদক্ষেপে সামনে পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে-ফিরে একতারাতে খঞ্জনীতে ডুগির শব্দে এক ভাবতন্ময় আবহ সৃষ্টি করে চলেছে—এ যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরাই জানেন বাইরের জগৎকে নিঃশেষে ভুলে গিয়ে অন্তরের গহনে জ্বলা শিখার আভাস কেমন করে বাউলের চোখে-মুখে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। তিনি বলেছেন, আবার বাউলবেশে আসবেন।

তাই তো স্বাভাবিক। বাউলের মতো জাতশিল্পী দুনিয়ায় বিরল। সহজ না হলে তো সহজকে চেনা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণজীবননাট্যে যে বাউলের দল দুনিয়ার আসরে নেচে গেয়ে চলে গেছেন, তাঁদের ক'জন চিনতে পেরেছিল, আর আজও বা কজনে তাঁদের মর্ম জানে? তাঁরই উপমায় সেই চোর চোর খেলার গল্প, বুড়ি ছুঁয়ে দিলে তো আর খেলা থাকে না। চেনা অচেনার সেই খেলাতেই নিত্যের লীলারূপ।

আবার তিনিই তো বলেছেন—'যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তার এখানে আসতেই হবে। আসতেই হবে! [কথামৃত : ৪র্থ : ৯ই আগস্ট, ১৮৮৫] কারণ তাঁরই ভাষায়—'তিনি খুব কানখড়কে, সব শুনতে পান গো। যত ডেকেছ, সব শুনেছেন। একদিন না একদিন দেখা দেবেনই দেবেন।' [লীলা-প্রসঙ্গ : গুরুভাব : পূর্বার্ধ] জগতের সব শিল্প, সঙ্গীত, কবিতা, নৃত্য—কলাবিদ্যার

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : নবম খণ্ড · পৃঃ ৪০৬

২ কথামৃত . ১৫ই মার্চ, ১৮৮৬ তারিখের দিনলিপি।

সমস্ত রূপে রেখায় সে আনন্দঘন রসো বৈ সঃ—যিনি রসস্বরূপ তাঁর উদ্দেশে যাত্রা। তাই তো বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্যের মতো ব্যক্তিকে ঘিরে এত গান, এত উন্মাদনা, এত শিল্প, ভাস্কর্য, সাহিত্য সৌন্দর্যের যুগে যুগে অভিব্যক্ত রসরূপ। একটি জীবনের নিহিত শিল্পচেতনার আলোকে নিখিল বিশ্বের আত্মদর্শন।

ছবি ও গান, কথা ও কাহিনী, রেখা ও মূর্তি—ভাবরাজ্যের রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ সব কলাবিদ্যাতেই পারঙ্গম। কিন্তু সবার সেরা শিল্প যে ভাবজগতের কথা, সে জগতেও মুহুর্মুহু তাঁর রূপ ও অরূপের লীলা। তিনি একাধারে শিল্প ও শিল্পী। যেখানে শিল্প সেখানে জগজ্জননী তাঁর এই সন্তানকে কতো না ভাবে, সমাধিতে, নৃত্যে গীতে, সমাধির তুরীয় লোক থেকে অনুভূতি সঞ্চারের আনন্দ-লীলা অবধি বিশ্বজনের নয়নগোচর করেছেন; আর যেখানে শিল্পী, সেখানে আপন দিব্যজীবনবীণাটি পরমরাগিণীতে বাজাবার সাধনায় অনুক্ষণ তন্ময়, সে বীণাধ্বনি আবার নিখিল অনুরাগীবৃন্দের প্রাণে প্রাণে ধ্বনিত হয়ে বিশ্বচরাচরে এক মহাসংগীত ধ্বনিত করে চলেছে।

'চারিত্রপূজা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে লিখেছেন—"ভাষা, প্রস্তর, অথবা চিত্রপটের দ্বারা সত্য এবং সৌন্দর্য প্রকাশ ক্ষমতার কার্য সন্দেহ নাই; তাহাতে বিচিত্র বাধা অতিক্রম এবং অসামান্য নৈপুণ্য প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু নিজের সমগ্র জীবনদ্বারা সেই সত্য ও সৌন্দর্যপ্রকাশ করা তদপেক্ষা আরও বেশী দুরূহ, এবং তাহাতে পদে পদে কঠিনতর বাধা অতিক্রম করিতে হয়, এবং তাহাতে স্বাভাবিক সূক্ষ্মবোধশক্তি ও নৈপুণ্য, সংযম ও বল অধিকতর আবশ্যক হয়।"

সব শিল্পের উপরে তাই জীবনশিল্প। শিল্প জীবনকে পূর্ণতা দেয় এবং জীবনও শিল্পকে প্রবুদ্ধ করে। তবু এক একজন যুগ-মানবের হৃদয়কেন্দ্রে নিত্য-কালের প্রেরণাশক্তি থাকে, কালের সীমা পার হয়েও যার স্পন্দন অনাহত। বিশেষ যুগের প্রয়োজন তাঁদের আবির্ভাবের পটভূমিমাত্র। আসলে তাঁদের আবির্ভাব মানুষের সত্যানুসন্ধানের চিরন্তনতায়।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপন স্বরূপপ্রসঙ্গে বলেছেন—'এবার গুপ্তভাবে আসা। যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজরাজ্য পরিদর্শন। যেমনি জানাজানি কানাকানি হয়, অমনি সে সেখান থেকে সরে পড়ে—সেই রকম।" [লীলাপ্রসঙ্গ] তাই তো বাইরের রূপ তিনি সংবরণ করেছেন, ধন-জন লোকমান্য সম্পূর্ণ

পরিহার। বাইরের কোন অস্ত্র নয়, সজ্জা নয়, কিন্তু সত্য, ত্যাগ, পবিত্রতা ও ঈশ্বরোপলব্ধির আনন্দঘন প্রকাশে যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত অন্ধকারে নিমেষে আলোকস্বরূপ।

এ আলোর জন্যও দেহ মন অবলম্বনে তিলে তিলে সাধনার প্রয়োজন হয়েছে। সে সাধনা বিশ্বজনের কল্যাণে তো বটেই, সেই সঙ্গে মানবজীবনে ঈশ্বরচেতনার স্তরপরম্পরাটি বুঝিয়ে দেবার জন্যও বটে। সাধারণতঃ শিল্পীরা আপন সৃষ্টিরহস্য সকলের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চান। কিন্তু জীবনশিল্পীর কাজ যে জীবনের প্রতিটি কথায় কর্মে আচরণে ধ্যানে সৌন্দর্যের অন্তর্নিহিত অনন্তের অনুভব সঞ্চার করা। তাই লোকচক্ষু তাঁকে যতটা দেখতে পায়, তার আড়ালেও তার জীবনটি সেই মহত্তম আদর্শের প্রকাশ হয়ে থাকে। তাঁদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি আর ক্ষুদ্রতম ক্রিয়া—কোনটিই তাৎপর্যহীন বা অসুন্দর হতে পারে না। কিন্তু সে তাৎপর্য বা সৌন্দর্য অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন তেমনি শিল্প-চেতনাঋদ্ধ একটি মন। কোনো সন্দেহ নেই যে, রাধাই রাধার কল্পনা করতে পারেন, একজন যীশুখ্রীষ্টই আর একজন যীশুখ্রীষ্টকে উপলব্ধি কবার যোগ্যতা রাখেন, বিবেকানন্দও জীবনের শেষ দিনটিতে ভেবেছিলেন, 'যদি আর একজন বিবেকানন্দ থাকতো'। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তো বলেছিলেন তাঁকে—'তুই আর আমি কি আলাদা?' তিনি তো চিনেছিলেন, কিন্তু তাঁর মতো আর কে চিনতে পারে? জীবনশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি বিবেকানন্দ স্বয়ং।

সে মহাশিল্পের প্রকরণব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন—"মনের বাইরের জড়শক্তিগুলিকে কোন উপায়ে আয়ত্ত করে কোন একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখানো বড় বেশী কথা নয়—কিন্তু এই যে পাগলা বামুন লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মতো হাতে নিয়ে ভাঙত, পিটত, গড়ত, স্পর্শমাত্রেই নূতন ছাঁচে ফেলে নূতনভাবে পূর্ণ করত, এর চেয়ে বড় আশ্চর্য ব্যাপার (miracle) আমি আর কিছুই দেখি না।" [লীলাপ্রসঙ্গ: দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ]। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে এর চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার আর কিছু ঘটেনি। স্বামীজীর কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনকাহিনীর ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। নিপুণ শিল্পী যেমন বহুদিনের অভ্যাসে ও প্রযত্নে আপন শিল্পবিদ্যাটি আয়ত্ত করে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনজীবনে তেমনি যখন যে পন্থায় সাধনা করেছেন সেই পন্থার সব উপাদান, উপকরণ ও ভাব-সম্ভার, তিনি সশ্রদ্ধভাবে আপন জীবনে

প্রয়োগ করে তবে সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁর বাণীতে যেমন ভাবের সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তির অমোঘ নির্দেশ কার্যকর, তাঁর জীবনেও তেমনি উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে অক্লান্ত সাধননিষ্ঠা।

অতীত স্মৃতিচারণে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'ও দেশে ছেলেবেলায় আমায় পুরুষ মেয়ে সকলে ভালবাসত। আমার গান শুনতো।......

'পাঠশালে শুভঙ্করী আঁক ধাঁধা লাগত। কিন্তু চিত্র বেশ আঁকতে পারতুম। আর ছোট ছোট ঠাকুর বেশ গড়তে পারতুম।

'সদাব্রত অতিথিশালা, যেখানে দেখতুম সেখানে যেতুম; গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতুম। কোনখানে রামায়ণ কি ভাগবত পাঠ হচ্ছে, তা বসে বসে শুনতুম। তবে যদি ঢং করে পড়ত, তাহলে তার নকল কর্‌তুম, আর অন্য লোকেদের শুনাতুম।

'আমি এ সব গান ছেলেবেলায় খুব গাইতাম, (ভক্তিমূলক গান—দাশরথি, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতিব।)' দাশরথির গান শুনে বলছেন, 'আমি এ সব গান ছেলেবেলায় খুব গাইতাম। এক এক যাত্রায় সমস্ত পালা গেয়ে দিতে পারতাম। কেউ কেউ বলত আমি কালীয়দমন যাত্রার দলে ছিলাম।' (কথামৃত : ৫ম : ১৮৮৩, ১০ই জুন)

চিত্র ও মূর্তিশিল্পে তিনি যে বিশেষভাবে কারু শিষ্যত্ব করেছেন তা নয়। অথচ জন্মলব্ধ সংস্কারের ফলে ছোটবেলা থেকেই দেবদেবীর ছবি আঁকতে ও মূর্তি গড়তে দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। স্বামী সারদানন্দজী লীলাপ্রসঙ্গের সাধকভাব অধ্যায়ে এমন দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ভাষান্তরে ঘটনা দুটি এরকম— বালক গদাধর একদিন তার ছোট্ট বন্ধুদের সঙ্গে কুমোরের মূর্তি গড়া দেখতে এসেছে। দেখতে দেখতে সে হঠাৎ বলে উঠলো—"একি হয়েছে? দেবতার চোখ কি এমন হয়? এইভাবে আঁকতে হয়"—দেবতার চোখে যে "অমানব শক্তি, করুণা, অন্তর্মুখীনতা ও আনন্দের" একত্র সমাবেশ হয়ে মূর্তিগুলিকে জীবন্ত দেবভাবসম্পন্ন করে তুলবে, সে কথা এমনভাবে বালক গদাধরের ব্যাখ্যায় ফুটে উঠলো তা শুনে আর সবাই তো অবাক।

আর একদিন সঙ্গী খেলুড়েদের নিয়ে পুজোর খেলায় তিনি আরাধ্য দেবতার ছবি এত সুন্দর এঁকেছিলেন যে, লোকে ভেবেছিল সে ছবি কোনো বিশিষ্ট পটুয়ার আঁকা।

ভারতশিল্পের মূলপ্রেরণা ভক্তি। তাই মনুষ্যদেহের অবয়ব সংস্থানের সৌন্দর্যের চেয়ে ভাবসৌন্দর্যই ভারতীয় শিল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। যদিচ প্রতি অঙ্গের সৌন্দর্য সম্বন্ধে ভারতীয় শিল্পদৃষ্টিও কম সজাগ নয়। সেদিক থেকে পূজার সার্থকতা সম্পাদনে উপাসকের ভক্তির সঙ্গে প্রতিমার সৌন্দর্যও যে বিশেষ প্রয়োজন সেকথাও উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন। এই মূর্তিশিল্পের পটুতার জন্যই পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বরের বিষ্ণুমন্দিরে কৃষ্ণমূর্তিটির ভাঙা পা তিনি নিজেই সুকৌশলে জোড়া দিতে পেরেছিলেন। এমন জোড়াদেওয়া মূর্তিটি পূজো করার বৈধতা নিয়ে যাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁদের যে সকৌতুক জবাবে তিনি নিরস্ত করেছিলেন তা আমরা জানি। কিন্তু এর পিছনে একটি শিল্পীর অনুরাগও ক্রিয়াশীল ছিল সন্দেহ নেই—যে শিল্পী ভাবের দৃষ্টিকেই বড় করে দেখে, বস্তুর দৃষ্টিকে নয়। জমিদার জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাই তিনি বলেছিলেন, "অখণ্ড মণ্ডলাকার যিনি, তিনি কি কখনও ভাঙা হন?" দক্ষিণেশ্বরে তাঁর নিজের পূজার জন্য তৈরী শিবমূর্তির সৌন্দর্যই মথুরামোহনের মারফৎ রাণীরাসমণির সঙ্গে তাঁর দিব্য সম্বন্ধ স্থাপনের কারণ।

স্বভাবশিল্পী গদাধর ছোটবেলায় যাত্রার আসরে শিবের বেশে দাঁড়িয়ে যে ভাবস্থ হয়েছিলেন সেকথা আমরা জানি। ঠিক এমনি ভাবাবেশের কথা আছে 'চৈতন্য ভাগবতে' নিত্যানন্দের বাল্যলীলা বর্ণনায়। লক্ষ্মণের শক্তিশেলবিষয়ক অভিনয়ে শিশু নিতাই সত্যি সত্যি শেলাহতের মতো মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। সে অভিনয়ের দর্শকেরা এমন আশ্চর্য অভিনয় দেখে পরস্পর বলাবলি করেছিলেন, প্রাচীন বাংলার সেই অজ্ঞাতনামা অভিনেতার কথা, যিনি দশরথের ভূমিকা অভিনয়কালে—

'রাম বনবাসী শুনি এড়ে কলেবর'।

চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে মহাপ্রভুর লক্ষ্মীদেবীর ভূমিকাভিনয়ও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মহাপ্রভুর জীবনে মাতৃভাবের দিব্য আবেশ ওই একবারই দেখা যায়। আর আমাদের শিশু গদাই বড় হয়ে গিরিশচন্দ্রের নাট্যাভিনয় 'চৈতন্যলীলা' (এ নাটকও মূলে 'চৈতন্যভাগবতে'র নাট্যরূপ) দেখতে গিয়ে বলেছিলেন—'আসল নকল এক দেখলুম'। অথচ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা অভিনেত্রীদের জীবনযাপন-পদ্ধতি তাঁর অজানা ছিল না। ভাবগ্রাহী তিনি বাংলার রঙ্গমঞ্চকে যে সম্মান ও আভিজাত্য দিয়ে গেলেন, বাংলার নাট্য-

আন্দোলনে আজও তা স্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলার রঙ্গমঞ্চের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা যদি কেউ থাকেন, তিনি গিরিশগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ।

ছোটবেলায় শ্রীরামকৃষ্ণ যে সব রাম বা কৃষ্ণযাত্রা শুনতেন, সেই সব পালা আবার পাড়ার মেয়েদের গেয়ে শোনাতেন। ভক্তিমূলক শাক্ত বা বৈষ্ণব গানের তো কথাই নেই। পাড়ার বর্ষীয়সীরা কেউ কেউ পরে আর কোনো পালা-গানের আসরে যেতে চাইতেন না, বলতেন, 'গদাই কান খারাপ করে দিয়ে গেছে।' ছবি বা মূর্তির ব্যাপারে যেমন, গানের ব্যাপারেও তেমনি, বাঁধাধরা কোনো সঙ্গীত শিক্ষার পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেন নি। অথচ উত্তরকালে তাঁর সব কথাই গানে গানে ভরপুর। কথায় কথায় এমন গানের মালাগাঁথার উদাহরণ বোধকরি বাংলার ইতিহাসে আর এক চৈতন্যদেবের জীবনে মেলে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যজীবনে কেবল কৃষ্ণভক্তির আস্বাদন, আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আস্বাদনে বৈষ্ণব, শাক্ত, বাউল, ব্রাহ্ম—সব ধরনের সংগীতের সমাদর। তাঁর গান সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দজীর 'লীলাপ্রসঙ্গে' মন্তব্য—"…ঠাকুরের সেই প্রাণের উচ্ছ্বাসে মধুর কণ্ঠে গান! সে গান যে একবার শুনিত সে কখনও ভুলিতে পারিত না। তাহাতে ওস্তাদি-কালোয়াতি ঢং ঢাং কিছুই ছিল না; ছিল কেবল গীতোক্ত বিষয়ের ভাবটি আপনাতে সম্পূর্ণ আরোপ করিয়া মর্মস্পর্শী মধুর স্বরে যথাযথ প্রকাশ এবং তাল লয়ের বিশুদ্ধতা। ভাবই যে সঙ্গীতের প্রাণ, একথা যে তাঁহার গান শুনিয়াছে সেই বুঝিয়াছে। আবার তাল লয় বিশুদ্ধ না হইলে ঐ ভাব যে আত্মপ্রকাশে বাধা পাইয়া থাকে একথা ঠাকুরের মুখনিঃসৃত সঙ্গীত শুনিয়া এবং অপরের সঙ্গীতের সহিত উহার তুলনা করিয়া বেশ বুঝা যাইত।…ঠাকুরের গীত অত মধুর লাগিবার আর একটি কারণ ছিল। গান গাহিবার সময় তিনি গীতোক্তভাবে নিজে এত মুগ্ধ হইতেন যে, অপর কাহারও প্রীতির জন্য গান গাহিতেছেন একথা একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। গীতোক্তভাবে মুগ্ধ হইয়া ঐরূপে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইতে আমরা জীবনে অপর কাহাকেও দেখি নাই। ভাবুক গায়কেরাও শ্রোতার নিকট হইতে প্রশংসার প্রত্যাশা কিছু না কিছু রাখিয়া থাকেন। ঠাকুরকে কেবল দেখিয়াছি, তাঁহার গীত শুনিয়া কেহ প্রশংসা করিলে তিনি যথার্থই ভাবিতেন এই ব্যক্তি গীতোক্ত ভাবের প্রশংসা করিতেছে এবং ইহার বিন্দুমাত্র তাঁহার প্রাপ্য নহে।"

[লীলাপ্রসঙ্গ : সাধকভাব]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবময় জীবনে সঙ্গীত ছিল নিত্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ। তিনি নিজে যেমন গানে বিভোর হয়ে থাকতেন, তেমনি অন্যের গান শুনতে তাঁর আগ্রহ ছিল। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গযোগের অন্যতম কারণই এই গান। দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথের প্রথম দিনের গান,

'মন চল নিজ নিকেতনে'

অবশেষে একদা 'যো কুছ হ্যায় সো তুঁহু হ্যায়' গানে এসে মিলেছিল। কিন্তু এ দুই গুরুশিষ্যের ঠারে ঠোরে কথাবার্তার অনেকখানিই তো গানে—

কথা কহিতে ডরাই,
কথা না কহিতেও ডরাই,
(আমার) মনে সন্দ হয়
পাছে তোমায় হারাই—হা রাই!

অনেকদিন পরে আমেরিকায় বসে শ্রীরামকৃষ্ণ-তন্ময় বিবেকানন্দ লিখেছিলেন—

গাই গীত শুনাতে তোমায়
ভালো মন্দ নাহি গণি
নাহি গণি লোকনিন্দা যশকথা।
... ...
প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।
বাণী তুমি বীণাপাণি কণ্ঠে মোর,...

বিবেকানন্দের কবিচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ 'আদিকবি', সঙ্গীতসাধনায় কণ্ঠে বীণাপাণি।

কামারপুকুরে কথকঠাকুরদের পুরাণব্যাখ্যা, কবিওয়ালাদের কবির লড়াই, যাত্রাওয়ালাদের গান ও অভিনয়, বাউলদলের বাউল গান. এসব কিছুর মধ্য দিয়ে বালক গদাইয়ের মনে যে সঙ্গীতময় পরিবেশ গড়ে উঠেছিল উত্তরকালে তাঁর ভাব-সাধনায় সে সঙ্গীতের প্রভাব আরো গভীরতর হয়েছিল। 'কথামৃতে' ও 'লীলাপ্রসঙ্গে' বিধৃত তাঁর অজস্র গান গাওয়া ও গান শোনার মধ্য থেকে একটি দিনের উদাহরণ দিই।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় সেকালের অন্যতম সেরা যাত্রাওয়ালা। ভক্তিরসের গানে তিনি সিদ্ধ। সেদিন সকালে দক্ষিণেশ্বরে নবীন নিয়োগীর বাড়িতে

নীলকণ্ঠের যাত্রা হয়েছিল। বাবুরাম ও মাষ্টারমশাই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন শ্রোতাদের অন্যতম। বিকেলবেলা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনলাভের জন্য নীলকণ্ঠ এসেছেন দলবল নিয়ে। কথায় কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—'তোমায় সংসারে রেখেছেন পাঁচজনের জন্য।...অষ্টপাশ সব যায় না। দু একটি পাশ তিনি রেখে দেন—লোকশিক্ষায় জন্য। তুমি যাত্রাটি করেছো, তোমার ভক্তি দেখে কত লোকের উপকার হচ্ছে।'

আবার তাঁর অনুপম রসিকতার ভঙ্গীতে বললেন, "তুমি সকালে অত গাইলে, —আবাব এখানে এসেছ কষ্ট করে, এখানে কিন্তু অনারারি (honorary)।...

নীলকণ্ঠ। "অমূল্য রতন নিয়ে যাবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। "সে অমূল্যরতন আপনার কাছে, আবার ক'য়ে আকার দিলে কি হবে? না হলে তোমার গান অত ভালো লাগে কেন? রামপ্রসাদ সিদ্ধ, তাই তাঁর গান ভাল লাগে।" নীলকণ্ঠকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, "একটু মায়ের নাম শুনবো।" নীলকণ্ঠ সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে একে একে গাইলেন—'শ্যামাপদে আশ নদীতীবে বাস', 'মহিষমর্দিনী'—দ্বিতীয় গানটি শুনতে শুনতে উঠে দাঁড়িয়ে ঠাকুর সমাধিস্থ। নীলকণ্ঠ গানে বলছেন, 'যাঁর জটায় গঙ্গা, তিনি রাজরাজেশ্বরীকে হৃদয়ে ধারণ করে আছেন।' "ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। গান—'শিব শিব'; এই গানের সঙ্গেও ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নৃত্য করতে লাগলেন, গান শেষ হলো; ঠাকুর নীলকণ্ঠকে বলছেন, 'আমি আপনার সেই গানটি শুনবো, কলকাতায় যা শুনেছিলাম।'

মাষ্টার—শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর, নব নটবর, তপত কাঞ্চনকায়।......

নীলকণ্ঠ গাইলেন—

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নব-নটবর তপত-কাঞ্চনকায়,
করে স্বরূপ বিভিন্ন, লুকাইয়ে চিহ্ন অবতীর্ণ নদীয়ায়।
কলিঘোর অন্ধকার বিনাশিতে, উন্নত-উজ্জ্বল রস প্রকাশিতে,
তিন বাঞ্ছা তিন বস্তু আস্বাদিতে, এসেছ তিনেরি দায়;—
সে তিন পরশে, বিরস-হরষে, দরশে জগৎ মাতায়।
নীলাব্জ হেমাব্জে করিয়ে আবৃত, হ্লাদিনীর পূরাও দেহভেদগত;
অধিরূঢ়মহাভাবে বিভাবিত, সাত্ত্বিকাদি মিলে যায়;
সে ভাব আস্বাদনের জন্যে, কান্দেন অরণ্যে, প্রেমের বন্যে ভেসে যায়॥

৮

নবীন সন্ন্যাসী, সুতীর্থ অন্বেষী, কভু নীলাচলে, কভু যান কাশী,
অযাচকে প্রেম দেন রাশি রাশি, নাহি জাতিভেদ তায় ;
দ্বিজ নীলকণ্ঠ ভনে, এই বাঞ্ছা মনে, কবে বিকাব গৌরের পায় ॥

"প্রেমের বন্যে ভেসে যায়'—এই ধুয়া ধরিয়া ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে আবার নাচিতেছেন। সে অপূর্ব নৃত্য যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা কখনোই ভুলিবেন না। ঘর লোকে পরিপূর্ণ, সকলেই উন্মত্ত প্রায়। ঘরটি যেন শ্রীবাসের আঙিনা হইয়াছে!……ঠাকুর আবার গান ধরিলেন—'যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা দুভাই এসেছে রে।' সংকীর্তন করিতে করিতে ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে নৃত্য করিতেছেন ও আখর দিতেছেন, 'রাধার প্রেমে মাতোয়ারা, তারা তারা দুভাই এসেছে রে।' উচ্চ সংকীর্তন শুনিয়া চতুর্দিকের লোক আসিয়া জমিয়াছে। দক্ষিণের, উত্তরের ও পশ্চিমের গোল বারান্দায় সব লোক দাঁড়াইয়া। যাহারা নৌকা করিয়া যাইতেছেন, তাঁহারাও এই মধুর সংকীর্তনের শব্দ শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়াছেন।" সেদিন যাবার আগে নীলকণ্ঠ বলে গেলেন, 'আমরা যে গান গেয়ে বেড়াই, তার পুরস্কার আজ হলো।"

[কথামৃত : ৪র্থ : ৫ই অক্টোবর, ১৮৮৪]

স্বয়ং শিল্পীই অন্য শিল্পীর সম্মান দিতে জানেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-নীলকণ্ঠের সংগীত-সুধাময় দৃশ্যটি তার অন্যতম প্রমাণ। যে যেখানে ভালো গাইতে বা বাজাতে পারতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গান বা বাজনা শুনতে চাইতেন। শ্যামবাজার গ্রামের একজন খুব ভালো খোল বাজাতে পারতেন, কাশীর মহেশ বীণকার নিপুণ বীণাবাদক ছিলেন—এদের বাজনা শুনেও তিনি সমাধিস্থ হতেন, ভক্তিভাবের সংগীত মাত্রই তাঁকে মুগ্ধ করতো—রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাশরথি, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, নীলকণ্ঠ, ত্রৈলোক্য সান্যাল, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—এঁদের গানে তিনি ভাবস্থ বা সমাধিস্থ হয়েছেন, এমন কত চিত্রই 'কথামৃতে' রয়েছে। নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'—গানটি শুনে তন্ময় শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রটি বাংলা গানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

আর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবময় নৃত্য। সাহিত্য বা শিল্পে যা একদা প্রাণের স্ফূর্তিতে অভিব্যক্ত, কালক্রমে তাই চিরায়ত বা Classic হয়ে ওঠে। তাই ভারতের মন্দিরে মন্দিরে এতো নৃত্যময় ভঙ্গিমার মূর্তি, ভারতের দেবাদিদেব স্বয়ং নটরাজ। মানবজাতির প্রাচীনতম শিল্প এই নৃত্য ভারতশিল্পে উমা

মহেশ্বরের মধ্যে আপন কেন্দ্র খুঁজে পেয়েছে। ভগবৎসাধনায় সঙ্গীতের মতো নৃত্যও ভগবৎ আনন্দেরই বহিঃপ্রকাশ। এই বাংলার মাটি একদিন শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর যুগ্মনৃত্যে পবিত্র হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় যখন 'নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব', তখনও দেখি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবনৃত্যমুগ্ধ ভক্তবৃন্দ কখনো নিজেরাই সে নৃত্যে যোগ দিয়েছেন, কখনো বা সে নৃত্যের দর্শনানন্দে বিভোর।

স্বামী সারদানন্দজীর বর্ণনায় তাঁর একটি দিনের নৃত্যের শাশ্বত রূপায়ণ—(সেদিন সিঁদুরিয়াপটিতে মণি মল্লিকের বাড়ীতে ব্রাহ্ম উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যোগ দিয়েছিলেন)—"অপূর্ব দৃশ্য! গৃহের ভিতর স্বর্গীয় আনন্দের বিশাল তরঙ্গ খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে; সকলে এককালে আত্মহারা হইয়া কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, উদ্দাম নৃত্য করিতেছে, ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, বিহ্বল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিতেছে; আর ঠাকুর সেই উন্মত্ত দলের মধ্যভাগে নৃত্য করিতে করিতে কখনো দ্রুত পদে তালে তালে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন, আবার কখনো বা ঐরূপে পশ্চাতে হটিয়া আসিতেছেন; এবং ঐরূপে যখন যেদিকে অগ্রসর হইতেছেন, সেই দিকের লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া তাঁহার অনায়াস গমনাগমনের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতেছে। তাঁহাব হাস্যপূর্ণ আননে অদৃষ্টপূর্ব দিব্যজ্যোতি ক্রীড়া করিতেছে এবং প্রতি অঙ্গে অপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্যের সহিত সিংহের ন্যায় বলের যুগপৎ আবির্ভাব হইয়াছে। সে এক অপূর্ব নৃত্য—তাহাতে আড়ম্বর নাই, লম্ফন নাই, কৃচ্ছ্রসাধ্য অস্বাভাবিক অঙ্গবিকৃতি বা অঙ্গসংযমরাহিত্য নাই, আছে কেবল আনন্দের অধীরতায় মাধুর্য ও উদ্যমের সম্মিলনে প্রতি অঙ্গের স্বাভাবিক সংস্থিতি ও গতিবিধি। নির্মল সলিলরাশি প্রাপ্ত হইয়া মৎস্য যেমন কখন ধীরভাবে এবং কখন দ্রুত সন্তরণ দ্বারা চতুর্দিকে ধাবিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, ঠাকুরের এই অপূর্ব নৃত্যও যেন ঠিক তদ্রূপ। তিনি যেন আনন্দসাগর—ব্রহ্মস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া নিজ অন্তরের ভাব বাহিরের অঙ্গসংস্থানে প্রকাশ করিতেছিলেন। ঐরূপে নৃত্য করিতে করিতে তিনি কখন বা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেছিলেন; কখন বা তাঁহার পরিধেয় বসন স্খলিত হইয়া যাইতেছিল এবং অপরে উহা তাঁহার কটিদেশে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিতেছিল; আবার কখন বা কাহাকেও ভাবাবেশে সংজ্ঞাশূন্য হইতে দেখিয়া তিনি তাহার বক্ষস্পর্শ করিয়া তাহাকে পুনরায় সচেতন

করিতেছিলেন। বোধ হইতেছিল যেন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এক দিব্যোজ্জ্বল আনন্দধারা চতুর্দিকে প্রসৃত হইয়া যথার্থ ভক্তকে ঈশ্বর দর্শনে, মৃদু বৈরাগ্যবানকে তীব্র বৈরাগ্য লাভে, অলস মনকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে সোৎসাহে অগ্রসর হইতে সামর্থ্য প্রদান করিতেছিল এবং ঘোর বিষয়ীর মন হইতেও সংসারাসক্তিকে সেইক্ষণের জন্য কোথায় বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার ভাবাবেশ অপরে সংক্রামিত হইয়া তাহাদিগকে ভাববিহ্বল করিয়া ফেলিতেছিল এবং তাঁহার পবিত্রতায় প্রদীপ্ত হইয়া তাহাদের মন যেন কোন এক উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে আরোহণ করিয়াছিল।"

[লীলাপ্রসঙ্গ : দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ]

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের একটি বৈশিষ্ট্য অধ্যাত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারার বিকাশে। রাজা রামমোহন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবধি বাঙালীর মননভূমিতে তাই প্রথম জিজ্ঞাসা—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। য়ুরোপীয় নবজাগরণ মানুষকে চার্চ ও পাদ্রীর আধিপত্য থেকে মুক্ত করে মানবিকতার অভিমুখী করেছিল। আর ভারতীয় নবজাগরণে দেখি মানবিকতার মূলে মানুষের অধ্যাত্মস্বরূপের অনুসন্ধান এবং জীবনের সর্বকর্মে সেই অধ্যাত্মবিকাশের প্রতিফলন প্রচেষ্টা। ভারতের কাব্য, সংগীত, নৃত্য ও শিল্পকলা সব কিছুরই প্রেরণা ও ব্যঞ্জনা এই অধ্যাত্ম অনুভবে। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র, নন্দলাল, উদয়শংকর, রবীন্দ্রশংকর প্রমুখ বিশ্ববন্দিত কবি ও শিল্পীদের সার্থকতার মূলে ভারতপ্রতিভার অধ্যাত্ম অনুভবের বৈশিষ্ট্য। আর এই ভারতসত্তার অধ্যাত্মমন্ত্রটির নব উদ্বোধনে যিনি সবচেয়ে গভীর ও প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছেন সেই জীবনশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের সব কথা ও কাজেই তো সেই পরমানন্দের অভিব্যক্তি।

আনন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনুরাগীদের কেবল শুকনো তত্ত্বজ্ঞান দিতেন না। মায়ের কাছে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন—'মা আমায় রসে বশে রাখিস্।' তাঁর সন্তানদেরও তিনি রসেবশেই রাখতেন। কিন্তু ব্রহ্মকমলের এ মধুকর রসের আকাঙ্ক্ষায়. কখনো "চিত্রের পদ্মেতে'* পড়ে ভুলে থাকেন নি, অপরপক্ষে তাঁর অজস্র কথা ও গল্পে আশে-পাশের মানুষকে মুহুর্মুহু হাস্যরসে আন্দোলিত করেছেন, আবার পরমুহূর্তেই গভীরতম উপলব্ধির জগতে মুহূর্তে তাদের উন্নীত করে ঈশ্বরানন্দের ভাবঘন বিগ্রহরূপে প্রতিভাত হয়েছেন।

---

* 'চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রইল।'—রামপ্রসাদ।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট তারিখটি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। কারণ, বাংলাদেশের দুই রসিকশ্রেষ্ঠ পুরুষ সেদিন পরস্পরকে অভিনন্দিত করেছিলেন তাঁদের অতুলনীয় বাক্‌চাতুরীতে। একজন মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সবচেয়ে বেশী প্রকাশ দেখেছেন, আর একজন নামে ঈশ্বরচন্দ্র হলেও মানুষের সেবাকে যেমন ভালোবাসেন, ঈশ্বরতত্ত্বে তেমন আগ্রহী নন।

প্রথম দর্শনে প্রথম কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের—'আজ সাগরে এসে মিললাম, এতদিন খাল, বিল, হৃদ, নদী, দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি।' (সকলের হাস্য) বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—'তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।' (হাস্য) শ্রীরামকৃষ্ণ—'না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর।' (সকলের হাস্য) 'তুমি ক্ষীরসমুদ্র!' (সকলের হাস্য) বিদ্যাসাগরের কর্ম যে সাত্ত্বিক কর্ম সেকথা বলে রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'আর সিদ্ধ তো তুমি আছই।'

বিদ্যাসাগর—'মহাশয়, কেমন করে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—'আলু পটল সিদ্ধ হলে ত নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া।' বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—'কলাইবাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়।' (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ—'তুমি তা নও গো; শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচা পড়া। না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি—শকুনির মত পচা মড়া খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।'

[কথামৃত : ৩য়]

অশ্বিনী দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে মাত্র চার পাঁচদিন এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর আনন্দময় সত্তাটি ভালোভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। কথায় কথায় রামকৃষ্ণদেবকে বলেছিলেন—"আপনি মজার লোক। আপনার কাছে খুব মজা।" শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বললেন, "বেশ বলেছ, ঠিক বলেছ।" অশ্বিনী-বাবু লিখেছেন,—"ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই এমন হয়েছিল যে, তাঁকে (ঠাকুরকে) মনে হত যেন এক ক্লাসে পড়েছি, কেমন বেয়াদবের মত কথা বলেছি; সম্মুখ থেকে সরে এলেই মনে হত, 'ওরে বাপরে! কার কাছে গেছলাম।' ঐ কয়দিনেই যা দেখেছি ও পেয়েছি তাতে জীবন মধুময় করে রেখেছে। সেই

দিব্যামৃতবর্ষী হাসিটুকু যতনে পেটরায় পুরে রেখে দিইছি। সে যে নিঃসম্বলের অফুরন্ত সম্বল গো।" [কথামৃত : ১ম : পরিশিষ্ট : অশ্বিনীকুমার দত্তের চিঠি]

ভাবের জগতে যাঁরা বাস করেন তাঁরা সাধারণ ব্যাপারে যে আনাড়ী হ'ন একথা আমাদের জানা আছে। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'সেকাল ও একাল' বইতে সেই পণ্ডিতমশাইয়ের কথা লিখেছেন, যিনি স্ত্রীর কথায় উনুনে চাপানো ডালের কড়াই আগলাতে বসেছিলেন। স্ত্রী নাইতে গেছেন। এর মধ্যে ডাল তো উথলে উঠে পড়ে যাচ্ছে। পণ্ডিতমশাই কিছুতেই এই উথলানো বন্ধ করতে না পেরে শেষে যখন চণ্ডীপাঠ করতে শুরু করেছেন, তখন বিপদ উদ্ধার করলেন স্ত্রী এসে কড়াইতে একটু তেল দিয়ে। পণ্ডিতমশাই গলবস্ত্র হয়ে স্ত্রীকে প্রণাম করে বললেন, 'কে মা তুমি পত্নীরূপে আবির্ভূতা ?'

লোকচরিত্রের এই মজাদার দিকগুলি মৃদু কটাক্ষে দেখিয়ে দিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জুড়ি মেলা ভার। পঞ্চবটীতে ভক্তসঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে ঘরে ফিরবার সময় তিনি লক্ষ্য করলেন ভক্তেরা ছাতাটি ফেলে এসেছে। বললেন, "তোমাদের কারুরই ছাতাটা আনতে মনে নেই। ব্যস্তবাগীশ লোক কাছের জিনিষও দেখতে পায় না। একজন আর একটি লোকের বাড়ীতে টিকে ধরাতে গেছলো, কিন্তু হাতে লণ্ঠন জ্বলছে।

একজন গামছা খুঁজে খুঁজে তারপর দেখে কাঁধেতেই রয়েছে।"

[কথামৃত : ৪র্থ : ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪]

অনুক্ষণ ভাবতন্ময়তা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু কখনো কোনো জিনিষ অগোছালো রাখতেন না। ভুলে ফেলে আসতেন না। কাজেকর্মে সতর্কতা তিনি তাঁর সন্তানদের বিশেষভাবে শিক্ষা দিতেন।

ভক্ত বলরামের মতো নিষ্ঠাবান অনুগত খুব কমই মেলে। তবু একটু কার্পণ্য বলরামের ছিল। বলরামের বাড়ীতে মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হতেন। একদিন এমনি এক মিলনমুহূর্তে "বলরামের বন্দোবস্ত" সম্বন্ধে তিনি বলছেন—"বলরাম বলে, 'আপনি নৌকা করে আসবেন, একান্ত না হয় গাড়ী করে আসবেন।' (সকলের হাস্য)। খ্যাঁট দিয়েছে। আজ তাই বিকেলে নাচিয়ে নেবে। (হাস্য) এখান থেকে একদিন গাড়ী করে দিছলো—বারো আনা ভাড়া—আমি বললাম, 'বার আনায় দক্ষিণেশ্বরে যাবে ?' তা বলে, 'ও অমন হয়।' গাড়ী রাস্তায় যেতে যেতে একধার ভেঙে

পড়ে গেল, (সকলের উচ্চ হাস্য)—আবার ঘোড়া মাঝে মাঝে একেবারে থেমে যায়। কোন মতে চলে না, গাড়োয়ান এক একবার খুব মারে, এক একবার দৌড়ায় (উচ্চ হাস্য)। তারপর রাম খোল বাজাবে—আর আমরা নাচবো—রামের তালবোধ নেই। (সকলের হাস্য) বলরামের ভাব, আপনারা গাও, নাচো, আনন্দ করো।" (সকলের হাস্য)

[কথামৃত : ৪র্থ : ১৪ জুলাই ১৮৮৫]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সদাহাস্যময় মূর্তিকে কেউ কেউ নিতান্ত সহজসাধ্য মনে করে মাঝে মাঝে একটু সস্তা রসিকতাও করে ফেলতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎকারে তাই বঙ্কিমের প্রতি একটু কঠোর বাক্যই ব্যবহৃত হতে দেখি। 'মানুষের কর্তব্য কি?'—রামকৃষ্ণদেবের এ প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিম রসিকতাচ্ছলেই বলেছিলেন—'আজ্ঞে তা যদি বলেন, তাহলে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন।' শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'এঃ তুমি ত বড় ছ্যাঁচরা! তুমি যা রাতদিন কর তাই তোমার মুখে বেরুচ্চে। লোকে যা খায় তার ঢেকুর ওঠে। মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে।···কামিনী কাঞ্চনের ভিতর রাতদিন রয়েছো, আর ঐ কথাই মুখ দে বেরুচ্ছে।' কিন্তু এত নির্মম ভৎ‌সনার পরেও বঙ্কিম কিন্তু প্রসঙ্গ ছেড়ে উঠে গেলেন না। একটু পরে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ কোমল হয়ে বললেন, 'আপনি কিছু মনে করো না,' তখন বঙ্কিম বললেন, 'আজ্ঞা মিষ্টি শুনতে আসি নি।'

সেদিনের প্রসঙ্গশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত অধরের বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, 'মহাশয় যত আহাম্মক আমাকে ঠাওরেছেন তত নয়। একটি প্রার্থনা আছে—অনুগ্রহ করে কুটিরে একবার পায়ের ধুলো—'

শ্রীরামকৃষ্ণ—'তা বেশ তো, ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

বঙ্কিম—'সেখানেও দেখবেন ভক্ত আছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—'কি গো, কি রকম সব ভক্ত সেখানে, যারা গোপাল গোপাল, কেশব কেশব বলেছিল, তাদের মতো কি?' (সকলের হাস্য)

একজন ভক্ত—'মহাশয়, গোপাল গোপাল গল্পটি কি?'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—'তবে গল্পটি বলি শোন। এক জায়গায় একটি স্যাকরার দোকান আছে। তারা পরম বৈষ্ণব, গলায় মালা, তিলক সেবা, প্রায় হাতে হরিনামের ঝুলি, আর মুখে সর্বদাই হরিনাম। সাধু বললেই হয়, তবে

পেটের দায়ে, স্যাকরার কর্ম করা। মাগ-ছেলেদের তো খাওয়াতে হবে। পরম বৈষ্ণব, একথা শুনে অনেক খরিদ্দার তাদেরই দোকানে আসে; কেন না, তারা জানে যে, এদের দোকানে সোনারূপা গোলমাল হবে না। খরিদ্দার দোকানে গিয়ে দেখে যে, মুখে হরিনাম করছে, আর বসে বসে কাজকর্ম করছে। খরিদ্দার যেই গিয়ে বসলো, একজন বলে উঠলো, 'কেশব! কেশব!' খানিকক্ষণ পরে আর একজন বলে উঠলো, 'গোপাল! গোপাল! গোপাল!' আবার একটু কথাবার্তা হতে না হতেই আর একজন বলে উঠলো—'হরি! হরি! হরি!' গয়না গড়বার কথা যখন একরকম ফুরিয়ে এলো, তখন আর একজন বলে উঠলো—'হর! হর! হর! হর!' কাজে কাজেই এত ভক্তি প্রেম দেখে তারা স্যাকরাদের কাছে টাকাকড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো, জানে যে এরা কখনও ঠকাবে না।

'কিন্তু কথা কি জান? খরিদ্দার আসবার পর যে বলেছিল 'কেশব! কেশব!' তার মানে এই, এরা সব কে? অর্থাৎ যে খরিদ্দারেরা আসলো এরা সব কে? যে বলল, 'গোপাল! গোপাল!' তার মানে এই, এরা দেখছি গোরুর পাল, গোরুর পাল। যে বললে, 'হরি! হরি!' তার মানে এই, যেকালে দেখছি গোরুর পাল, সে স্থলে হরি অর্থাৎ হরণ করি। আর যে বললে 'হর! হর!' তার মানে এই, যেকালে গোরুর পাল দেখছো, সেকালে সর্বস্ব হরণ কর। এই তারা পরম ভক্ত সাধু।' (সকলের হাস্য)

[কথামৃত : ৫ম : পরিশিষ্ট]

সমগ্র গল্পটির মধ্যে বহিরঙ্গ সাত্ত্বিকতার ভানকে এমন নির্মম আঘাত করা হয়েছে যে এখানে হাস্যরস প্রায় বিদ্রূপের কাছাকাছি পৌছেছে, কিন্তু বলার গুণে এর গল্পসৌন্দর্যই শ্রোতাকে নিবিষ্ট করে রাখে।

আনন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানে গুরু, লোকশিক্ষক, ধর্মসংস্থাপক, সেখানে প্রয়োজনবোধে এমনি কঠোর সত্যভাষী, আবার যেখানে বন্ধু, প্রিয়, দয়িত সেখানে কুসুমাদপি কোমল। পত্নী সারদাদেবীর সঙ্গে তাঁর দিব্যসম্বন্ধের কথা না বুঝে সেকালের কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা হয়েছিল যে স্ত্রীর প্রতি তাঁর উদাসীনতা নির্মমতারই নামান্তর। তাঁরা তো জানতেন না যে ভুল করে একদিন ভাইঝি লক্ষ্মী ভেবে সারদাদেবীকে 'তুই' সম্বোধন করে ফেলায় সারা রাত তাঁর ঘুম হয় নি। তাঁর সাতটাকা মাইনের যে টাকা খাজাঞ্চিখানায় পড়ে

থাকতো (তিনি সই করে টাকা নিতে পারতেন না বলে,) তাই থেকে তিনি স্ত্রীকে ডায়মণ্ডকাটা বালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ বালা তিনি পঞ্চবটীতে দিব্যদর্শনে সীতার হাতে দেখেছিলেন। গয়না গড়িয়ে রামলালকে বলেছিলেন, 'ওর সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ।' পাদসম্বাহনরতা পত্নীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'যে মা এই মন্দিরে, যে মা নহবতে গর্ভধারিণী, তিনিই আর একরূপে আমার সেবা করছেন।' এ দুনিয়ায় আমরা ভালোবাসার গল্প অনেক শুনেছি, কিন্তু এমন পরমপ্রেমের দাম্পত্যকাহিনী আর কখনো শুনি নি।

আবার ঈশ্বরের মাতৃভাবের প্রতীকস্বরূপ যাঁকে তিনি জগতের কল্যাণের জন্য আপনস্থলে মনে মনে নির্বাচন করেছিলেন, তাঁকে একদিকে যেমন সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তেমনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অধিকারও দিয়েছিলেন। জীবন একটি সমগ্র শিল্প। তাই ঝাঁট দেওয়ার ঝাঁটা থেকে ব্রহ্মজ্ঞানে তন্ময় ধ্যান—কোনটিই উপেক্ষার নয়। শ্রীশ্রীমাকে তিনি শিখিয়েছিলেন, কেমন করে প্রদীপেব সলতেটি রাখতে হয়, নিজের বাড়ীর লোকদের সঙ্গে কি আচরণ কর্তব্য আর অন্যের বাড়ীর লোকদের সঙ্গেই বা কেমন আচরণ করতে হবে, কোথাও যেতে হলে গাড়ীতে সবার আগে ওঠা এবং সবার শেষে নামার দরকার; সেই সঙ্গে পূজা, জপ, ধ্যান, কীর্তন—এ সব কিছুর প্রণালী।

ব্যক্তিগত জীবনসাধনায় তাঁব যে একাগ্রতা ও তন্ময়তা, আপন অভীষ্ট আদর্শের সঙ্গে একাত্মতা, সেই তো যথার্থ শিল্পীর স্বরূপ। শাক্ত বা বৈষ্ণব, দ্বৈত বা অদ্বৈত, ইসলাম বা খৃষ্টান—যখন যেভাবে তিনি তন্ময় হয়েছেন, সেইভাবেই পরিপূর্ণ হয়ে গেছেন। ইসলামভাবে সাধনার সময় হিন্দু সংস্কারগুলি মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল। মধুরভাবে সাধনার কালে সর্বাংশে নারীজনোচিত আচরণ হয়েছিল, বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে তাঁকে দেখে মথুরবাবুও চিনতে পারেন নি। মায়ের মনে ব্যথা দেবেন না বলে বইরে গেরুয়া না পরলেও তোতাপুরীর কাছে তিনি যে সন্ন্যাসদীক্ষা নিয়েছিলেন, তারপর থেকে আর গৃহস্থের কোনো কর্তব্যকর্ম—এমনকি মায়ের দেহান্তে তর্পণও তাঁর দ্বারা সম্ভব হয় নি। 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'—এই সিদ্ধান্তের পর থেকে ধাতুখণ্ডের স্পর্শমাত্র সইতে পারতেন নি—এ সবই ভাবগত পূর্ণতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। বিদ্যাপতির রাধা যেমন—

'অনুক্ষণ মাধব মাধব সুমরই সুন্দরী ভেলি মাধাই"—

শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনি যখন যে ভাবের জগতে থেকেছেন, সেই জগতের অধিবাসীরূপে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে জীবনশিল্পীরূপে জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী-সত্তার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে ভবতারিণীর প্রথম দর্শন পাওয়ার পর থেকে অনুক্ষণ মাতৃদর্শনের ও সান্নিধ্যের জন্য তাঁর ক্রমবর্ধমান দিব্যোন্মাদের একটি চিত্র 'লীলাপ্রসঙ্গে' একটু ভাষান্তরিত হয়ে এইরকম—"আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাবল্যে সাধারণ জীবের শরীর মনে ঐরূপ হওয়া দূরে থাকুক, উহার একচতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হইলে শরীর ত্যাগ হয়। দিবা-রাত্রির অধিকাংশ ভাগ মার কোন না কোনরূপ দর্শনাদি পাইয়া ভুলিয়া থাকিতাম, তাই রক্ষা, নতুবা এ খোলটা থাকা অসম্ভব হইত। এখন হইতে আরম্ভ হইয়া দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল তিলমাত্র নিদ্রা হয় নাই। চক্ষু পলকশূন্য হইয়া গিয়াছিল, সময়ে সময়ে চেষ্টা করিয়াও পলক ফেলিতে পারিতাম না। কতকাল গত হইল, তাহার জ্ঞান থাকিত না এবং শরীর বাঁচাইয়া চলিতে হইবে একথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। শরীরের দিকে যখন একটু দৃষ্টি পড়িত তখন উহার অবস্থা দেখিয়া বিষম ভয় হইত; ভাবিতাম, পাগল হইতে বসিয়াছি নাকি? দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চক্ষে অঙ্গুলিপ্রদান পূর্বক দেখিতাম, চক্ষুর পলক উহাতেও পড়ে কিনা। তাহাতেও চক্ষু সমভাবে পলকশূন্য থাকিত! ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিতাম এবং মাকে বলিতাম—'মা তোকে ডাকার ও তোর উপর একান্ত বিশ্বাসে নির্ভর করার কি এই ফল হল? শরীরে বিষম ব্যাধি দিলি?' আবার পরক্ষণেই বলিতাম, 'তা যা হবার হোক্ গে, শরীর যায় যাক, তুই কিন্তু আমায় ছাড়িস্ নি, আমায় দেখা দে, কৃপা কর, আমি যে তোর পাদপদ্মে একান্ত শরণ নিয়েছি, তুই ভিন্ন আমার যে আর অন্য গতি নেই।' ঐরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে মন আবার অদ্ভুত উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় বলিয়া মনে হইত এবং মার দর্শন ও অভয়বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হইতাম।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনজীবনের এমন কতো অনুভবের কথাই না আমরা জানি, যা স্মরণমনন করলে বোঝা যায়, কেন বাইবেলে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর তাঁরই আদলে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—'মানুষে তাঁর বিশেষ প্রকাশ।' আমরা বলবো তাঁর মতো মানুষকে দেখেই সেকথা বিশ্বাস হয়।

অবতারকে তিনি বাহাদুরী কাঠের সঙ্গে উপমা দিয়েছেন, যে কেবল নিজে

ভাসে না, অন্যকেও উদ্ধার করে। কখনো তাঁর অমৃতোপম কথার মাধুর্যে, কখনো সমস্ত পাপ তাপ আপনার মধ্যে টেনে নিয়ে, কখনো একটি মাত্র দিব্য-স্পর্শে মানবপ্রকৃতির চিররূপান্তরের শিল্পব্রত তিনি আজীবন উদ্‌যাপন করেছেন। সাধারণ প্রচারক আর ভগবানের আদেশ পাওয়া প্রচারকের উপমায় তিনি বলেছেন—"ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে—তখন আর একবার ছ্যাঁক কলকল করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে, তখন আবার চুপ হয়ে যায়, তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসে, আবার কথা কয়।

"যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভনভন করে, ফুলে বসে মধুপান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখনও কখনও গুনগুন করে।

"পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভক্‌ভক্‌ শব্দ হয়; পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না, তবে আর এক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয় তা হলে আবার শব্দ হয়।" [কথামৃত : ৩য় : ৫ই আগস্ট : ১৮৮২]

এমন অভ্রান্ত অপরিবর্তনীয় উপমার শিল্পী দুনিয়ায় আর ক'জন আছেন জানি না। বাংলা গদ্যভাষা বহু মনীষীর প্রচেষ্টায় যখন ধীরে ধীরে রূপলাভ করছে, তখন সাধারণ পুথিপাণ্ডিত্যবর্জিত এই মহাজীবনের ভাবশিল্পী এক কল্পনাতীত ঐশ্বর্য ও মাধুর্য এ ভাষায় সঞ্চারিত করে চলেছিলেন। বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিম বাংলাগদ্যের দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পী বোধ হয় এই সত্যটি অনুধাবনের সুযোগ পান নি। কিন্তু তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে একজন—স্বামী বিবেকানন্দ—তিনিই বুঝেছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনে ভাব, ভাষা সব কিছুতেই নূতনত্বের যুগ এসেছে। বাংলা চলতি গদ্য তাঁরই হাতে সর্বপ্রথম যথার্থ সাহিত্যরূপ লাভ করে উচ্চতম অধ্যাত্মতত্ত্ব থেকে লঘুভার রঙ্গরসিকতার বাহন হলো। আবার শ্রীরামকৃষ্ণমননের গভীরতাই বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠধ্বনিত বাগ্‌বিভূতির পরিচয়-রূপে 'বর্তমান ভারতের' সাধু গদ্য রূপে প্রকাশিত। বিবেকানন্দ অভেদানন্দের মতো আরো কতো কবিচেতনাকে স্পর্শ করে শ্রীরামকৃষ্ণ-পূতগঙ্গা কতো শিল্প-সাহিত্য সংগীতরূপে প্রবাহিত।

কিন্তু সব শিল্পের উপরে জীবনশিল্প। শ্রীরামকৃষ্ণ আপন জীবনের সিদ্ধশিল্পী—

অথবা তাঁর জীবনশিল্পের রচয়িত্রী স্বয়ং মহামায়া। আর শ্রীরামকৃষ্ণের নিপুণ অঙ্গুলিস্পর্শে রূপায়িত হয়েছে—গিরিশচন্দ্র, নাগমহাশয়, বিবেকানন্দের মতো বিচিত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কতো না জীবন।

প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই তার মহত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলাতে জীবনশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের পারঙ্গমতা বুঝতে পারি দু-চারটি ঘটনার ইঙ্গিতে। গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে অশ্বিনী দত্ত বলেছিলেন, 'শুনেছি মদ খায়।' শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'খাক না, খাক না, কদিন খাবে।' [কথামৃত : ১ম : পরিশিষ্ট] তিনি তো জানতেন এই ভক্তভৈরবকে বকলমা দেওয়ার শরণাগতিতে এমনভাবে তিনি পরিবর্তিত করেছেন যে, শেষ শয্যায় শয়ান গিরিশচন্দ্র একদিন বলবেন, 'কে, রামকৃষ্ণ এসেছো। এসেছ তো নেশা ঘুচিয়ে দাও।" জগতের সেরা নেশা ঈশ্বরতন্ময়তার দ্বারা তিনি গিরিশচন্দ্রের সুরার নেশা ঘুচিয়েছিলেন।

সগুণ নিরাকারে বিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথ যখন একদিন হাজরার সঙ্গে 'ঘটিটাও ঈশ্বর' 'বাটিটাও ঈশ্বর' বলে পরিহাস করছিলেন, তখন ভাবস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের একটি স্পর্শে জগতের সর্বত্র তিনি ব্রহ্মদর্শন করে পরবর্তীকালে তাঁর এই উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন করে গেছেন—'আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তাছাড়া ঈশ্বর ফিশ্বর কিছুই আর নেই।'

ঈশ্বরের জন্য সর্বস্বত্যাগী যে কেবল সন্ন্যাসীকেই হতে হবে তা নয়, গৃহীরও যে তাই পরমাদর্শ, তারই প্রতীকরূপে তাঁর আর এক অপূর্ব শিল্পকীর্তি সাধু নাগ মহাশয়ের জীবনকথা—ঘরের খুঁটিতে উইপোকা লাগলেও যিনি তাদের বিনাশ করতে চাইতেন না, একহিসাবে তারাও তো তাঁর অতিথি!

অথচ ব্যবহারিক জীবনে নির্বুদ্ধিতা বা অধীরতা কোনোটিকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশ্রয় দেন নি। দোকানীর কাছে না দেখে ফাটা কড়াই কেনার জন্য যোগেনকে যেমন অনুযোগ করেছেন, অতিক্রোধী নিরঞ্জনকে তেমনি গুরুনিন্দা শুনে একদল নৌকারোহীকে বিপদ্‌গ্রস্ত করার চেষ্টায় তিরস্কার করেছেন। রাখাল তাঁর মানসপুত্র—সব অবস্থায় তাকে সন্তানের মতোই দেখেছেন—কিন্তু তার সামান্য লোভ বা মলিনতার সম্ভাবনাকে দৃঢ় শাসনে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। যে নরেন্দ্রনাথের হাতে রাঁধা অন্ন তিনি খেয়েছেন, একসময় আবার সেই নরেন্দ্রনাথেরই হাতের জিনিষ খেতে পারেন নি—কারণ সঙ্গীদের সঙ্গে নিজের অজান্তে নরেন্দ্রনাথ

উচ্চতম অধ্যাত্ম আদর্শ থেকে সামান্য দূরে চলে গিয়েছিলেন। আবার পিতার অকালমৃত্যুতে দারিদ্র্যপীড়িত নরেন্দ্রনাথের সাময়িক ঈশ্বরে অবিশ্বাসে অন্যেরা বিচলিত হলেও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এ বেদনাবোধ থেকেই মহত্তর নরেন্দ্রনাথের নবজন্ম ঘটবে।

মানবমানসের বহুবিচিত্র লীলার প্রতিটি সূক্ষ্ম কম্পন অনুধাবন করে তাকে অনন্তের দিকে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া—সারাজীবন তিনি এই শিল্পব্রতে নিয়োজিত থেকে মানবসভ্যতার এক সর্বজনীন মহামন্দিরে পরিণত—যে মন্দিরে নিখিল মানবের শিল্প, সংগীত, সাহিত্য, সাধনা একত্রে মিলেছে—যে মন্দির সকল ভাবের সকল যুগের মানুষের কাছে অবারিতদ্বার। তাঁর সর্বত্যাগী সাধনসমুজ্জ্বল ভাবসমাহিত যে মূর্তিখানি আজ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল করে ঘরে ঘরে পূজো পাচ্ছে—আধুনিক কালের ইতিহাসে তাই মহত্তম জীবনশিল্প।

ভারতীয় কথাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ

ভারতীয় সাহিত্যে কথাকোবিদ্‌দের বিশেষ স্থান ছিল. সে ইঙ্গিত কালিদাসই রেখে গেছেন। গল্প বলায় এবং শোনায় ভারতীয়রা যে কতখানি অক্লান্ত, আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, জাতক, পুরাণ, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র—এ সবে তার অজস্র নিদর্শন। গল্পের ভিতরে গল্প, তারও ভিতরে গল্প—এমনি করে জাদুকরের ইন্দ্রজালে বাক্সের ভিতর বাক্স, তারও ভিতরে বাক্স—কেমন করে বেরিয়ে আসে তার উদাহরণ কথাসরিৎসাগর বা কাদম্বরী—এমন অনেক গ্রন্থেই মিলবে। একদিকে এই প্রত্যক্ষ জগৎ ও জীবন, আর একদিকে সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা পেরিয়ে কল্পনার প্রসার—এ দুয়ের টানাপোড়েনেই সবদেশে পুরাণ-কাহিনীগুলি গড়ে উঠেছে। এরা গোড়ার দিকে মুখে মুখেই চলে এসেছে, তা এদের বিষয়-বিন্যাস থেকেই মনে হয়, পরবর্তীকালে নিপুণ ভাষাশিল্প এদের অন্তর্নিহিত বিস্ময়রসকে আবৃত করতে পারে নি। তাই ইতিহাসের উপাদান থাকলেও পুরাণ কখনো ইতিহাসে থেমে থাকে নি।

পুরাণের সঙ্গে আমাদের ধর্মচেতনা ও জীবন-ব্যাখ্যা—এ দুয়েরই গভীর যোগ। গরুড়ের অমৃত-আহরণের কাহিনী বা প্রমিথিউসের অগ্নি-আনয়নের কাহিনী—এ দুয়ের মধ্যেই সত্যের জন্য নির্ভীক সংগ্রাম ও দুঃখবরণের উদাহরণ আছে, তা যুগে যুগে মানুষকে আপন মহিমান্বিত সত্তা সম্বন্ধে সজাগ করে তুলেছে। ধর্মের আনুষ্ঠানিক বা সাম্প্রদায়িক দিকটি বাদ দিলে যার সঙ্গে আমাদের নীতি ও সাধনগত প্রত্যয়ের যোগ সেই ধর্মবোধের প্রয়োজনে সবদেশেই মহাপুরুষেরা নানা রূপক বা উপকথার আশ্রয় নিয়েছেন। আধ্যাত্মিক সত্যে উত্তরণের যে ব্যবহারিক মানদণ্ড, তা এই নীতিগত বা রূপকাশ্রিত 'কথা'গুলির দ্বারা শ্রোতাদের মনে চিরকালের মতো দাগ কেটে গেছে।

হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, ঈশপের গল্প প্রভৃতির মধ্যে যে ব্যবহারিক স্তর থেকে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা রয়েছে, আধ্যাত্মিক জগতের মহাপুরুষদের ব্যবহৃত বা রচিত গল্পগুলি তার থেকে গভীরতর জীবনসত্যে উপনীত হওয়ার নিদর্শন। বুদ্ধদেবের নামে প্রচারিত জাতককাহিনী, যীশু কথিত প্যারাব্‌ল্ অথবা

রামকৃষ্ণদেবের গল্প—এরা বিশ্বের কথাসাহিত্যে চিরস্মরণীয় সামগ্রী। মানবমানসের বিভিন্ন স্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী এ জাতীয় গল্পকথা যেমন সাহিত্যরসে সার্থক, তেমনি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির নিপুণ রূপায়ণ।

ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদ-উপনিষদও এক হিসাবে কথাসাহিত্যের ভাণ্ডারস্বরূপ। পুরুরবা-উর্বশী-কাহিনী, বৃত্রাসুর বধের কল্পনা, শুনঃশেফের গল্প, নচিকেতা-যম উপাখ্যান, দেবাসুরের আদর্শগত ব্যবধান, সত্যকামের ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতি নানা গল্পের উপাদান আমাদের প্রাচীনতম সাহিত্যে নিহিত। পরলোকগত অধ্যাপক সুধীরকুমার দাশগুপ্ত মহোদয় এ জাতীয় কাহিনীর একটি অনবদ্য সংগ্রহ 'গল্পে উপনিষৎ' নামে প্রকাশ করেছিলেন—যা তরুণমানসের দিশারীরূপে বাংলাসাহিত্যে চিরস্মরণীয়। সাম্প্রতিককালে অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী 'পুরাণ-দীপালি' গ্রন্থে কিশোর মানসের উপযোগী করে কিছু গল্প সাজিয়ে দিয়েছেন—নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যে ও প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় এ গল্পগুলিও এ জাতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সংযোজন। তাছাড়া শ্রীসুবোধ ঘোষের বহুখ্যাত 'ভারত প্রেমকথা' এবং অধ্যাপক শ্রীজাহ্নবী চক্রবর্তীর 'হিরণ্ময় পাত্র' গ্রন্থ দুটি প্রাচীন কথার আধুনিক সাহিত্যসার্থক রূপান্তরের অনবদ্য নিদর্শন।

বাংলাসাহিত্যে রামকৃষ্ণদেবের গল্পকথাকে কিশোরমানসের উপযোগী করে প্রকাশ করেছিলেন স্বামী প্রেমঘনানন্দ তাঁর 'রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প' বইখানিতে। যুগপৎ লেখক ও শিল্পী স্বামী প্রেমঘনানন্দের এই বইখানি কিশোর মনের উন্মুখ গ্রহণশীলতার পক্ষে ভাষালাবণ্যে ও রেখাচিত্রের সুষমায় এক পরমাশ্চর্য শিল্পকীর্তি। তাঁর 'বিবেকানন্দের কথা ও গল্প' বইখানিও এদিক থেকে আমরা বিশেষভাবে মনে রাখতে পারি।

অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণসাহিত্যের মধ্যে একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর তামিল ভাষায় রচিত 'রামকৃষ্ণ উপনিষদম্' বা 'শ্রীরামকৃষ্ণ উপনিষৎ'। এ বইখানির ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, গুজরাটী, কানাড়ী অনুবাদ প্রকাশিত ও জনসমাদৃত হয়েছে। রামকৃষ্ণদেবের গল্পকথাগুলির অন্তর্নিহিত ভাব ও আদর্শের ব্যাখ্যায় রাজাগোপালাচারীর পারদর্শিতা পাঠকচিত্তকে শ্রদ্ধায় আবিষ্ট করে রাখে। দাক্ষিণাত্যের পাঠকদের উপযোগী করে লেখক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পগুলিকে সামান্য রূপান্তরিত করলেও মূল ভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

বুদ্ধ, যীশু বা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো মহামানবদের কথিত কাহিনীনিচয় কথাসাহিত্যের দিক থেকে আমরা প্রধানতঃ তিনভাবে লক্ষ্য করতে পারি। প্রথমতঃ এ জাতীয় কাহিনীর নিরলঙ্কার সরলতা। বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে ধারণা এত স্বচ্ছ যে, নানা ঘটনা বা চরিত্রের সমাবেশ এ জাতীয় কাহিনীতে একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। কাহিনীগুলির অন্তর্নিহিত বক্তব্যই এদের নিশ্চিত পরিণামের অভিমুখী করেছে। দ্বিতীয়তঃ এ জাতীয় কাহিনী তাঁরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাস্তব জগৎ থেকেই প্রধানতঃ সৃষ্টি করেছেন। সেই সঙ্গে ঐতিহ্যাগত পৌরাণিক বা নৈতিক কাহিনীর ধারাও রয়েছে। বুদ্ধদেবের নামে প্রচলিত জাতক কাহিনীর অনেকগুলিই হয়তো এ-জাতীয় কাহিনীরই পরিণাম। অপরপক্ষে যীশু বা রামকৃষ্ণ-কথিত গল্পগুলিতে তাঁদের সমকালীন জগৎ ও জীবনের ছবিই বেশী ফুটে উঠেছে। তৃতীয়তঃ এই কাহিনীগুলির অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার সম্পদ। এই বিশেষ কারণেই জগতের অন্যান্য কথাসাহিত্যের সঙ্গে এঁদের কথাগুচ্ছের স্বাতন্ত্র্য।

যাঁরা একান্ত শিল্পবাদী তাঁরা এই বক্তব্যধর্মী কথাসাহিত্যকে স্বীকৃতি দিতে চাইবেন না এই কারণে যে, শিল্পের অন্তর্লীন না থেকে বক্তব্যই এসব গল্পে প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু বক্তব্য এদের কাহিনীরসকে আচ্ছন্ন করেনি, সে কথাটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রূপকথা, উপকথা-জাতীয় গল্পের যেমন নিজস্ব সাহিত্যমূল্য রয়েছে, নীতিকথা বা আধ্যাত্মিকতাময় গল্পেরও তেমনি সাহিত্যগত সার্থকতার দিক রয়েছে। পর পর তিনটি এ-জাতীয় গল্পের উদাহরণ দিয়ে আমাদের বক্তব্য পেশ করবো।

প্রথম গল্পটি জাতকের কাহিনী থেকে অনুবাদ করেছিলেন ঈশানচন্দ্র ঘোষ। তাঁরই ভাষায় গল্পটি পাঠকদের কাছে উপহার দিই—

কুদ্দাল জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব পর্ণিককুলে (যাহারা শাকসবজি উৎপাদন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত) জন্মগ্রহণপূর্বক ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক ও হিতাহিতবিচারণক্ষম হইলেন। তাঁহার নাম হইল "কুদ্দাল পণ্ডিত"। তিনি কুদ্দালদ্বারা একখণ্ড জমি আবাদ করিয়া তাহাতে শাক, লাউ, কুমড়া, শশা

প্রভৃতি উৎপাদন করিতেন এবং সেই সমস্ত বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। গৃহে সেই একখানি কোদালি ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন সম্বল ছিল না। একদিন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'গৃহে থাকিয়া আমার কি সুখ? আমি গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রব্রাজক হইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কোদালিখানি লুকাইয়া রাখিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু বোধিসত্ত্ব সেই ভোঁতা কোদালির লোভ দমন করিতে পারিলেন না; তিনি গৃহে ফিরিলেন। এইরূপ পুনঃপুনঃ ঘটিতে লাগিল,—তিনি ছয়বার কোদালি লুকাইয়া রাখিয়া প্রব্রাজক হইলেন এবং ছয়বারই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর সপ্তমবারে তিনি এইরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি এই কুণ্ঠ কুদ্দালের মায়াতেই পুনঃপুনঃ গৃহে আসিতেছি; এবার ইহা মহানদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রব্রজ্যা লইব।' তখন তিনি নদীতীরে গিয়া পাছে কুদ্দালের পতনস্থান দৃষ্টি-গোচর হইলে প্রত্যাবর্তনপূর্বক উহা উদ্ধার করিবার ইচ্ছা হয়, এই আশঙ্কায়, চক্ষুর্দ্বয় নিমীলন করিলেন, বাঁট ধরিয়া হস্তিসমবলে মস্তকোপরি তিনবার ঘুরাইয়া কুদ্দালখানি নদীর মধ্যভাগে নিক্ষেপ করিলেন এবং 'আমি জিতিয়াছি! আমি জিতিয়াছি! আমি জিতিয়াছি!' বলিয়া তিনবার সিংহনাদ করিলেন।

বারাণসীরাজ প্রত্যন্তবাসী প্রজাদিগের বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। তিনি সেই নদীতেই অবগাহনপূর্বক সর্বালঙ্কারভূষিত এবং গজস্কন্ধারূঢ় হইয়া গমন করিতেছেন, এমন সময়ে বোধিসত্ত্বের জয়ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি বলিলেন, 'এ লোকটা 'জিতিয়াছি, জিতিয়াছি' বলিতেছে। কাহাকে জিতিল? উহাকে আমার নিকট আনয়ন কর ত!' বোধিসত্ত্ব উপস্থিত হইলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্র, আমি সংগ্রামে বিজয়ী হইয়া রাজধানীতে ফিরিতেছি। তুমি কিসে বিজয়ী হইলে?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ সংগ্রামে জয়ী হইলেও দুর্জয় রিপুগণকে জয় করিতে পারেন নাই। আমি কিন্তু অন্য লোভদমনপূর্বক রিপুজয়ী হইয়াছি।' ইহা বলিতে বলিতে তিনি মহানদী অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং ধ্যান করিয়া তত্ত্বদর্শী হইলেন। তখন তাঁহার লোকাতীত ক্ষমতা জন্মিল। তিনি আকাশে আসীন হইয়া রাজাকে নিম্নলিখিত গাথায় ধর্মশিক্ষা দিলেন—

সে জয়ে কি ফল, পশ্চাতে যাহার আছে পরাজয় ভয়?
যে জয়ের কভু নাই পরাজয় সেই সে প্রকৃত জয়।

ধর্মোপদেশ শুনিতে শুনিতে রাজার মোহান্ধকার দূর এবং রিপুনিচয় প্রশমিত হইল। তাঁহার রাজ্যাভিলাষ দূরে গেল, প্রব্রজ্যালাভের বাসনা জন্মিল। তিনি বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি এখন কোথায় যাইবেন?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, আমি এখন হিমাচলে গিয়া তপস্বিভাবে বাস করিব।' 'তবে আমিও প্রব্রাজক হইব', বলিয়া রাজাও বোধিসত্ত্বের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। তদ্দর্শনে রাজার সমস্ত সৈন্য এবং সমাভিব্যাহারী ব্রাহ্মণাদি অপর সকলেও তাঁহার অনুগামী হইলেন।" (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ঈশানচন্দ্র ঘোষের 'জাতকমঞ্জরী' থেকে।)

বোধিলাভের জন্য সর্বস্বত্যাগের এ আদর্শ যুগে যুগে সব দেশের সব কালের সত্যসন্ধানীর অন্তরের উপলব্ধিজাত অভিজ্ঞতা। কিন্তু যে কাহিনীর মাধ্যমে এই সত্যটি এখানে উপস্থাপিত, সে কাহিনীর বাস্তবধর্মিতা ও কথননৈপুণ্য—এও লক্ষ্য করার মতো। বাসনা-নিবৃত্তি থেকেই যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সূচনা বা আবির্ভাব—এ কথাটি এই শাকসবজি বিক্রেতার কোদালের প্রতি আসক্তির উদাহরণে যে তীব্রতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে, তারই সঙ্গে স্মরণীয়, যুদ্ধজয়ী রাজার তুলনায় বাসনাজয়ী সন্ন্যাসীর মহিমা।

দ্বিতীয় গল্পটি আমরা বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অংশের সেন্ট ম্যাথু লিখিত 'গসপেল' থেকে উদ্ধৃত করছি। আমরা যারা ঈশ্বরের করুণাপ্রার্থী, অথচ মানুষের প্রতি একান্ত অকরুণ, তাদের পক্ষে স্মরণীয় এ কাহিনীটি যীশু একদা সেন্ট পিটারের প্রশ্নের উত্তরে শুনিয়েছিলেন। প্রশ্নটি ছিল—আমার ভাই যদি আমার বিরুদ্ধে অপরাধ করে, তাহলে কি সাতবার পর্যন্ত তাকে আমি ক্ষমা করবো? (সাতবার ক্ষমা করার প্রথা হয়তো তখন প্রচলিত ছিল। আমাদের শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের শত অপরাধ পর্যন্ত ক্ষমা করেছিলেন।) পিটারের প্রশ্নের উত্তরে যীশু বললেন, 'সত্তরগুণ সাতবার ক্ষমা করবে; শুধু সাতবার নয়।' তারপরেই এই গল্পটি তিনি বলেছিলেন—"ভগবানের রাজ্য হচ্ছে সেই রাজার মতো, যিনি তাঁর অনুচরদের হিসাবপত্র নিয়মিত বুঝে নিতেন। এমনি একবার যখন রাজা অনুচরদের হিসাব পরীক্ষা করে দেখছেন, তখন দেখা গেল যে তাদের একজনের কাছে রাজার হাজার দশেক মুদ্রা পাওনা। সে টাকা সে দিতে পারবে না জেনে তাকে স্ত্রীপুত্র বিষয়সম্পত্তিসহ বিক্রী করে টাকা আদায়ের হুকুম হলো। একথা শুনে কাতরহৃদয়ে অনুচরটি রাজার পায়ে পড়ে মিনতি

জানালো, 'মহারাজ, একটু সময় দিন, আমি আপনার পাওনাগণ্ডা সব শোধ করে দেব।' মিনতি শুনে রাজার হৃদয় বিগলিত হলো। তাকে মুক্তি তো দিলেনই, সব পাওনাগণ্ডাও মাপ করে দিলেন।

ওদিকে মুক্ত হয়ে লোকটি যখন নিজের বাড়িতে ফিরে এলো তখন তারই এক সহকর্মীর সঙ্গে দেখা। সহকর্মীটি এর কাছে একশো মুদ্রা ধার করেছিল। এবারে কিন্তু অনুচরটির মনে কোনো অনুকম্পা জাগলো না। বরং আপন সহকর্মীর ঘাড়টি ধরে সে পাওনা আদায়ের জন্য তর্জন গর্জন শুরু করে দিলে। সহকর্মীটি কাকুতি মিনতি করে, এমন কি তার পায়ে ধরে ঋণশোধের জন্য সময় চাইতে লাগলো। সময় তো সে দিলেই না, উপরন্তু সহকর্মীকে ওই ক'টি টাকার জন্য জেলে পুরে রাখলে।

ব্যাপার দেখে রাজার অন্য অনুচরেরা রাজাকে সব জানালো। ভয়ানক চটে গিয়ে রাজা লোকটিকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'ওরে শয়তান, তোর কাকুতি-মিনতি শুনে আমি তোর সব ঋণ মাপ করেছিলাম, আর তুই ওর দেনা মাপ করতে পারলি না, একটু দয়া হলো না?' এই বলে রাজা কারাগারের রক্ষীদের আদেশ দিলেন, 'একে বন্দী করে যন্ত্রণা দিয়ে এর কাছ থেকে সব পাওনা আদায় করো।'

তোমরা যদি সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমাদের ভাইদের সব অপরাধ মার্জনা করো, তাহলে স্বর্গরাজ্যের পিতা ঈশ্বরও তোমাদের সব অপরাধ মার্জনা করবেন।"

আসন্ন মৃত্যুমুহূর্তে যিনি পরমপিতার কাছে তাঁর হত্যাকারীদের জন্য মার্জনা চেয়েছিলেন, এ তাঁরই উপযুক্ত গল্প। হয়তো এ গল্প তিনিও ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছেন, অথবা শ্রোতার প্রয়োজন অনুযায়ী এমন গল্প তিনি সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে তুলনামূলক গবেষণার দ্বারাই সত্য নির্ধারিত হতে পারে।

জগতের পরিত্রাতাদের বাণী কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন সব অসাধারণ ব্যক্তিত্বের স্পর্শে কাহিনীর জাদুমন্ত্রে কতখানি প্রাণময় হয়ে উঠতে পারে, তার আর এক উদাহরণ 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।' বুদ্ধদেবের জাতককাহিনীর অজস্রতা সত্ত্বেও সেগুলি সবই তাঁর রচিত কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। রামকৃষ্ণদেবের গল্পসংখ্যা সে তুলনায় অনেক কম হলেও সামগ্রিকভাবে সংগৃহীত হলে খুব ছোট সংগ্রহ হবে না। বাংলাসাহিত্যের রসলোকে এ গল্পগুলির কথনসৌন্দর্য ও অনুভূতিসম্পদ দুইই আমরা ভেবে দেখতে পারি।

কুদ্দালজাতকের গল্পটিতে যে বৈরাগ্যপ্রসঙ্গ রয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণকথায় সে বৈরাগ্য আমাদের পল্লীবাংলার ঘরোয়া জীবনযাত্রার দৃষ্টিতে আর এক উজ্জ্বল চিত্রসৌন্দর্য লাভ করেছে। 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র এমন একটি উদাহরণ বৈরাগ্য-প্রসঙ্গে তাঁর উদাহরণমালা। তাঁর ভাষায়—"বৈরাগ্য দুই প্রকার। তীব্র বৈরাগ্য আর মন্দ বৈরাগ্য। মন্দ বৈরাগ্য—হচ্ছে হবে—ঢিমে তেতালা। তীব্র বৈরাগ্য শাণিত খুরের ধার—মায়াপাশ কচ্ কচ্ করে কেটে দেয়।"

এই তীব্র ও মন্দ বৈরাগ্যের উদাহরণরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ তিনটি ছোট ছোট গল্পের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন—(এক) "কোনও চাষা কতদিন ধরে খাটছে—পুষ্করিণীর জল ক্ষেতে আর আসছে না! মনে রোখ নাই! আবার কেউ দুচারদিন পরেই—আজ জল আনবো ত ছাড়বো, প্রতিজ্ঞা করে। নাওয়া খাওয়া সব বন্ধ। সমস্ত দিন খেটে সন্ধ্যার সময় যখন জল কুল কুল করে আসতে লাগলো, তখন আনন্দ। তারপর বাড়ীতে গিয়ে পরিবারকে বলে,—'দে এখন তেল দে, নাইবো।' নেয়ে খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা।"

(দুই) "একজনের পরিবার বললে, 'অমুক লোকের ভারী বৈরাগ্য হয়েছে। তোমার কিছু হলো না। যার বৈরাগ্য হয়েছে, সে লোকটিব ষোলজন স্ত্রী—এক একজন করে তাদের ত্যাগ করছে।'

সোয়ামী নাইতে যাচ্ছিল, কাঁধে গামছা,—বললে 'ক্ষেপী! সে লোক ত্যাগ করতে পারবে না,—একটু একটু করে কি ত্যাগ হয়। আমি ত্যাগ করতে পারবো। এই দেখ—আমি চললুম!'

সে বাড়ীর গোছগাছ না করে—সেই অবস্থায় কাঁধে গামছা—বাড়ী ত্যাগ করে চলে গেল।—এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য।"

(তিন) "আর একরকম বৈরাগ্য, তাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়াবসন পরে কাশী গেল। অনেকদিন সংবাদ নাই। তারপর একখানি চিঠি এলো—'তোমরা ভাবিবে না, আমার এখানে একটি কর্ম হইয়াছে।"

(শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত : ৪র্থ ভাগ : ১৮৮৪, ২৩শে মার্চ)

বৈরাগ্যসাধনার দেশ এই ভারতবর্ষে এ সব উদাহরণ আমাদেরও চোখের সামনেই ঘটে থাকে। কিন্তু ত্যাগীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন পরিচিত জীবনের ছবিটি নিপুণভাবে আমাদের মানসপটে চিরকালের জন্য মুদ্রিত করে দিতে পারেন,

তেমন ভাষার বা অনুভবের শক্তি সবার নেই। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের প্রধানতম পরিচয় এই ত্যাগের আদর্শে। তাঁরই মুখে শোনা এই গল্পগুলি যথার্থ বৈরাগ্য ও নকল বৈরাগ্যের পার্থক্য যেমন বুঝিয়ে দেয়, তেমনি তাঁর নিজের জীবনের আদর্শটিকেও আমাদের অন্তরলোকে জ্যোতির্ময় করে তোলে।

ঈশ্বরের স্বরূপ, সাধনা, আস্বাদ, অনুভব, জ্ঞান-বৈরাগ্য-যোগ-ভক্তির কত শত উপমা উদাহরণ তিনি তাঁর অজস্র উপমায় ও গল্পে বিকীর্ণ করে বাংলা-ভাষাকে শাশ্বত সম্পদে ধনী করে গেছেন, সেকথা ভাবলে অবাক হতে হয়। আবার ভগবৎসাধনার সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবনের নানান আচরণ, নানান দৃষ্টিভঙ্গীও কোনো কোনো গল্পে আশ্চর্য সমাধান লাভ করেছে। শ্রোতার প্রয়োজন ও আদর্শ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি ভিন্ন ভিন্ন গল্প প্রয়োগ করেছেন। তেমন একটি উদাহরণ পাই তরুণ নরেন্দ্রনাথকে বলা একটি গল্পের উপস্থাপনায়।

শ্রীম—বা মাস্টারমশাই তখন সদ্য যাতায়াত শুরু করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে তাঁর তৃতীয় দর্শনের তারিখ ৫ই মার্চ, ১৮৮২, আর সেদিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত নরেন্দ্রনাথের বয়স উনিশ। কথা হচ্ছিল, সংসারের দুষ্ট লোকদের সঙ্গে ব্যবহার নিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—"নরেন্দ্র, তুই কি বলিস ? সংসারী লোকেরা কত কি বলে। কিন্তু দ্যাখ, হাতী যখন চলে যায় পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চীৎকার করে। কিন্তু হাতী ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে তুই কি মনে করবি ?

নরেন্দ্র—'আমি মনে করব, কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—'নারে, অতো দূর নয়। (সকলের হাস্য) ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়।……একটা গল্প শোন। কোন বনে একটি সাধু থাকেন। তাঁর অনেকগুলি শিষ্য। তিনি একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্বভূতে নারায়ণ আছেন, এইটি জেনে সকলকে নমস্কার করবে। একদিন একটি শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গিছলো। এমন সময়ে একটা রব উঠলো, 'কে কোথায় আছ পালাও—একটা পাগলা হাতী যাচ্ছে।' সবাই পালিয়ে গেল। কিন্তু শিষ্যটি পালালো না। সে জানে যে হাতীও নারায়ণ, তবে কেন পালাবো ? এই বলে দাঁড়িয়ে রইলো। নমস্কার করে স্তব স্তুতি করতে

লাগলো। এদিকে মাহুত চেঁচিয়ে বলছে, 'পালাও পালাও', শিষ্যটি তবুও নড়লো না। শেষে হাতীটা শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে তাকে একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শিষ্য ক্ষতবিক্ষত হয়ে ও অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল।

"এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে আশ্রমে ধরাধরি করে নিয়ে গেলো, আর ঔষধ দিতে লাগলো। খানিকক্ষণ পর চেতনা হলে ওকে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কেন হাতী আসছে শুনে চলে গেলে না?' সে বললে, 'গুরুদেব যে আমায় বলেছিলেন যে নারায়ণই মানুষ জীবজন্তু সব হয়েছেন। তাই আমি হাতীনারায়ণ আসছে দেখে সেখান থেকে সরে যাই নাই।' গুরু তখন বললেন, 'বাবা, হাতীনারায়ণ আসছিলেন বটে, তা সত্য, কিন্তু বাবা, মাহুতনারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন? মাহুতনারায়ণের কথাও শুনতে হয়।" (সকলের হাস্য) (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত : ১ম ভাগ)

এ গল্পটিরই পাশাপাশি রয়েছে 'সাপ ও ব্রহ্মচারী'র গল্প। অন্যায়কারীর কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ফোঁস করতে হবে, তা বলে উল্টে তার অনিষ্ট করা নয়—এ কথাই সে গল্পের মর্ম। তরুণ নরেন্দ্রনাথের সর্বানুভূতিময় সত্তা অবশ্য একদা পাপীতাপী খল মূর্খ সব রূপেই নারায়ণকে বন্দনা করতে পেরেছিল—কিন্তু পরম-জ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞানের সূক্ষ্মসম্বন্ধটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্নিগ্ধ পরিহাস ও কৌতুকের ভাষায় দুটি গল্পের দ্বারা চিরকালের মতো সাধকদের পন্থা নির্দেশ করে দিয়েছে। দক্ষিণেশ্বরে বা অন্যত্র এমনি ছোট ছোট অজস্র গল্পের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানবমানসের বিচিত্র স্বরূপ ও মানবচরিত্রের রকমারি প্রকাশকে যে অনন্য কুশলতায় রূপায়িত করেছেন তার সজীবতা, মৌলিকতা ও দৃষ্টিগভীরতা এ সবই উচ্চতম সাহিত্যপ্রতিভার সাক্ষ্য।

একটি গল্প শোন

'কথামৃতের' পাতায় পাতায় এমন কতো গল্প আছে। অমৃতময় তাঁর বাণী। আর সেই অফুরান কথানির্ঝরে কতো না গল্পের রামধনু। বাংলার কথাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ এই গল্পসম্ভার রেখে গেছেন সব বয়সের সমস্ত কালের বাঙালী তথা বিশ্ববাসীর উদ্দেশে। সত্যিকার শ্রেষ্ঠ গল্পের কোনো বিশেষ দেশ বা কাল নেই,

তারা যে কালেই রচিত হোক না কেন, সব কালই তাদের সমান আগ্রহে বরণ করে নেয়। বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছোট গল্পের লেখকেরা যেমন সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে নানাভাবে স্মরণীয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই গল্পকথাগুলিও তারই পাশাপাশি আলোচনাযোগ্য। এরা মুখে মুখে রচিত বা বর্ণিত, কিন্তু 'কথামৃত'কার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ-সংকলয়িতা সুরেশচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদবৃন্দের স্মৃতিবিধৃত নানান গল্পের কথা আমরা সাহিত্যরূপেই আলোচনা করে এদের সৌন্দর্যে ও গভীরতায় নতুন করে মুগ্ধ হতে পারি।

মানবজীবনকে আমরা মহাকাব্যে, আখ্যায়িকাকাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে কতোভাবেই দেখেছি। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে সেই মানবজীবনদর্শনের আর একটি রূপ প্রাধান্য পেলো ছোটগল্পের আঙ্গিকে। কিন্তু এই গল্প বলার ও শোনার তৃষ্ণা আবহমান ইতিহাসের ধারায়। সে ধারার প্রথম উদ্ভব তো মুখে মুখে রচনায়। বেদে-উপনিষদে, জাতকে, বাইবেলে, রামায়ণ-মহাভারতে, ইলিয়াড-ওডিসিতে সেই মুখের কথার গল্পই একদিন লিখিত বাণীরূপে আবদ্ধ। গল্প-সাহিত্যের এই অনাদি উৎস থেকেই দেখা দিয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পরাজি।

মাঝে মাঝেই 'কথামৃতে' শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রোতৃ-মণ্ডলীর প্রয়োজন অনুসারে তাঁর বক্তব্যকে প্রাণময় করে তুলেছেন এক একটি সংহত কাহিনীর বর্ণন-নৈপুণ্যে, আর সেই ছোট্ট কাহিনীর উপোদ্‌ঘাতে তাঁর কথারম্ভ—'একটি গল্প শোন।' যেমন ধরুন তীব্র বৈরাগ্য সম্বন্ধে তাঁর সেই খানদানী চাষীর গল্পটির সূচনা—'তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে, একটি গল্প শোন।' এ গল্পটি 'কথামৃতের' অন্যত্র সংক্ষিপ্ত আকারে রয়েছে। সমগ্র পরিবেশের পটচিত্রটি সংযোগ করে তিনি গল্পটি যে ভাবে 'কথামৃতে'র প্রথম ভাগে ১৮৮২ সালে ১৪ই ডিসেম্বরের আলাপচারীতে বর্ণনা করেছেন তাতে কথাশিল্পীরূপে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিমাটি পরিস্ফুট। সংক্ষিপ্তরূপে আমরা গল্পটিকে একটু আগে উপস্থিত করেছি। এখন বিস্তারিত রূপটি লক্ষণীয়—"তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে, একটি গল্প শোন। এক দেশে অনাবৃষ্টি হয়েছে। চাষীরা সব খানা কেটে দূর থেকে জল আনছে। একজন চাষার খুব রোক আছে; সে একদিন প্রতিজ্ঞা করলে যতক্ষণ না জল আসে, খানার সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক না হয়, ততক্ষণ খুঁড়ে যাবে।

এদিকে স্নান করবার বেলা হলো। গৃহিণী মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিল। মেয়ে বললে—'বাবা! বেলা হয়েছে, তেল মেখে নেয়ে ফেল।' সে বললে, 'তুই যা, আমার এখন কাজ আছে।' বেলা দুই প্রহর হলো, তখনও চাষা মাঠে কাজ করছে। স্নান করার নামটি নেই। তার স্ত্রী তখন মাঠে এসে বললে, 'এখনও নাও নাই কেন? ভাত জুড়িয়ে গেল, তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি। না হয় কাল করবে, কি খেয়েদেয়েই করবে।' গালাগালি দিয়ে চাষা কোদাল হাতে তাড়া করলে; আর বল্লে, 'তোর আক্কেল নেই? বৃষ্টি হয় নাই। চাষ-বাস কিছুই হলো না, এবার ছেলে-পুলে কি খাবে? না খেয়ে সব মারা যাবি! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, মাঠে আজ জল আনবো তবে নাওয়া-খাওয়ার কথা কবো।' স্ত্রী গতিক দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল। চাষা সমস্তদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সন্ধ্যার সময় খানার সঙ্গে নদীর যোগ করে দিলে। তখন একধারে বসে দেখতে লাগলো যে, নদীর জল মাঠে কুলকুল করে আস্ছে। তার মন তখন শান্ত আর আনন্দে পূর্ণ হলো। বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বললে, 'নে এখন তেল দে আর একটু তামাক সাজ।' তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে নেয়ে খেয়ে সুখে ভোঁস ভোঁস করে নিদ্রা যেতে লাগলো। এই রোক্ তীব্র বৈরাগ্যের উপমা।

"আর একজন চাষা—সেও মাঠে জল আন্‌ছিল। তার স্ত্রী যখন গেল আর বললে, 'অনেক বেলা হয়েছে, এখন এস, এত বাড়াবাড়িতে কাজ নেই; তখন সে বেশী উচ্চবাচ্য না করে কোদাল রেখে স্ত্রীকে বললে—'তুই যখন বলছিস্ তো চল!' (সকলের হাস্য) সে চাষার আর মাঠে জল আনা হলো না! এটি মন্দ বৈরাগ্যের উপমা।

"খুব রোক্ না হলে, চাষার যেমন মাঠে জল আসে না, সেইরূপ মানুষের ঈশ্বরলাভ হয় না।"

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরটিতে সেদিন শ্রোতাদের মধ্যে ব্রাহ্ম ভক্তদের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন অন্যতম। বলরাম বসু, মাষ্টারমশাই প্রভৃতি পার্ষদেরাও উপস্থিত। বিশেষভাবে বিজয়কৃষ্ণের জীবনসাধনার পটভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এ গল্পটি যেমন সেদিন প্রযোজ্য ছিল, তেমনি উপস্থিত আর সব ভক্তের আদর্শের দিক থেকেও গল্পটি সমান প্রয়োজনীয়। কিন্তু যদি এ গল্পকে আমরা ঈশ্বরলাভের ক্ষেত্রে না দেখে সামাজিক বা রাজনৈতিক আদর্শের

ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করি তাহলেও এর মূল্য কম নয়। আজকের দিনের নেতৃবৃন্দ বা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের পরিচালকবর্গ এ গল্পটি সারাজীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করতে পারেন।

গল্পহিসাবে এ গল্পে গ্রামবাংলার চাষীর ঐতিহ্য, দুই চাষীর চরিত্রগত পার্থক্য, তাদের স্ত্রীদের কথাবার্তা এ সব কিছুর মধ্যে এমন এক বাস্তব পর্যবেক্ষণের সৌন্দর্য রয়েছে যা একালের সাহিত্যিকদেরও শিক্ষণীয়। সমগ্র গল্পের ব্যঞ্জনাটি যদি রামকৃষ্ণদেব ব্যাখ্যা নাও করে দিতেন, গল্প সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তা শ্রোতাদের অন্তরে নিশ্চিত ছাপ রেখে যেতো।

কিন্তু শেষের' ঐ উপদেশবাক্যটিকে আমরা অবান্তর বলতে রাজী নই। বিশুদ্ধ সাহিত্যের নামে আমরা অনেক সময়ই ভুলে যাই যে জীবনের পরিণততম অভিজ্ঞতার নিকটে যাচাই না হলে শুধুমাত্র জীবনচিত্র বলেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হতে পারে না। মানব-অস্তিত্বের পরমপ্রশ্ন সম্বন্ধে আধুনিক পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যাপক ও গভীরতম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই গল্পগুলি সেই অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। তাই ওই উপদেশবাক্যটি সমগ্র গল্পটির ধারণশিলা—সে কথা মনে রাখাও প্রয়োজন। এমনি গল্প সব জাতকে, ঈশপের গল্পে বা পঞ্চতন্ত্রে রয়েছে। গল্প হিসাবে তারা যেমন বিশ্বসাহিত্যে আদরণীয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্প সম্বন্ধেও সেই একই রসোপলব্ধির আনন্দ স্মরণীয়।

আধুনিক মননের সবচেয়ে বড়ো প্রত্যয় মানবিকতাবাদে। রাজনৈতিক মতাদর্শের দলাদলি যতই থাক, অর্থনৈতিক চিন্তাপদ্ধতি যতই বদলাক, সভ্যতার প্রধান লক্ষ্য ও অবলম্বন যে মানুষ—এ বিষয়ে দক্ষিণ, বাম বা মধ্যপন্থীদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। ভারতবর্ষ প্রাচীনতম কাল থেকেই মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছে, তবে সে স্বীকৃতি গভীরতর অর্থে। মানুষ যে এই সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সত্ত্বেও অনন্ত ঈশ্বরকে ধারণায় আনতে পেরেছে, সেইখানেই ভারতবর্ষ তার শ্রেষ্ঠত্বকে লক্ষ্য করেছে। রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় 'মান হুঁস' কথাটির বিশেষ তাৎপর্য এইখানে। তাই নবযুগধর্মরূপে নরনারায়ণসেবার যেটুকু অন্ন বস্ত্র বহিরঙ্গ শিক্ষার দিক, তাকে স্বীকার করে নিয়েও তিনি মনে করিয়ে দিতেন—"কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়, সাধন করে এগিয়ে যাও। সাধন করতে করতে এগিয়ে পড়লে শেষে জানতে পাবে যে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য।"

বস্তুবিশ্ব থেকে এই চৈতন্যজগতে উত্তরণের স্তরপরম্পরা প্রসঙ্গেই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ দর্শনের দিক থেকেও নতুন কিছু জগতের চিন্তাধারায় দিয়েছেন। দুরূহ দর্শনতন্ত্রের চর্চায় না গিয়ে আমাদের মতো সাধারণজনদের জন্য তিনি যে এগিয়ে যাওয়ার গল্প শুনিয়েছেন সে কথাই আগে ভাবি। এমন একটি প্রেরণাময় চিত্রধর্মী গল্প অধ্যাত্মচেতনার রূপক হিসাবে তো বিশেষভাবে বন্দনীয়; কিন্তু যাঁরা অধ্যাত্মচেতনার দিক থেকে না দেখে আপন আপন জীবনাদর্শের দিক থেকে এ গল্পের মূল প্রেরণাটি গ্রহণ করবেন, তাঁরাও চরিতার্থ হবেন নিঃসন্দেহে।

"একজন কাঠুরে বনে কাঠ কাট্তে গিছিলো। হঠাৎ এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হলো। ব্রহ্মচারী বললেন, 'ওহে, এগিয়ে পড়ো। কাঠুরে বাড়ীতে এসে ভাব্তে লাগলো ব্রহ্মচারী এগিয়ে যেতে বলছেন কেন?

"এই রকমে কিছুদিন যায়। একদিন সে বসে আছে, এমন সময় ওই ব্রহ্মচারীর কথাগুলি মনে পড়লো। তখন সে মনে মনে বললে, আজ আমি আরো এগিয়ে যাবো। বনে গিয়ে আরো এগিয়ে দেখে যে, অসংখ্য চন্দনের গাছ। তখন আনন্দে গাড়ি গাড়ি চন্দনের কাঠ নিয়ে এলো, আর বাজারে বেচে খুব বড় মানুষ হয়ে গেল।

"এই রকমে কিছুদিন যায়। আর একদিন মনে পড়লো ব্রহ্মচারী বলেছেন 'এগিয়ে পড়ো।' তখন আবার বনে গিয়ে এগিয়ে দেখে রূপোর খনি। এ কথা সে কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। তখন খনি থেকে কেবল রূপো নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে লাগলো। এত টাকা হল যে আণ্ডিল হয়ে গেল।

"আবার কিছুদিন যায়। একদিন বসে ভাব্ছে ব্রহ্মচারী তো আমাকে রূপোর খনি পর্যন্ত যেতে বলেন নাই—তিনি যে আমাকে এগিয়ে যেতে বলেছেন। এবার নদীর পারে গিয়ে দেখে, সোনার খনি। তখন সে ভাব্লে, 'ওহো! তাই ব্রহ্মচারী বলেছিলেন, এগিয়ে পড়ো।'

"আবার কিছুদিন পর এগিয়ে দেখে, হীরে মাণিক রাশীকৃত, পড়ে আছে। তখন তার কুবেরের মত ঐশ্বর্য হলো।

"তাই বলছি যে, যা কিছু কর না কেন, এগিয়ে গেলে আরো ভালো জিনিস পাবে। একটু জপ করে উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে করো না, যা হবার তা হয়ে গেছে। কর্ম কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আরো এগোও, কর্ম নিষ্কাম

করতে পারবে। তবে, নিষ্কাম কর্ম বড় কঠিন, তাই ভক্তি করে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, 'হে ঈশ্বর, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দাও, আর কর্ম কমিয়ে দাও; আর যেটুকু রাখবে, সেটুকু কর্ম যেন নিষ্কাম হয়ে করতে পারি।

"আরো এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ হবে। তাঁকে দর্শন হবে। ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ কথাবার্তা হবে।"

[কথামৃত : ১ম ভাগ : ১৮৮৪, ১৫ই জুনের দিনলিপি]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতে অবশ্য শেষ অবধি পরমপ্রাপ্তি এক ঈশ্বর। "আরো এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ হবে। তাঁকে দর্শন হবে। ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ কথাবার্তা হবে।" কিন্তু মানবাত্মার অন্তহীন অগ্রগতির পথে যাঁরা দর্শনে বিজ্ঞানে শিল্পে সাহিত্যে নানাভাবে কর্মরত, তাঁদের প্রত্যেকের এবং সকলের ক্ষেত্রে নবযুগের এই 'চরৈবেতি' মন্ত্র তমসার পারে উদয়ঊষার আহ্বান।

'কথামৃতে'র গল্প পাঠকসমাজে কম বেশী পরিচিত। কিন্তু এ কথা মনে করার কারণ নেই যে শুধুমাত্র এই গল্পগুলিই রামকৃষ্ণদেব ভক্তদের বলেছিলেন। এর বাইরেও অনেক গল্প রয়ে গেছে—যে সব গল্প নানাজনের স্মৃতিকথায় ছড়ানো। এদিক থেকে ভক্ত সুরেশচন্দ্র দত্তের সংগৃহীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ" বিশেষ মূল্যবান সংগ্রহ। এ সংগ্রহে যে সব গল্প রয়েছে তার অনেক-গুলিরই কোনো উল্লেখ 'কথামৃতে' নেই। অথচ গল্পগুলির বিষয়বস্তু ও বর্ণনা-ভঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাক্‌বৈশিষ্ট্য সুপ্রকাশিত। মহেন্দ্রনাথের নিপুণ ভাষাশিল্পে সুরেশচন্দ্রের অধিকার ছিলো না। তবু গল্পসংগ্রহের দিক থেকে তো বটেই, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনেক স্বল্পপরিচিত উক্তিসংগ্রহের দিক থেকেও এ গ্রন্থটি মূল্যবান।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের' উপদেশ' গ্রন্থে সংগৃহীত গল্পগুলির মধ্যে একটি গল্প এখানে পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করছি। মানবমনস্তত্ত্ব ও ধর্ম-জিজ্ঞাসার এক সূক্ষ্ম যোগসূত্র রচনা করে রামকৃষ্ণদেব তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলিতে যে চিত্ত-চমৎকার সৃষ্টি করেছেন, এ গল্পটির মধ্যেও সে স্বাদ পাওয়া যায়। কেবল ভাষাগত দুর্বলতাটুকু পরিহার্য।

"এক নাপিত পথে চলতে চলতে হঠাৎ শুনতে পেল, কে যেন বলছে, 'সাতঘড়া টাকা নিবি?' নাপিত আশ্চর্য হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখে, কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না। সাতঘড়া টাকার নাম শুনে সে কিঞ্চিৎ লুব্ধ হয়ে

ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে বললো, 'নেবো'। অমনি সে আবার শুনতে পেলে কে যেন বললো, 'আচ্ছা তোর বাড়িতে দিয়ে এলুম, নিগে যা।' নাপিত বাড়ি গিয়ে দেখে যথার্থই তার বাড়ীতে ঘড়া রয়েছে। নাপিত ভাল করে নেড়ে-চেড়ে দেখতে পেলে ছ'টি ঘড়া মোহরে ভরা আর একটি ঘড়া খালি রয়েছে। খালি ঘড়াটি পূর্ণ করবার জন্যে তার একান্ত ইচ্ছা হলো এবং তার ঘরে সোনা-রূপা যা কিছু ছিল, সব এনে সেই খালি ঘড়ায় ভিতর পুরলে, কিন্তু তাতে সে ঘড়া পুরবে কেন? নাপিত সংসারের খরচ কমিয়ে রোজ রোজ সেই ঘড়ায় পুরতে লাগলো। এবং অবশেষে কাকুতি-মিনতি করে রাজামশাইকে জানালে যে তার সংসারে এখন ভারী কষ্ট হচ্ছে, সে যে ক'টাকা পায় তাতে তার চলে না। রাজা তাব মাইনে বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু নাপিতের যে দশা সেই দশা। সে এখন লোকের কাছে মেগে পেতে খায় এবং যা কিছু টাকা পায় তা ঐ ঘড়ার ভিতর পোরে। পরে রাজা একদিন তার দুর্দশা দেখে বললেন, 'হ্যাঁরে! আগে তুই কম মাইনে পেতিস্ তাতে তো বেশ চলতো, আর এখন তুই দ্বিগুণ পাচ্ছিস্ তবু তোর চলে না কেন রে? তুই কি সাতঘড়া মোহর এনেছিস্ না কি?' নাপিত থতমত খেয়ে বললে, 'আজ্ঞে, আপনাকে কে বললে?' রাজা বললেন, 'আরে সে যে যকের ধন, সেই যক্ষটা আমার কাছে এসে বলেছিল, 'সাতঘড়া ধন নেবে?' আমি বললাম, 'জমার টাকা না খরচের টাকা।' যক্ষটা অমনি পালিয়ে গেল, আর কোনো কথা কইলো না। ও টাকা কি নিতে আছে, ও টাকা খরচ করবার জো নেই, ও কেবলই জমার টাকা, ভালো চাস্তো ফিরিয়ে দিয়ে আয়।' নাপিত ঐ কথা শুনে তাড়াতাড়ি আগের সেই জায়গায় গিয়ে বললে, 'তোমার টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমার কাজ নেই।' যক্ষ বললো, 'আচ্ছা।' বাড়ীতে এসে নাপিত দেখে ঘড়াগুলো কে নিয়ে গেছে। লাভের মধ্যে সেই সঙ্গে সে এতকাল ধরে সেই খালি ঘড়াটার ভিতর যা পুরেছিলো, সেগুলিও নিয়ে গেছে।"

গল্প শেষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্তব্য—'ধর্মরাজ্যেও ঐরূপ, জমা খরচ বোধ না থাকলে শেষে সর্বস্ব হারাতে হয়।' 'কথামৃতে'র মতো সমগ্র প্রসঙ্গটি না থাকায় ঠিক কি উপলক্ষে বা কার উপযোগী করে রামকৃষ্ণদেব গল্পটি বলেছিলেন, তা বুঝতে পারা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তবু অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ক্রমাগত দাবী যে মানুষকে কোন অকূল সর্বনাশের মোহানায় এনে দাঁড় করায়, তার উদাহরণ

ধর্মরাজ্যে যেমন বস্তুজগতের রাজ্যেও তেমনি। একালের বিত্তভোগী সম্প্রদায়ের মানসিক বিকৃতি ও ক্রমবর্ধমান অশান্তির চিত্র দেখলে ঐ নাপিতটির মনস্তত্ত্ব খুবই স্বাভাবিক মনে হতে পারে। পরিপূর্ণ অনাসক্তির মূর্তবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ সেই নিষ্কাম আদর্শের জীবনযাপন করেই বর্তমান যুগের চির অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার শ্রেষ্ঠ উত্তর রেখে গেছেন। তবু কতো উপায়েই না অন্তরবাসী যক্ষটি সর্বস্বহরণের চেষ্টায় রত।

গল্পের পর গল্প—এমন কতো গল্পই না তিনি আমাদের শুনিয়েছেন। অধ্যাত্মজগতের এই গল্পকারের প্রসঙ্গে আমাদের সাহিত্যজগতের গল্পকারদের এমন রূপকধর্মী গল্পরচনার দৃষ্টান্ত মনে আসে স্বাভাবিকভাবেই। টলস্টয়ের সেই অমর গল্পগুচ্ছের কথা মনে করুন। শেষ অবধি মানুষের কতটুকু জমির প্রয়োজন? শেষ অবধি মানুষকে কে দেখেন এ জগতে? ঘরের আগুন না নিভিয়ে কেন শত্রুর উদ্দেশে দৌড়ানো? এমন গল্প সব আধুনিক যুগেই রচিত।

রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' মনে করুন, অথবা বনফুলের কোনো কোনো গল্প —যে সব গল্পে ঈশ্বর, ভাগ্য, সমাজ, মানবচরিত্র এক একটি সীমায়িত গল্প-কণিকার দর্পণে আমাদের কাছে অনন্তের পরিচয় বহন করে এনেছে। জীবন-দর্শনের নির্দিষ্ট বক্তব্য এসব গল্পে আছে, সেই বক্তব্যকে ঘিরেই গল্পবয়নের বিচিত্র তন্তুটি গড়ে উঠেছে। অথচ মনে হয় কি, যে, সাহিত্য হয়ে ওঠে নি?

টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ বা বনফুল লেখার কথাকৌশলকে নিপুণভাবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের দ্বারা এই সার্থকতা অর্জন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার দীর্ঘ ইতিহাসে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ লোককথার যে অজস্র উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তার দ্বারাই অপরূপ কথার বন্ধনে এ গল্পগুলি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। বহু ভাগ্য আমাদের, আর সব কথাকোবিদদের গল্পের মতো তাঁর কথা ও গল্প কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক মনোহরণ করে থেমে যায় নি, যোগ্যজনের লেখনীতে স্মৃতিবদ্ধ হয়ে বিশ্বসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

আমাদের সবার জীবনেই হয়তো মা বা মায়ের মতো কারুর কাছে প্রথম গল্প শোনা। 'কথামৃত' পড়তে পড়তে রামকৃষ্ণদেবের 'একটা গল্প শোন' অনুজ্ঞাটি দেখামাত্র আপন অগোচরে আমাদেরও অন্তরবাসী গল্পক্ষুধাতুর শৈশবটি

ফিরে আসে। জীবনের বহু বিচিত্র জটিল অভিজ্ঞতার পারে আবার এই শৈশবে ফিরে আসার সার্থক সরলতা বহুজন্মবাঞ্ছিত পুণ্যফল। মাতৃভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ-কণ্ঠে জগজ্জননীর আহ্বানই এই গল্প শোনার আহ্বানে প্রতিধ্বনিত।

ঈশ্বরের মাতৃরূপ, নারদমুনির গল্প ইত্যাদি

মাতৃভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে গর্ভধারিণী জননী ও জগজ্জননী একই সত্তা। তাই আপন জননীর পূজা তাঁর দৃষ্টিতে জগজ্জননীর পূজা। পুরাণকাহিনী থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব "সর্বভূতেষু মাতৃরূপা"র আরাধনার একটি কাহিনী শুনিয়েছেন। গল্পটি ঠিক তাঁর মুখের ভাষায় উপস্থাপিত নয়। শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ স্বামী সারদানন্দজীর চিরায়তগ্রন্থ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে" বাংলা সাধুগদ্যের দৃঢ়সংহত রূপায়ণে একটু স্বাতন্ত্র্য লাভ করে গল্পটি এই রকম—"কিশোর বয়সে গণেশ একদিন ক্রীড়া করিতে করিতে একটি বিড়াল দেখিতে পান এবং বালসুলভ চপলতায় উহাকে নানাভাবে পীড়াপ্রদান ও প্রহার করিয়া ক্ষতবিক্ষত করেন। বিড়াল কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিলে গণেশ শান্ত হইয়া নিজ জননী শ্রীশ্রীপার্বতীদেবীর নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন, দেবীর শ্রীঅঙ্গে নানাস্থানে প্রহারচিহ্ন দেখা যাইতেছে। বালক মাতার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দেবী বিমর্ষভাবে উত্তর করিলেন, 'তুমিই আমার ঐরূপ দুরবস্থার কারণ।' মাতৃভক্ত গণেশ ঐ কথায় বিস্মিত ও অধিকতর দুঃখিত হইয়া সজলনয়নে বলিলেন, 'সে কি কথা, মা! আমি তোমাকে কখন প্রহার করিলাম? অথবা এমন কোন দুষ্কর্ম করিয়াছি বলিয়াও ত স্মরণ হইতেছে না, যাহাতে তোমার অবোধ বালকের জন্য অপরের হস্তে তোমাকে ঐরূপ অপমান সহ্য কবিতে হইবে?' জগন্ময়ী শ্রীশ্রীদেবী তখন বালককে বলিলেন, 'ভাবিয়া দেখ দেখি, কোনো জীবকে আজ তুমি প্রহার করিয়াছ কি-না?' গণেশ বলিলেন, 'তাহা করিয়াছি; অল্পক্ষণ হইল একটা বিড়ালকে মারিয়াছি।' যাহার বিড়াল সেই মাতাকে ঐরূপে প্রহার করিয়াছে ভাবিয়া গণেশ তখন রোদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীগণেশজননী অনুতপ্ত বালককে সাদরে হৃদয়ে ধারণপূর্বক বলিলেন, 'তাহা নহে, বাবা, তোমার সম্মুখে বিদ্যমান আমার এই শরীরকে কেহ প্রহার করে নাই, কিন্তু

আমিই মার্জারাদি যাবতীয় প্রাণিরূপে সংসারে বিচরণ করিতেছি, এজন্য তোমার প্রহারের চিহ্ন আমার অঙ্গে দেখিতে পাইতেছ। তুমি না জানিয়া ঐরূপ করিয়াছ, সেজন্য দুঃখ করিও না; কিন্তু অদ্যাবধি এ কথা স্মরণে রাখিও, স্ত্রীমূর্তিবিশিষ্ট জীবসকল আমার অংশে উদ্ভূত হইয়াছে এবং পুংমূর্তিধারী জীব-সমূহ তোমার পিতার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—শিব ও শক্তি ভিন্ন জগতে কেহ বা কিছুই নাই।' গণেশ মাতার ঐ কথা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিলেন এবং বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাতাকে বিবাহ করিতে হইবে ভাবিয়া উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অসম্মত হইলেন। ঐরূপে শ্রীশ্রীগণেশ চিরকাল ব্রহ্মচারী হইয়া রহিলেন এবং শিবশক্ত্যাত্মক জগৎ—এই কথা হৃদয়ে সর্বদা ধারণা করিয়া থাকায় জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হইলেন।"

(লীলাপ্রসঙ্গ : সাধকভাব : পৃঃ ২২৫ ; ১৩৬২ সংস্করণ)

পুরাণকাহিনীর বিভিন্ন চরিত্র যুগে যুগে দেশে দেশে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নূতন ব্যঞ্জনামণ্ডিত হয়। সেদিক থেকে গণেশ কাহিনীর এই বৈশিষ্ট্য ভারতের সর্বপ্রান্তের পুরাণকাহিনীর সঙ্গে হয়তো মিলবে না। কিন্তু মাতৃভাবসাধক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শ ব্যাখ্যায় এ গল্পটির তাৎপর্য অপরিসীম। কামতন্ত্র-প্রধান আধুনিক পৃথিবীতে গণেশের এই কাহিনীটি মানবাত্মার মহত্তম পবিত্রতা সম্বন্ধে ভারতীয় ধারণার প্রতীক। এই সঙ্গে গণেশ ও কার্তিকের প্রতিযোগিতার গল্পটিও বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দুই ভাইয়ের মধ্যে যে আগে চৌদ্দ ভুবন ঘুরে আসতে পারবে, জগজ্জননী তাকেই গলার হারখানি দেবেন, একথা শুনে দাদার স্থূলকান্তির জন্য নিশ্চিত পরাজয়ের কথা জেনে কার্তিক বেরিয়ে গেলেন ময়ূরবাহনে। এদিকে গণেশ আপন জনকজননী হরপার্বতীর মধ্যেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে অনুভব করে তাঁদের প্রদক্ষিণ করে শান্তমনে বসে রইলেন। জননীর বরমাল্য গণেশের গলায়ই অর্পিত হয়েছিল। ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব সমাবেশে এ গল্পটিও পুরাণকাহিনীর এক অনবদ্য সৃষ্টি এবং শ্রীরামকৃষ্ণসাধনায় মাতৃভাবের অনন্ত মহিমার প্রকাশক।

পুরাণের ভক্তির আদর্শ লোকের মুখে মুখে নানা গল্পের দ্বারা ব্যাখ্যাত হতে থাকে। এমন অনেক গল্পই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলাপচারিতে ভক্তেরা শুনতে পেতেন। 'কথামৃতে', 'লীলাপ্রসঙ্গে' এ জাতীয় গল্প যেমন মেলে, তেমনি পাই সুরেশচন্দ্র দত্তের 'পরমহংসদেবের উপদেশ'-গ্রন্থে। এই লোকমুখে প্রচলিত

পুরাণের গল্পগুলি সাধারণ মানুষের ভাষায় আমাদের জাতীয় আদর্শের ব্যাখ্যা। সাধারণতঃ এ কালের পাঠকদের কাছে অপরিচিত। একটি দুটি গল্প এ প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করি।

কোনো সময়ে নারদের মনে অভিমান হয়েছিল যে, বুঝি তাঁর মত ভক্ত আর নেই। ঠাকুর (নারায়ণ) তা জানতে পেরে একদিন তাঁকে সঙ্গে করে বেড়াতে বেরুলেন। খানিক দূরে গিয়ে নারদ এক ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলেন, তার কোমরে একখানি শাণিত তলোয়ার রয়েছে. অথচ বামুন শুকনো ঘাস খাচ্ছে। নারদ বুঝতে পারলেন যে, সে পরম বৈষ্ণব, অহিংসা তার ধর্ম, তাই যে সব ঘাসে জীবন আছে, সে সব ঘাসও খায় না, শুকনো ঘাস খায়; কিন্তু এমন বৈষ্ণবের কোমরে আবার তলোয়ার কেন? নারদ তা বুঝতে না পেরে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ আবার কেমন, একদিকে ঘোর অহিংসা, অপরদিকে ঘোর হিংসা, আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না।" ঠাকুর বললেন, "তুমি ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখ না।"

নারদ ঠাকুরের কথামতো বামুনের কাছে গিয়ে বললেন, "আপনি ত জীব হিংসা করেন না, শুকনো ঘাস খান, তবে আবার আপনার কোমরে তলোয়ার কেন?" বামুন বললে, "তিনজনকে কাটবার জন্যে।" নারদ বললেন, "কাকে কাকে?" বামুন বললে, "প্রথম অর্জুন শালাকে।" নারদ বললেন, "কেন?" বামুন বললে, "শালার এত বড় আস্পর্দ্ধা আমার ঠাকুরকে কি না শালা সারথি করে!" নারদ বললেন, "আর কাকে?" বামুন বললে, "আর দ্রৌপদী শালীকে।" নারদ বললেন, "কেন?" বামুন বললে, "শালীর এত বড় আস্পর্দ্ধা যে আমার ঠাকুরকে পাতের এঁটো খাওয়ায়।" নারদ বললেন, "আর কাকে?" বামুন বললে, "আর নারদ শালাকে।" নারদ বললেন, "কেন?" বামুন বললে, "শালার এত বড় আস্পর্দ্ধা যে, দিন নেই রাত নেই যখন তখন আমার ঠাকুরকে জাগায়!" নারদ স্তম্ভিত হলেন, আর বামুনের ভক্তি দেখে নিজের ভক্ত হওয়ার অভিমান ত্যাগ করলেন। (দ্র. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ : সুরেশচন্দ্র দত্ত : পঞ্চদশ সংস্করণ : পৃঃ ৯৯-১০০) এই গল্পটিরই কাছাকাছি রূপান্তর মেলে, সেখানে ভক্তি-অভিমানী কৃষ্ণসখা অর্জুন। (পূর্বগ্রন্থ : পৃঃ ১২৩-১২৪) অবশ্য ভাবতায় ভক্তিসাহিত্যে নারদ চরিত্রটিই সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহু বিচিত্র কাহিনীর উপাদান। নারদের ভক্তি-অভিমানের আর একটি সুন্দর গল্পে সারা

দিনমান কর্মরত এক চাষীর কথা আছে, যে কর্মভারে সকাল-সন্ধ্যা দুটিবার মাত্র হরিনাম করবার সময় পেতো। সদা হরিনামরত নারদ তার মহিমা বুঝে উঠতে না পারলে নারায়ণ তার হাতে তেলভর্তি একটি বাটি দিয়ে গোলোকভ্রমণ করে আসতে বললেন, যেন একটুও তেল না পড়ে যায়। নারদ কাজটি কোনোমতে সমাধা করে ফিরে এলেন। কিন্তু সারাক্ষণ বাটির দিকেই মন ছিল, একবারও নারায়ণকে স্মরণ করতে পারেন নি। ঠাকুর বললেন, "নারদ! একবাটি তেলের ভয়ে তোমার মতো ভক্ত আমাকে ভুলে গেল; আর সে আমার কত বড় ভক্ত বল দেখি, যে প্রকাণ্ড সংসারের ভার মাথায় নিয়েও দিনের মধ্যে তবু দুবার আমায় স্মরণ করেছিল।"

(শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ : পৃঃ ১৫৫-১৫৬)

নারদকে নিয়ে রামকৃষ্ণদেবের গল্পের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মায়ার উদাহরণের গল্পটি। মায়াকে কি দেখা যায়?—এ প্রশ্নের উত্তরে রামকৃষ্ণদেব এ গল্পটি বলেছিলেন। কোনো সময়ে মহর্ষি নারদ বলেছিলেন—"ঠাকুর, তোমার যে অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়া, তা আমাকে দেখাও।" ঠাকুর বললেন, "তথাস্তু"। পরে একদিন নারদকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর বেড়াতে বেরুলেন। অনেকদূর বেড়াতে বেড়াতে ঠাকুরের পিপাসা পেল। ঠাকুর পিপাসায় অস্থির হয়ে পড়লেন এবং বললেন, "নারদ, যেখানে পাও একটু জল এনে আমায় বাঁচাও।" নারদ তাড়াতাড়ি জলের চেষ্টায় গেলেন। কাছে জল নেই, খানিক দূর গিয়ে একটা নদীর মত দেখতে পেলেন। নারদ নদীর কাছে গিয়ে দেখেন, এক পরমাসুন্দরী যুবতী সেখানে বসে আছে। নারদ তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মেয়েটিও নারদ যাওয়ামাত্র সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গে খুব মিষ্টি আলাপ জুড়ে দিলে। অল্পক্ষণের মধ্যে দুজনের প্রণয় হয়ে গেল। নারদ সেইখানে তাকে নিয়ে ঘর সংসার করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে হ'ল। নারদ সেই ছেলেমেয়েগুলিকে নিয়ে সুখে ঘরকন্না করছেন, এমন সময় সেখানে ভয়ানক মড়ক আরম্ভ হ'ল। যেখানে সেখানে লোক মরতে আরম্ভ করল। নারদ সে দেশ থেকে ছেলেমেয়েগুলিকে নিয়ে পালাবার পরামর্শ করলেন। স্ত্রীও তাতে রাজী হ'ল। দুজনে মিলে পুত্রকন্যাদের নিয়ে নদীর সেতুর উপর দিয়ে যেমন যাবার চেষ্টা করছেন, অমনি এক এক করে তাঁর ছেলেমেয়েগুলি ও শেষ পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীও জলমগ্ন হয়ে গেল। নারদ তাদের শোকে আকুল হয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছেন,

এমন সময় ঠাকুর সামনে এসে বললেন, 'কৈ নারদ, জল কৈ ? তুমি কাঁদছই বা কেন ?" ঠাকুরের দর্শন পেয়ে নারদ বিস্মিত হলেন এবং তখন সব ব্যাপার বুঝতে পেরে বললেন, "ঠাকুর, তোমাকে নমস্কার আর তোমার মায়াকে নমস্কার।" (দ্র. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ : পৃঃ ১৭৩-১৭৪) এমন এক একটি গল্পে বীজাকারে উপন্যাসের সম্ভাবনা। নারদেরই মতো তৃষ্ণার জলের অন্বেষণে এসে আমরা সবাই মরীচিকায় মায়াবদ্ধ।

আধ্যাত্মিক আদর্শের উপলব্ধির সহায়তায় এ জাতীয় অজস্র গল্পকথা আমাদের পুরাণসাহিত্যে ছড়ানো রয়েছে। অনেক গল্প হয়তো লোকের মুখে মুখেই গড়ে উঠেছে, আবার অনেক গল্প বাস্তব জীবনের পটভূমিতেই তাদের অলৌকিকতা নিয়ে দেখা দিয়েছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পের মধ্যে 'সর্বমঙ্গলা'র গল্প এবং 'রণজিত রায়ের দিঘি'র গল্প দুটির সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়।

'কথামৃতে' রণজিত রায়ের গল্পটি আছে চতুর্থভাগে ১৩ই জুলাই, ১৮৮৫ তারিখের দিনলিপিতে। সেদিন অন্তরঙ্গ পার্ষদ পূর্ণ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অধ্যাত্ম-রহস্যের কথা বলছিলেন। তাঁর পরিকরদের মধ্যে পূর্ণই শেষতম অন্তরঙ্গ। তাঁর মতে পূর্ণর নারায়ণের অংশে জন্ম। এই কথা হতে হতে বলছেন, "তপস্যার জোরে নারায়ণ সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ও দেশে যাবার রাস্তায় রণজিত রায়ের দীঘি আছে। রণজিত রায়ের ঘরে ভগবতী কন্যা হয়ে জন্মেছিলেন। এখনও চৈত্রমাসে মেলা হয়।" তারপর রণজিত রায়ের ঘরে জগজ্জননী কন্যা হয়ে এসে কেমন করে একদিন কথার ছলে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন এবং যাবার সময় শাঁখারীর কাছে শাঁখা পরে ঘরের কুলুঙ্গি থেকে টাকা নেবার কথা বলে গেলেন—সেই গল্পটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তদের শোনালেন। মেয়ের খোঁজে "রণজিত রায় কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় একজন এসে বললেন যে, দীঘিতে কি দেখা যাচ্ছে। সকলে দীঘির ধারে গিয়ে দেখে যে শাঁখাপরা হাতটি জলের উপরে তুলেছেন। তারপর আর দেখা গেল না। এখনও ভগবতীর পূজা ঐ মেলার সময় হয়—বারুণীর দিনে।" গল্পটি শেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাষ্টারমশাইকে বললেন, "এ সব সত্য।" এ সত্য যেমন আধ্যাত্মিক জগতের, তেমনি ইতিহাসের। ঈশ্বর তো ইতিহাসেরই অন্তরে বাহিরে।

কিন্তু আর একটি গল্প "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশে" সংকলিত রয়েছে, যার

ভাবগত সৌন্দর্য গল্পসাহিত্যের দিক থেকে আমাদের আরো স্মরণীয় বলে মনে হয়। বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে ঈশ্বর যেমন প্রতি মুহূর্তের সান্নিধ্যের বিষয়, ভারতীয় জীবনাদর্শে তেমনি প্রতি মুহূর্তের উপস্থিতিতে ঈশ্বরসত্তার প্রত্যক্ষ স্পর্শ। গ্রাম-বাঙলার জীবনযাত্রায় ঘরের মেয়েকে ঘিরে পিতামাতার যে স্নেহসম্বন্ধ প্রতিটি বছর শারদীয়া পূজার সময় দিব্যসম্বন্ধে রূপান্তরিত হতে থাকে, তারই অমর আলেখ্যরূপে এ গল্পটি চিরস্মরণীয়। অন্য গল্পের তুলনায় বড়ো হলেও এ গল্পটি শ্রীরামকৃষ্ণ-কথাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদরূপে পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করছি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি কামারপুকুরের কাছে কোনো গ্রামে এক দরিদ্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। লোকের বাড়ী বাড়ী চণ্ডীপাঠ করে তাঁর দিন চলতো। সর্বমঙ্গলা নামে তাঁর একটি মেয়ে ছিল, মেয়েটি সুরূপা দেখে একজন জমিদার পুত্রবধূ করে নিয়ে যান। ব্রাহ্মণ একদিন চণ্ডীপাঠ করতে করতে মনে করলেন, "মা! আমি গরীব মানুষ বলে কি তোমার পূজা করতে পাব না? কেবল বড় মানুষেরাই তোমার পূজা করবে?" ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবলেন, যেমন করেই হোক একবার মায়ের পূজো করতেই হবে। ব্রাহ্মণী তাঁর মনের ভাব শুনে সম্মত হলেন এবং সারা বছর চেষ্টা করে তাঁরা দুজনে বারোটি টাকা জমালেন। পূজোর দিন কাছে এলো। ব্রাহ্মণ একটি আধুলি নিয়ে কুমোরবাড়ী গিয়ে বললেন, "বাপু! এই আধুলিটি নিয়ে যেমন হয় একখানি প্রতিমা গড়ে দাও।" কুমার বললে, "ঠাকুরমশায়! আপনি কি পাগল হয়েছেন নাকি? দুর্গাপূজা করবেন, আপনার এমন সামর্থ্য কি?" ব্রাহ্মণ বললেন, "আজ এক বছর ধরে মানস করেছি, এবার মায়ের পাদপদ্মে গঙ্গাজল বিল্বদল দিব, তা বাপু এতে সামর্থ্য আর অসামর্থ্য কি? তুমি এই আট আনায় যেমন হয় একখানা প্রতিমা গড়ে দাও।" কুমোর বললে, "তা ভাল, আপনি আধুলিটি নিয়ে যান, আমি আপনাকে একখানা প্রতিমা গড়ে দেব এখন।" ব্রাহ্মণ বললেন, "না বাপু! তা হবে না, ঐ আট আনায় যেমন হয় তুমি আমায় একখানা প্রতিমা গড়ে দাও।" ব্রাহ্মণ কোনোমতেই আধুলিটি ফিরিয়ে নেবেন না। অগত্যা কুমোর আধুলিটি নিয়ে তাঁকে একখানা ভাল প্রতিমা গড়ে দিলে। ব্রাহ্মণী সর্বমঙ্গলাকে আনবার কথা বললেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ সে কথায় কান দিলেন না। ব্রাহ্মণ ভাবলেন, আমার তো সেরকম পূজো নয় যে, তার শ্বশুরবাড়ী নেমন্তন্ন করি, আর বিশেষ তাঁরা

বড়লোক, নিজেদের বাড়ী পূজা, এ সময় তাঁরা তাকে পাঠাবেই বা কেন? পঞ্চমীর দিন ব্রাহ্মণ প্রতিমা বাড়ীতে আনলেন, এমন সময় ব্রাহ্মণী এসে বললে, "সর্বনাশ হয়েছে, আমি আজ অস্পর্শীয়া হয়েছি, ঠাকুরের কাজ কে করবে?" ব্রাহ্মণ একথা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, কি করবেন কিছুই ঠিক করতে পারছেন না। এমন সময় ব্রাহ্মণী বললে, "তুমি সর্বমঙ্গলাকে নিয়ে এস।" ব্রাহ্মণ অগত্যা সর্বমঙ্গলার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ী তাকে পাঠাতে চাইলে না, তারা বললে, "আমাদের বাড়ীতে পূজো, আর ঐ আমাদের একমাত্র পুত্রবধূ, ওকে এ সময়ে কেমন করে পাঠাবো?" ব্রাহ্মণ সর্বমঙ্গলার সঙ্গে দেখা করলেন, বাপের বিপদের কথা শুনে সে কাঁদতে লাগলো। কিন্তু কি করবে, শ্বশুর-শাশুড়ীর অমতে তো সে যেতে পারে না। ব্রাহ্মণ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তাদের বাড়ী থেকে চলে আসছেন, এমন সময় পথের মাঝে শুনতে পেলেন যে, পেছন থেকে "বাবা বাবা" করে ঠিক সর্বমঙ্গলার মতন কে ডাকছে। ব্রাহ্মণ পেছন পানে চেয়ে ছাখেন যে সর্বমঙ্গলা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসছে। তিনি সেইখানে দাঁড়ালেন, ক্রমে সর্বমঙ্গলা কাছে এসে বললে, "বাবা! আমি এসেছি।" ব্রাহ্মণ আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন, "কাউকে না বলে এলে শেষে কোনো বিপদ হবে না তো?" সর্বমঙ্গলা বললে, "না বাবা! সেজন্য তোমার কোনো চিন্তা নেই।" ব্রাহ্মণ সর্বমঙ্গলাকে বাড়ীতে নিয়ে এলেন, ব্রাহ্মণীও ভারী আনন্দিত। সপ্তমী অষ্টমী মায়ের পূজো হয়ে গেল, নবমীর দিন সকালবেলা সর্বমঙ্গলা বাবাকে বললে, "বাবা, পূজোয় ব্রাহ্মণভোজন করাতে হয় না?" ব্রাহ্মণ বললেন, "নিয়ম বটে, কিন্তু আমি কোথায় পাবো যে বামুন খাওয়াব? তবে মায়ের যদি দয়া হয় তো আগামী বছরে দেখবো।" সর্বমঙ্গলা বললে, "বাবা! আমি তবে পাড়ার লোকদের নিমন্ত্রণ করে আসি?" ব্রাহ্মণ নিষেধ করলেন, কিন্তু সর্বমঙ্গলা সে কথা না শুনে পাড়ার লোকদের সব প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ করে এলো। ফলারের কথা শুনে যথাসময়ে দলে দলে লোক এসে উপস্থিত। লোকের ভীড় দেখে ব্রাহ্মণ ভয় পেয়ে সর্বমঙ্গলাকে নানা তিরস্কার করতে লাগলেন। সর্বমঙ্গলা বললে, "বাবা, ভয় কি? আমি ওদের প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা করবো। জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সেই মা আজ তোমার ঘরে উপস্থিত। তুমি কেন ভয় কর, তিনি কি এই কটি লোককে খাওয়াতে পারবেন না?" পরে সর্বমঙ্গলা বাইরে এসে নিমন্ত্রিত লোকদের বললে,

"আমার বাবা দীনদুঃখী। আপনাদের ষোড়শোপচারে খাওয়ানোর সঙ্গতি তাঁর নেই। তবে মহাপ্রসাদ পাবার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ করে এসেছিলাম, আসুন সকলে মহাপ্রসাদ ধারণ করুন।" সর্বমঙ্গলা মহাপ্রসাদ বের করলে সে প্রসাদ থেকে এমন এক সৌরভ বেরুতে লাগলো যে সবাই মোহিত হয়ে গেল। প্রসাদ থেকে এমন সৌরভ বেরুতে কেউ কখনো দেখে নি বা শোনে নি। সর্বমঙ্গলা একটু একটু প্রসাদ সকলকে দিল, আর সকলের পেট ভরে গেল। পাড়ার লোক আশ্চর্য! প্রসাদ পেয়ে যে যার বাড়ী চলে গেল। ব্রাহ্মণ এতক্ষণ একান্তমনে মা দুর্গাকে স্মরণ করছিলেন। লোকজন চলে যাবার পর চোখ মেলে সর্বমঙ্গলাকে বললেন, "আমায় বুঝি সবাই শাপ দিয়ে গেল?" সর্বমঙ্গলা বললে, "শাপ কেন দেবে বাবা? সবাই প্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে চলে গেল, ঐ দেখ এখনও এত প্রসাদ রয়েছে যে, গ্রামশুদ্ধ লোককে খাওয়ানো যায়।" ব্রাহ্মণ আনন্দিত হয়ে সর্বমঙ্গলার অনেক প্রশংসা করতে লাগলেন। পরদিন বিজয়া। ব্রাহ্মণ মাকে দইকরমা নিবেদন করে চোখ খুলে দেখেন, সর্বমঙ্গলা সে-সব নৈবেদ্য খেতে শুরু করেছে। খুব রেগে গিয়ে ব্রাহ্মণ তখন ব্রাহ্মণীকে ডেকে বললেন, "দেখ দেখ, তোমার মেয়ের বিবেচনা দেখ। হায়, হায়, সর্বনাশ হলো। কাল ভগবতীর কৃপায় ব্রহ্মশাপ থেকে রক্ষা পেয়েছি, আজ আবার তুই এ কি করলি?" সর্বমঙ্গলা একথা শুনে কাঁদতে লাগলো, কিন্তু কোনো উত্তর দিল না। সর্বমঙ্গলার কান্না দেখে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে স্থির হতে বলে আবার দইকরমার আয়োজন করলেন। ব্রাহ্মণ আবার নিবেদন করে দেখেন সর্বমঙ্গলা আগেই সেগুলি খেতে শুরু করেছে। ব্রাহ্মণী তৃতীয়বার দইকরমার আয়োজনের পরেও সর্বমঙ্গলা তা উচ্ছিষ্ট করে দিলে ব্রাহ্মণ আর থাকতে না পেরে সর্বমঙ্গলাকে দূর হয়ে যেতে বললেন। সর্বমঙ্গলা মায়ের কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "বাবা আমাকে দূর হয়ে যেতে বলেছেন। আমি তাহলে যাই। আজ তিনদিন ধরে আমি কিছু খাই নি। এখুনি অনেক দূরে যেতে হবে বলে আর খুব খিদে পেয়েছিল বলে দইকরমা খেয়েছিলাম। বাবা তাতে বিরক্ত হলেন। মা, আমি তাহলে বিদায় হই।" ব্রাহ্মণী তখন আবার দইকরমার আয়োজন করছিলেন, পিছন ফিরে দেখেন সর্বমঙ্গলা নেই। তখন বার বার ডেকেও সর্বমঙ্গলার সাড়া না পেয়ে ব্রাহ্মণকে ডেকে সব কথা বললেন। ব্রাহ্মণ অস্থির হয়ে খোঁজাখুঁজি করলেন, প্রাণ কেঁদে

উঠলো, তাড়াতাড়ি সর্বমঙ্গলার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে মেয়ের সঙ্গে দেখা হতে যখন তার অভিমান ভাঙাতে যাচ্ছেন, তখন মেয়ে বলে উঠলো, "এ সব তুমি কী বলছো বাবা। আমি তোমার বাড়ী কখনই বা গেলাম, কখনই বা দইকরমা খেলাম, আর তুমিই বা কখন আমাকে দূর করে দিলে? আমি তো তার কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি এখানে যেমন ছিলাম, তেমনি রয়েছি।" মেয়ের কথা শুনে ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ সব কথা বুঝতে পেরে বুকে করাঘাত করে মাটিতে অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। পরে চৈতন্য হলে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলতে লাগলেন, "হায়! হায়! কি করলাম, পরম পদার্থ ঘরে পেয়েও চিনতে পারলাম না! হায় মা, কেন আমায় এমন করে বঞ্চনা করলে! আমি অধম, যদি দয়া করে আমার বাড়ী এলে, আমায় 'বাবা' 'বাবা' বলে ডাকলে, তবে মা, কেন আমার চোখটি খুলে দিলে না। আমি তোমার নিত্যরূপ দেখে কৃতার্থ হতাম।" এমনিভাবে বিলাপ করতে করতে বাড়ী এসে ব্রাহ্মণীকে তিনি সব বললেন। ব্রাহ্মণীরও শোকের সীমা রইলো না।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ : পৃঃ ১৬৬-১৭১)

এ গল্পটি 'কথামৃতে'র মতো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীভঙ্গীর যথাযথ অনুসারী না হলেও অনেক পরিমাণে তাঁর গল্প বলার ভঙ্গীটি এতে বজায় রয়েছে। ঈশ্বরের আত্মীয়তা আমাদের জাতীয় জীবনে কতোখানি ভাবসত্য, তার এমন সর্বাঙ্গীণ উদাহরণ সবসময়ই দুর্লভ। সেইসঙ্গে লক্ষণীয়, এ গল্পে বাংলার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সহজ বাস্তবতার মাধ্যমে দিব্যচেতনার আত্মপ্রকাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণকথাসাহিত্যে বাস্তবদৃষ্টি

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পকাহিনীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য মানবচরিত্র পর্যবেক্ষণের অসাধারণ শক্তি। বস্তুত ছোট গল্পের প্রধান গুণ এইখানে। উপকথা বা Fable-জাতীয় কাহিনী থেকে একালের ছোট গল্প অবধি মানবমনের বিভিন্ন স্তর ও বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই গল্পকারদের কৃতিত্বের তারতম্য। অধ্যাত্মরাজ্যের দিশারীরা মানুষের মনের রহস্য যতটা তলিয়ে বোঝেন, তেমন গভীরতায় যাবার শক্তি সাধারণ গল্পলেখকদের কাছে প্রত্যাশিত নয়, এমন কি

অসাধারণ লেখকরাও মানবমানসের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে যে পরমসত্যের ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে, তা লক্ষ্য করতে পারেন খুব কম ক্ষেত্রেই। মানুষের মনোজগতের রহস্য-অনুধাবনের ওই চিত্তচমৎকার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনেক গল্পের প্রাণবস্তু।

অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার উদ্দেশ্যেই তাঁর গল্প বলা। তবু মাঝে মাঝে এমন গল্পেরও উদাহরণ মেলে যেখানে বাস্তব মানুষের মনের গোপন কোণের সংবাদও তাঁর বিশ্লেষণের অসামান্যতায় নির্মমভাবে অনাবৃত হয়ে পড়ে। চরিত্রবিশ্লেষণের এই অমোঘ দৃষ্টিসন্ধানের সঙ্গে এসে মেশে তাঁর ছদ্মবেশহীন প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য। এমন অনেক তথাকথিত গ্রাম্য, অশালীন বা অনুচ্চার্য শব্দ—যা এখনকার বাস্তববাদী সাহিত্যিকেরা তাঁদেরই বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন—সে সব শ্রীরামকৃষ্ণদেব অনায়াসে ব্যবহার করে গেছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর দুঃসাহস তাঁর সরল জীবনবোধেরই আর এক প্রকাশভঙ্গিমা। নীতিবাগীশেরা যেখানে রূঢ় সত্যকে প্রচ্ছন্ন রেখে প্রকাশের পক্ষপাতী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শব্দ বা উপমাব্যবহার সেখানে একেবারে অকুণ্ঠিত, দ্বিধাহীন এবং সেই কারণে নির্ভীক, অথচ মানবমানসের অধ্যাত্মরূপান্তরের প্রেরণায় ব্যবহৃত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমাব্যবহার সম্বন্ধে সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছিলেন, "এমন কি, যে সব কথা আমরা সমাজে বলতে কিন্তু কিন্তু করি, পরমহংসদেব সর্বজনসমক্ষে অক্লেশে সেগুলি বলে যেতেন। ভগবানকে পেতে হলে কি ধরনের 'বেগে'র প্রয়োজন যে সম্বন্ধে তাঁর তুলনাটি উল্লেখ নাইবা করলুম।"* এই উপমার উদাহরণটিকে অবলম্বন করেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পকথাগুলির বাস্তবজীবনদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাক।

ভক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অধ্যাত্মপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন—"...সময় না হলে কিছু হয় না। একটি ছেলে শুতে যাবার সময় মাকে বলেছিল, মা আমার যখন হাগা পাবে আমাকে তুলিও। মা বললেন, বাবা, হাগাতেই তোমাকে তোলাবে, আমায় তুলতে হবে না।"

ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতা জাগাও যে ঈশ্বরের কৃপাসাপেক্ষ এবং সময় না হলে তা হয় না একথাটি এই একান্ত গ্রাম্য উপমায় বলার দুঃসাহস তথাকথিত

---

* সৈয়দ মুজতবা আলীর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শিক্ষিতসমাজে রুচিবাগীশদের কাছে আশাই করা যেত না। এই সঙ্গে আর একটি গল্পও বলছেন,—"যাকে যা দেবার তাঁর সব ঠিক করা আছে। সরার মাপে শাশুড়ী বৌদের ভাত দিত। তাতে ভাত কিছু কম হ'তো। একদিন সরাখানি ভেঙে যাওয়াতে বৌরা আহ্লাদ করছিল। তখন শাশুড়ী বললেন, "নাচ কোঁদ বৌমা, আমার হাতের আটকেল ঠিক আছে।" (কথামৃত : ৩য় : ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩) এই সেই সময়মতো উপলব্ধির প্রশ্ন, তার আগে কিছু হবার নয়।

কখনো আপন অভিজ্ঞতা থেকে কখনো লোকপ্রচলিত প্রবাদ বা গল্পকাহিনী থেকে আপন বক্তব্য উপস্থাপনের এক সহজ ভঙ্গিমা আয়ত্ত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, যা বক্তব্যের তীব্রতায় মাঝে মাঝে উদ্দিষ্ট পক্ষকে সম্পূর্ণ স্তম্ভিত করে দিতে পারতো। উপরের গল্পটিতে কৃপণ শাশুড়ীর উপমায় ঈশ্বরের কৃপাও যে প্রত্যেকের নিজস্ব মানসপরিণতিসাপেক্ষ তা যেমন ফুটেছে, আর একটি গল্পে তেমনি একনিষ্ঠতার আদর্শ। নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির প্রসঙ্গে একদিন ভক্ত অধর সেনের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—"এক ঈশ্বরের দাস—আবার কার দাস হবো ?" অধর তখন ডেপুটির কাজ করে তিনশো টাকা মাইনে পান। মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান হলে হাজার টাকা মাইনে হবে, সেই চেষ্টায় আছেন। এমন কি রামকৃষ্ণদেবকে দিয়ে জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা করানো পর্যন্ত হয়েছে। রামকৃষ্ণদেব সেই প্রসঙ্গে বলছেন, "আমি মাকে একটু বলেছিলাম—'মা, এ তোমার কাছে আনাগোনা কচ্ছে, যদি হয় হোক না।' কিন্তু সেই সঙ্গে মাকে বলেছিলুম—'মা, কি হীনবুদ্ধি! জ্ঞান ভক্তি না চেয়ে তোমার কাছে এইসব চাচ্ছে।' (অধরের প্রতি) 'কেন হীনবুদ্ধি লোকগুলোর কাছে অত আনাগোনা করলে? এত দেখলে শুনলে।'

এর পরেই উদাহরণস্বরূপ এমন একটি গল্প শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন যার ব্যঙ্গের তীব্রতা ও প্রকাশভঙ্গীর শাণিত ঝলক শ্রোতার মর্ম বিদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট—

"যার কর্ম কচ্ছো, তারই করো। একজনের চাকরী কল্লেই মন খারাপ হয়ে যায়, আবার পাঁচ জনের।"

"একজন স্ত্রীলোক একজন মুসলমানের উপর আসক্ত হয়ে তার সঙ্গে আলাপ করার জন্য ডেকেছিল। মুসলমানটি সাধুলোক ছিল, সে বল্লে আমি প্রস্রাব করবো, আমার বদনা আনতে যাই। স্ত্রীলোকটি বল্লে,—তা এখানেই হবে,

আমি বদনা দিব এখন। সে বল্লে, তা হবে না। আমি যে বদনার কাছে একবার লজ্জা ত্যাগ করেছি, সেই বদনাই ব্যবহার করবো,—আবার নূতন বদনার কাছে নির্লজ্জ হবো না। এই বলে সে চলে গেল। মাগীটারও আক্কেল হলো। সে বদনার মানে বুঝলে উপপতি।"

(কথামৃত : ৪র্থ : ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪)

উপযুক্ত স্থানে এ.সব গল্প-ব্যবহারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দক্ষতার উদাহরণ হিসাবে এ গল্পটি যেমন স্মরণীয়, তেমনি লক্ষণীয় ভাষাব্যবহারে তাঁর নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা সত্ত্বেও গল্পটির ব্যঞ্জনাধর্মিতা। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মানুষের ক্ষেত্রে এ গল্প ব্যঙ্গৌষধের মাধ্যমে আত্মস্থতায় সহায়ক, অসাব সংসারের বহু কর্মজালে বিজড়িত হয়ে সত্যসন্ধানের বৃথা চেষ্টা সম্বন্ধেও সাবধানী সংকেত।

সংসারে সবচেয়ে বড়ো দুটি বন্ধন কামকাঞ্চন সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাবধানবাণী 'কথামৃতে' বারংবার উচ্চারিত। একালের ফ্রয়েড বা মার্কস্-অনুগামীরা এ জাতীয় সাবধানবাণী সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সন্দিহান। তাঁদের দৃষ্টিতে এ বন্ধনে আবদ্ধ থাকাই মানবসত্তার শেষ কথা। অপরপক্ষে সর্ববন্ধনমুক্তির যে বাণী আধ্যাত্মিকতার প্রথম সর্ত, সে সম্বন্ধে সবচেয়ে কঠিন দুটি অন্তরায় মানুষের অর্থ ও কামের বাসনা। স্বভাবতঃই বেশীর ভাগ সংসারেই কর্তার কর্তৃত্ব বিশেষভাবে কর্ত্রীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থ বা সম্পদের আকাঙ্ক্ষা সংসারে ক্রমাগত বেড়েই চলে। বাইরে যত ক্ষমতাবান পুরুষই হোক না কেন, স্ত্রীর হুকুমে বা এ জাতীয় কোনো সম্বন্ধের হুকুমে পরিচালিত হন না, এমন মানুষ লাখের মধ্যে এক। অর্থকামনা বাড়তে বাড়তে মানুষ অনেক সময় মনে করে ঐশ্বর্য দিয়ে বুঝি ঈশ্বরকেও বশ করা যায়!

অধিকাংশ সংসারে মানুষ যে কামিনীর দাস একথাটি একালের রুচিতে একটু আত্মসম্মানে বাধলেও আত্মবিশ্লেষণের পক্ষে সহায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্প থেকে পত্নীপ্রাণ ব্যক্তির উদাহরণটি পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করি—শিষ্যের কাপড়ের দোকান আছে। গুরুর পুঁথি বাঁধবার জন্য টুকরো ছিটের দরকার। শিষ্যকে একথা জানালে শিষ্য, 'তাই তো, তাই তো, আগে বললে হতো, এই গিয়ে সেদিন একটা টুকরো পড়েছিল, তা অমুককে দিলাম'—এইসব নানান ওজর আপত্তি করে শেষে বললে, 'তা এবার টুকরো পড়লে আপনার জন্য রেখে দেব। আপনি মাঝে মাঝে এসে সংবাদ নেবেন।' গুরু অগত্যা তাতেই রাজী হলেন।

ওদিকে শিষ্যের স্ত্রী বাড়ীর ভিতর থেকে সব কথা শুনছিল। গুরুদেবকে চলে যেতে দেখে সে লোক দিয়ে তাঁকে বাড়ীর মধ্যে ডেকে পাঠালে। গুরু বাড়ীর ভিতরে এলেন। শিষ্যের স্ত্রী বললে, "কর্তার কাছে আপনি কি চাচ্ছিলেন?" গুরু সব কথা খুলে বললেন। সে বললে, "তা আপনি যান, কাল আপনার বাড়ী ছিট পাঠিয়ে দেব।" তথাস্তু বলে গুরুদেব চলে গেলেন।

রাতে শিষ্য দোকান বন্ধ করে ঘরে এলে পর তার স্ত্রী বললে, "তুমি কি দোকান বন্ধ করে এসেছ না কি?" শিষ্য বললে, "হ্যাঁ, কেন?" স্ত্রী বললে, "তবে তুমি এখনি ফিরে গিয়ে আমার জন্য ভাল দেখে দুখানি ছিট্ আনো।" শিষ্য বললে, "তার আর কি, আমি কাল তোমায় খুব ভাল দু'খানি ছিট দেব।" স্ত্রী বললে, "তা হবে না, এখনি আন।" স্বামী বললে "আমি শপথ করছি, কাল সকালে তোমায় ছিট দেবোই দেবো।" স্ত্রী বললে, "তা হবে না। আমায় এখনি দাও।" স্বামী কি করে, এতো গুরু নয় যে মধ্যে মধ্যে এসে সংবাদ নিতে বলবে, এ যে গুরুর গুরু মহাগুরু, তার কথা উপেক্ষা করা যায় না। অগত্যা সেই রাতে ফের দোকান খুলে ছিট নিয়ে এলো। স্ত্রী সেই দু'খান ছিট গুরুকে পাঠিয়ে দিয়ে বললে, "আপনার যা দরকার হবে, আমায় বলবেন।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ : সুরেশচন্দ্র দত্ত : পৃঃ ১৬-১৭)

স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যবোধ আর ইন্দ্রিয়সুখের দাসত্ব—এ দুই যে এক কথা নয়, একথা বুঝবার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই থাকে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই— 'এই কামিনীকাঞ্চনই আবরণ।' সাধারণ সংসারীদের বর্ণনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তাই মন্তব্য—"সকলেই দেখি মেয়েমানুষের বশ।···টাকাকড়ি সর্বস্ব মাগের হাতে! আবার বলা হয়, 'আমি দুটো টাকাও আমার কাছে রাখতে পারি না—কেমন আমার স্বভাব! বড়বাবুর হাতে অনেক কম, কিন্তু করে দিচ্ছে না। একজন বল্লে, 'গোলাপীকে ধর, তবে কর্ম হবে।' গোলাপী বড়বাবুর রাঁড়।" (কথামৃত : ৪র্থ : ২৫শে মে ১৮৮৪)

গোলাপীর গল্পটি বিস্তৃতভাবে আছে কথামৃতের তৃতীয় ভাগে। সেদিনের অন্যতম শ্রোতা গিরিশচন্দ্র। (কথামৃত : ৩য় . ১২ই এপ্রিল, ১৮৮৫)

"একজন উমেদার বড়বাবুর কাছে আনাগোনা করে হয়রান হয়েছে। কর্ম আর হয় না। অফিসের বড়বাবু, তিনি বলেন, এখন খালি নাই, মাঝে মাঝে এসে দেখা করো। এইরূপে কতকাল কেটে গেল—উমেদার হতাশ হয়ে গেল।

সে একজন বন্ধুর কাছে দুঃখ করছে। বন্ধু বললে, তোর যেমন বুদ্ধি।—ওটার কাছে আনাগোনা করে পায়ের বাঁধন ছেঁড়া কেন? তুই গোলাপকে ধর, কালই তোর কর্ম হবে। উমেদার বললে, বটে!—আমি এক্ষণি চললুম। গোলাপ বড়বাবুর রাঁড়। উমেদার দেখা করে বললে, মা তুমি এটি না করলে হবে না—আমি মহা বিপদে পড়েছি। ব্রাহ্মণের ছেলে আর কোথায় যাই! মা, অনেকদিন কাজকর্ম নাই, ছেলেপুলে না খেতে পেয়ে মারা যায়। তুমি একটি কথা বলে দিলেই আমার একটি কাজ হয়। গোলাপ ব্রাহ্মণের ছেলেকে বললে, 'বাছা, কাকে বললে হয়?' আর ভাবতে লাগলো, আহা, ব্রাহ্মণের ছেলে বড় কষ্ট পাচ্ছে! উমেদার বললে, বড়বাবুকে একটি কথা বললে আমার নিশ্চয় একটি কর্ম হয়। গোলাপ বললে, আমি আজই বড়বাবুকে বলে ঠিক করে রাখবো। তারপর দিন সকালে উমেদারের কাছে একটি লোক গিয়ে উপস্থিত। সে বললে, তুমি আজ থেকেই বড়বাবুর অফিসে বেরুবে। বড়বাবু সাহেবকে বললে, 'এ ব্যক্তি বড় উপযুক্ত লোক। একে নিযুক্ত করা হয়েছে, এর দ্বারা অফিসের বিশেষ উপকার হবে।'

গল্পটির শেষে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন—"এই কামিনীকাঞ্চন নিয়ে সকলে ভুলে আছে। আমার কিন্তু ওসব কিছু ভাল লাগে না—মাইরি বলছি, ঈশ্বর বই আর কিছুই জানি না।" মায়াবদ্ধ সংসারী মানুষের ছবিটি কিন্তু বড়বাবু ও গোলাপীর কাহিনীতে অসামান্য বাস্তবতায় পরিস্ফুট। এ গল্পের নিহিত ব্যঙ্গে মানবচরিত্রের যথার্থ পরিচয়টি ফোটানোই উদ্দেশ্য। পরিবেশননৈপুণ্যে, বর্ণনাকৌশলে এবং যথাস্থানে পরিসমাপ্তিতে এ গল্পের মধ্যে একটি নিটোল ছোট গল্পের স্বাদ আছে।

কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাপ্রসঙ্গে অনেকগুলি অপূর্ব উপমা ও রঙ্গব্যঙ্গের উদাহরণ মেলে। কামিনীকাঞ্চন প্রসঙ্গে তাঁর আর একটি গল্প কেশবচন্দ্রের কাছেই বলা। তার বিবরণ পাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজস্ব জবানবন্দীতে—"কেশব একদিন এসেছিল; রাত দশটা পর্যন্ত ছিল। প্রতাপ আর কেউ কেউ বললে, আজ থেকে যাব; সব বটতলায় (পঞ্চবটীতে) বসে। কেশব বললে, না কাজ আছে, যেতে হবে।

"তখন আমি হেসে বললাম, আঁষচুপড়ীর গন্ধ না হলে কি ঘুম হবে না? একজন মেছুনী মালীর বাড়িতে অতিথি হয়েছিল, মাছ বিক্রী করে আসছে; চুপড়ী হাতে আছে। তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়া হলো। অনেক রাত

পর্যন্ত ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না ; বাড়ীর গিন্নী সেই অবস্থা দেখে বললে, কিগো তুই ছটফট করছিস কেন ? সে বললে, কে জানে বাবু, বুঝি এই ফুলের গন্ধে হচ্ছে না ; আমার আঁষচুবড়ী আনিয়ে দিতে পার ? তাহলে বোধহয় ঘুম হতে পারে। শেষে আঁষচুবড়ী আনাতে জল ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেখে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতে লাগল।

"গল্প শুনে কেশবের দলের লোকেরা হো হো করে হাসতে লাগল।"

(কথামৃত : ৫ম : ২৪শে মে, ১৮৮৪)

মানুষের মন যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় ধোপাঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপানো যায়, সেই রঙই ধরে,[১] সেকথা আমাদের চারপাশের মানুষদের প্রতিদিনের তুচ্ছ বিষয়বস্তুর রোমন্থন লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। রুচির সূক্ষ্মতা যেমন সংস্কারসাপেক্ষ, মননের সমুন্নতি তেমনি সাধনার অপেক্ষা রাখে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের মন দেহগত ভূমিতেই থাকে বলে মননগত বা বোধগত জগতের আনন্দসত্যকে উপলব্ধি করতে পারি না। আবার যখন পারি, তখন সে আনন্দের তুলনায় আর সব আনন্দ, 'আলুনি' বোধ হতে থাকে।

প্রসঙ্গতঃ সর্বভাবের সমন্বিত স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপন বৈশিষ্ট্যটি যে গল্পে রূপকের আকারে ফুটিয়ে তুলেছেন, সেই গল্পটি স্মরণ করা যেতে পারে। শেষ অসুস্থতার সময় তিনি যখন শ্যামপুকুরে রয়েছেন, সেইসময় একদিন (২২শে অক্টোবর, ১৮৮৫) কথাপ্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ গল্পটি বলেছিলেন। সেদিন সাকার-নিরাকার-প্রসঙ্গে কথা হতে তিনি বললেন—"তিনি সাকার আবার নিরাকার।···কিন্তু এটি ধারণা করা বড় শক্ত।"···"ঈশ্বরকে লাভ না করতে পারলে, এ সব বুঝা যায় না। সাধকের জন্য তিনি নানাভাবে নানারূপে দেখা দেন। একজনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড় রঙ করতে আসতো। সে লোকটি জিজ্ঞাসা করতো তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও। একজন হয়তো বললে, 'আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই।' তখনি সেই লোকটি সেই গামলার রঙে সেই কাপড়খানি ছুপিয়ে বলতো, 'এই লও তোমার লাল রঙে ছোপানো কাপড়।' আর একজন হয়তো বললে, 'আমার হলদে রঙে ছোপানো কাপড় চাই।' অমনি সেই

১ "মন ধোপাঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যায়। মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে মিথ্যার রঙ ধরে যাবে।"—কথামৃত : ১ম : ২৯শে মার্চ. ১৮৮৩

লোকটি সেই গামলায় কাপড়খানি ডুবিয়ে বললে, 'এই লও তোমার হলদে রঙে ছোপানো কাপড়।' এই রকমে যে যে রঙে ছোপাতে চাইতো, তার কাপড় সেই রঙে সেই একই গামলা হতে ছোপানো হ'ত। একজন লোক এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখছিল। যার গামলা সে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেমন হে! তোমার কি রঙে ছোপাতে হবে?' তখন সে বললে, 'ভাই! তুমি যে রঙে রঙেছ, আমায় সেই রঙ দাও।' (সকলের হাস্য)।

এই গল্পটির পাশাপাশিই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর বহুখ্যাত 'বহুরূপীর' গল্পটি বলেছিলেন।[১] পরমসত্যের নানাভাবে ও রূপে আত্মপ্রকাশের উদাহরণরূপে এ গল্প দুটি যেমন স্মরণীয়, তেমনি আমাদের যে মন সেই সত্যকে গ্রহণ করে অথবা করতে চায় না সেই মনের দিক থেকেও এ গল্প দুটির তাৎপর্য রয়েছে। তাঁর ভাষায়—'মন নিয়ে কথা। মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত।'

(কথামৃত : ১ম : ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২)

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথাসাহিত্যে ঈশ্বরতন্ময়তা

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সব কথা, উপমা, গল্প শেষ অবধি ঈশ্বরাভিমুখী। এই ঈশ্বরোপলব্ধির প্রত্যক্ষ উপস্থাপনায় তাঁর জীবন ও বাণীর বিশিষ্টতা। তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমাদেরও কাছে অন্ততঃ সেই মুহূর্তগুলি ঈশ্বরময় হয়ে যায়। এমন নিয়ত ঈশ্বরসান্নিধ্য বহুজন্মের বাঞ্ছিত ফল, তবু 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে' সেই বাঞ্ছিত ফল এক জন্মেই আমাদের সামনে সযত্নে বিন্যস্ত। প্রয়োজন শুধু এই সান্নিধ্যলাভের সচেতনতা।

ঈশ্বরলাভের জন্য কতখানি ব্যাকুলতার প্রয়োজন, কথামৃতের নানা গল্প তার অপূর্ব সব উদাহরণ। তার মধ্যে সবার আগে যে গল্পটির কথা মনে পড়ে, তার নাম দেওয়া চলে 'স্বাতী নক্ষত্রের জল।' আন্তরিক ব্যাকুলতার বশে যে সব যোগাযোগই ঘটে যেতে পারে, (দিলীপকুমার রায়ের 'অঘটন আজো ঘটে' স্মরণীয়) সেই অসম্ভবকে অনায়াসসম্ভব করে তোলার উদাহরণরূপে এই গল্পটি বলেছিলেন—

"কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, মশায়, ঈশ্বর কেন এমন সংসার

---

১ কথামৃত : ১ম : ২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২

করলেন? আমাদের কি কোনও উপায় নাই? আমি বলি, উপায় থাকবে না কেন? তাঁর শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকূল হাওয়া বয়,—যাতে শুভযোগ ঘটে। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেন।

"একজনের ছেলেটি যায় যায় হয়েছিল। সে ব্যক্তি ব্যাকুল হয়ে এর কাছে ওর কাছে উপায় জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছে! একজন বললে, তুমি যদি এইটি যোগাড় করতে পারো তো ভাল হয়, স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়বে মড়ার মাথার খুলির উপর; সেই জল একটি ব্যাঙ খেতে যাবে। সেই ব্যাঙকে একটি সাপে তাড়া করবে। ব্যাঙকে কামড়াতে গিয়ে সাপের বিষ মড়ার মাথার খুলিতে পড়বে, আর সেই ব্যাঙটি পালিয়ে যাবে। সেই বিষজল একটু করে রোগীকে খাওয়াতে হবে।

লোকটি অমনি ব্যাকুল হয়ে সেই ঔষধ খুঁজতে স্বাতী নক্ষত্রে বেরুল। এমন সময়ে বৃষ্টি হচ্ছে। তখন ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরকে বলছে, ঠাকুর! এইবার মড়ার মাথা জুটিয়ে দাও। খুঁজতে খুঁজতে দেখে, একটি মড়ার খুলি, তাতে স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়েছে; তখন সে আবার প্রার্থনা করে বলতে লাগল, দোহাই ঠাকুর! এইবার আর কটি জুটিয়ে দাও—ব্যাঙ ও সাপ। তার যেমন ব্যাকুলতা তেমনি সব জুটে গেল। দেখতে দেখতে একটি সাপ ব্যাঙকে তাড়া করে আসছে, আর কামড়াতে গিয়ে তার বিষ ঐ খুলির ভিতর পড়ে গেল।

ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন—সব সুযোগ করে দেবেন।" (কথামৃত: ৩য়: ১৩ই জুন, ১৮৮৫)

এ জাতীয় যোগাযোগের আকস্মিকতা সাধারণভাবে আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত জগতে ঘটে না বটে, তবু মাঝে মাঝে আমরাও বাস্তবজীবনে এমন সব ঘটনাপরম্পরার সঙ্গে পরিচিত হই, যাকে শুধুমাত্র হঠাৎ ঘটে যাওয়ার ব্যাখ্যায় পাওয়া কঠিন। তখনই ভাগ্য বা ভগবানের প্রশ্ন। আবার যে মানুষ সচেতনভাবে ঈশ্বরলাভের জন্যই তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকছে, তিনি যে তার বন্ধনপাশ খুলে দেবার সহায়তা করবেন, এও আশ্চর্য নয়, তবে আমাদের সাধারণ বিশ্বাসে তা সহজে স্বীকৃত হতে চায় না। আবার ঘটনা যখন একের পর এক ঘটতে থাকে তখন তা স্বমহিমায় ভাস্বর—কোনো ব্যাখ্যাই তখন আর তার তাৎপর্য বোঝাবার জন্য দরকার নেই।

স্বাতী নক্ষত্রের জলের মতো অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য যে একান্ত বিশ্বাসের

প্রয়োজন—শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই বিশ্বাস ও ব্যাকুলতার উপরে জোর দিয়েছেন বারংবার। বলেছেন, "বালকের মত বিশ্বাস। বালক মাকে দেখবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যকুলতা। এই ব্যাকুলতা হল তো অরুণ উদয় হল। তারপর সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরদর্শন।"

সূর্যোদয়ের উপমায় অভিষিক্ত এমন ঈশ্বরাবির্ভাবের উদাহরণ তিনি নানা গল্পে দিয়েছেন। অকালে বিধবা যে মেয়েটি গোবিন্দকে স্বামীরূপে পেয়েছিল, যে ছোট ছেলেটি ঠাকুরের ভোগ দিতে গিয়ে একান্ত ব্যাকুলতায় ঠাকুরের দর্শন পেয়েছিল, যে লোকটি নিজের পোষা ভেড়াটিকেই নারায়ণজ্ঞানে সেবা করে ইষ্টদর্শন করেছিল—এমনি কতো গল্প! তবু মধুসূদন দাদার গল্পটিই সবচেয়ে মন হরণ করে।

"জটিল বালকের কথা আছে। সে পাঠশালে যেত। একটু বনের পথ দিয়ে পাঠশালে যেতে হতো, তাই সে ভয় পেত। মাকে বলাতে মা বললে, তোর ভয় কি? তুই মধুসূদনকে ডাকবি। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলে, মধুসূদন কে? মা বললে, মধুসূদন তোর দাদা হয়। তখন একলা যেতে যেতে যাই ভয় পেয়েছে, অমনি ডেকেছে, 'দাদা মধুসূদন'। কেউ কোথাও নাই। তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগল, 'কোথায় দাদা মধুসূদন, তুমি এসো আমার বড় ভয় পেয়েছে।' ঠাকুর তখন থাকতে পারলেন না। এসে বললেন, 'এই যে আমি, তোর ভয় কি?' এই বলে সঙ্গে করে পাঠশালার রাস্তা পর্যন্ত পৌছে দিলেন, আর বললেন, 'তুই যখন ডাকবি, আমি আসবো। ভয় কি?' এই বালকের বিশ্বাস। এই ব্যাকুলতা!" [কথামৃত : ২য় : ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩]

ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতাকে তিন টানের সঙ্গে তুলনা করে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, "তিন টান এক সঙ্গে হলে তবে তাঁকে লাভ করা যায়। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পতিতে টান, আর মায়ের সন্তানেতে টান। এই তিন ভালবাসা একসঙ্গে করে কেউ যদি ভগবানকে দিতে পারে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হয়।" গল্পের আকারে এই ব্যাকুলতাকে ফুটিয়েছেন—"শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন করে ভগবানকে পাবো। গুরু বললেন, আমার সঙ্গে এসো,—এই বলে একটা পুকুরে লয়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধরলেন। খানিক পরে জল থেকে উঠিয়ে আনলেন ও বললেন, তোমার জলের ভিতর কি রকম হয়েছিল? শিষ্য বললে, প্রাণ আটুবাটু করছিল—যেন প্রাণ যায়। গুরু

বললেন দেখ, এইরূপ ভগবানের জন্য যদি তোমার প্রাণ আটুবাটু করে তবেই তাঁকে লাভ করবে।" [কথামৃত : ৩য় : ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩] সেদিন স্টার-থিয়েটারে 'প্রহ্লাদচরিত্র' দর্শনান্তে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথন চলেছিল। গিরিশচন্দ্রের অন্তরময় ব্যাকুলতার উদ্বোধনই হয়তো এ প্রসঙ্গের লক্ষ্য।

ঈশ্বরতন্ময় ভক্তের আচরণ—'আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি যেমন করান, তেমনি করি। যেমন বলান, তেমনি বলি।' 'ঝড়ের এঁটো পাতা কখনও উড়ে ভাল জায়গায় গিয়ে পড়ল, কখনও বা ঝড়ে নর্দমায় গিয়ে পড়ল—ঝড় যে দিকে লয়ে যায়।' [কথামৃত : ৪র্থ : ১লা জানুয়ারী, ১৮৮৩] এমন ঈশ্বর-পরায়ণতার আদর্শ তাঁর চলায় বলায় স্মরণে মননে প্রতি মুহূর্তে ফুটে উঠতো। 'কথামৃতে'র অনেক ছোট বড় গল্পে এই একান্ত শরণাগতির ভাবচিত্র জীবন্ত রূপায়িত। এর মধ্যে 'রামের ইচ্ছা' নামে যে গল্পটিকে চিহ্নিত করা যায়, সেটি একই সঙ্গে সাধনা ও সাধ্য।

কথামৃতের প্রথম খণ্ডে (২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪) গল্পটি এইভাবে দেখা দিয়েছে—"সংসারে রেখেছেন তা কি করবে? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করো—তাঁকে আত্মসমর্পণ করো। তা হলে আর কোনো গোল থাকবে না। তখন দেখবে, তিনিই সব করছেন। সবই রামের ইচ্ছা।"

একজন ভক্ত—'রামের ইচ্ছা' গল্পটি কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—"কোনো এক গ্রামে একটি তাঁতী আছে। বড় ধার্মিক, সকলেই তাকে বিশ্বাস করে আর ভালবাসে। তাঁতী হাটে গিয়ে কাপড় বিক্রী করে। খরিদ্দার দাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, রামের ইচ্ছা, সুতার দাম এক টাকা, রামের ইচ্ছা মেহন্নতের দাম চারি আনা, রামের ইচ্ছা, মুনাফা দুই আনা। কাপড়ের দাম রামের ইচ্ছায় এক টাকা ছয় আনা! লোকের এত বিশ্বাস যে, তৎক্ষণাৎ দাম ফেলে দিয়ে কাপড় নিত। লোকটি ভারী ভক্ত, রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পরে অনেকক্ষণ চণ্ডীমণ্ডপে বসে ঈশ্বর চিন্তা করে, তাঁর নামগুণ কীর্তন করে। একদিন অনেক রাত হয়েছে, লোকটির ঘুম হচ্ছে না; বসে আছে, এক একবার তামাক খাচ্ছে, এমন সময় সেই পথ দিয়ে একদল ডাকাত ডাকাতি করতে যাচ্ছে। তাদের মুটের অভাব হওয়াতে ঐ তাঁতীকে বললে, আয় আমাদের সঙ্গে—এই বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো। তারপর একজন গৃহস্থের বাড়ি গিয়ে

ডাকাতি করলে। কতকগুলো জিনিষ তাঁতীর মাথায়, এমন সময় পুলিশ এসে পড়লো। ডাকাতেরা পালালো, কেবল তাঁতীটি মাথায় মোট. ধরা পড়লো। এক রাত্রি তাকে হাজতে রাখা হলো। পরদিন ম্যাজিষ্ট্রার সাহেবের কাছে বিচার। গ্রামের লোক জানতে পেরে সব এসে উপস্থিত। তাঁরা সকলে বললে, হুজুর! এ লোক কখনও ডাকাতি করতে পারে না। সাহেব তখন তাঁতীকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি গো তোমার কি হয়েছে বল।' তাঁতী বললে, 'হুজুর! রামের ইচ্ছা আমি বাড়িতে ভাত খেলুম। তারপর রামের ইচ্ছা, আমি চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছি, রামের ইচ্ছা, অনেক রাত হলো। আমি, রামের ইচ্ছা, তাঁর চিন্তা করছিলাম, আর তাঁর নামগুণ গান করছিলাম। এমন সময়ে রামের ইচ্ছা, একদল ডাকাত সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, রামের ইচ্ছা, তারা আমায় টেনে লয়ে গেল। রামের ইচ্ছা, তারা এক গৃহস্থের বাড়ি ডাকাতি করলে। রামের ইচ্ছা, আমার মাথায় মোট দিলে। এমন সময় রামের ইচ্ছা পুলিশ এসে পড়লো। রামের ইচ্ছা, আমি ধরা পড়লুম। তখন রামের ইচ্ছা পুলিশের লোকেরা হাজতে দিল। আজ সকালে, রামের ইচ্ছা হুজুরের কাছে এনেছে।

"অমন ধার্মিক লোক দেখে, সাহেব তাঁতীটিকে ছেড়ে দিবার হুকুম দিলেন। তাঁতী রাস্তায় বন্ধুদের বললেন, রামের ইচ্ছা, আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।"— উপসংহারে রামকৃষ্ণদেবের মন্তব্য—'তাঁর উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারের কাজ কর।'

এমন ঈশ্বরতন্ময় যাঁরা, তাঁরা কি ঈশ্বর ছাড়া আর কারু কাছে চাইতে পারেন? সামান্যতম উপকরণ থেকে অর্থ, কাম, মান, যশ—সবকিছুর জন্যই মানুষের নিরন্তর আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের পক্ষে জীবনের সব প্রয়োজনই একমাত্র ঈশ্বরের দ্বারা মিটতে পারে। আর কারুর দ্বারা নয়। চাতক পাখীর মতো তাঁদের কেবল মেঘের কাছেই জলের প্রার্থনা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায়—"দেবার সেই ঈশ্বর! শাশুড়ী বললে, আহা বৌমা, সকলেরই সেবা করবার লোক আছে, তোমার কেউ পা টিপে দিত বেশ হতো। বউ বললে, ওগো আমার পা হরি টিপবেন। আমার কারুকে দরকার নাই। সে ভক্তিভাবে ঐ কথা বললে।"

এরপর আকবর বাদশার গল্পটিতে একমাত্র ঈশ্বরের কাছে চাওয়ার উদাহরণটি অনবদ্য ভঙ্গিমায় দেখা দিলো—"একজন ফকির আকবর শার কাছে কিছু টাকা

আনতে গিছলো। বাদশা তখন নমাজ পড়ছে আর বলছে, হে খোদা! আমায় ধন দাও, দৌলত দাও। ফকির তখন চলে আসবার উপক্রম করলে। কিন্তু আকবর শা তাকে বসতে ইশারা করলেন। নমাজের পর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন চলে যাচ্ছিলে। সে বললে, আপনিই বলছিলেন, ধন দাও, দৌলত দাও। তাই ভাবলাম, যদি চাইতে হয়, ভিখারীর কাছে কেন? খোদার কাছে চাইবো।"

আবার শ্রেষ্ঠ সাধুর উদাহরণে বলছেন—'তারা 'অজগর বৃত্তি'। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা তাদের কাজ নয়। ঈশ্বরেচ্ছা হলে তাদের প্রয়োজন যা, আপনি এসে উপস্থিত হবে।'

"একটি ছোকরা সাধু—বাল ব্রহ্মচারী, ভিক্ষা করতে গিছিল, একটি মেয়ে এসে ভিক্ষা দিলে। তার বক্ষে স্তন দেখে সাধু মনে করলে বুকে ফোড়া হয়েছে, তাই জিজ্ঞাসা করলে। পরে বাড়ীর গিন্নীরা বুঝিয়ে দিলে যে ওর গর্ভে ছেলে হবে বলে ঈশ্বর স্তনেতে দুগ্ধ দিবেন; তাই ঈশ্বর আগে থাকতে তার বন্দোবস্ত করছেন। এই কথা শুনে ছোকরা সাধুটি অবাক। তখন সে বললে, তবে আমার ভিক্ষা করবার দরকার নেই; আমার জন্যও খাবার আছে।"

[কথামৃত : ৩য় : ৯ই নভেম্বর, ১৮৮৪]

এ গল্পের একটু পরেই চাতকপাখীর উপমাটি গীতিকবিতার মেদুরতায় পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হয়—"চাতক চায় কেবল ফটিক জল। পিপাসায় প্রাণ যায়, উঁচু হয়ে আকাশের জল পান করতে চায়। গঙ্গা-যমুনা সাত-সমুদ্র জলে পূর্ণ। সে কিন্তু পৃথিবীর জল খাবে না।"

ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়—'প্রেমাভক্তি' সে ভালোবাসায় প্রিয়জনকে নিজের তুলনায় ছোট বলে মনে হয়। অনন্ত ঈশ্বর তখন আমাদেরই স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসার ভিখারী। যশোদা বা কৌশল্যার মাতৃস্নেহে তার কিছু পরিচয়, শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি বৃন্দাবনের গোপীদের অব্যভিচারিণী ভক্তিতে। তাঁর অজস্র গল্পভাণ্ডার থেকে এমন একটি উদাহরণ দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব—

"তিন বন্ধু বন দিয়ে যাচ্ছে। বাঘ এসে উপস্থিত। একজন বললে, 'ভাই! আমরা সব মারা গেলুম!' আর একজন বললে, 'কেন? মারা যাব কেন? এস ঈশ্বরকে ডাকি।' আর একজন বললে, 'না, তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে? এস, এই গাছে উঠে পড়ি।'

যে লোকটি বললে, 'আমরা মারা গেলুম, সে জানে না যে ঈশ্বর রক্ষাকর্তা আছেন। যে বললে, 'এস আমরা ঈশ্বরকে ডাকি', সে জ্ঞানী; তার বোধ আছে যে ঈশ্বর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সব করছেন। আর যে বললে, তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, এস গাছে উঠি, তার ভিতরে প্রেম জন্মেছে, ভালোবাসা জন্মেছে। তা প্রেমের স্বভাবই যে, আপনাকে বড় মনে করে, আর প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে করে। পাছে তার কষ্ট হয়। কেবল এই ইচ্ছা যে, যাকে ভালোবাসে তার পায়ে কাঁটাটি পর্যন্ত না ফোটে।" [কথামৃত : ২য় : ২রা জুন, ১৮৮৩]

এই ছোট্ট গল্পটির শেষ পঙ্‌ক্তিটি অনুভূতির রাজ্যে অমর ঘোষণা। তবু সমগ্র গল্পটির মধ্যে ঈশ্বর ও মানবসম্বন্ধের সূক্ষ্ম তিনটি স্তর পর পর আশ্চর্য সজীবতায় ফুটে উঠেছে। ভক্তির সাধনায় শেষোক্ত বন্ধুটিই সিদ্ধসাধক—ঈশ্বরের কাছে সে ত্রাণও চায় না, তার সবকিছুই ঈশ্বরের জন্য সমর্পিত, বরং ঈশ্বরকেই সে হৃদয় দিয়ে ঘিরে রেখেছে।

ব্রহ্মবিদ্যার জগতে মানুষ যত অগ্রসর হতে থাকে তত অবাক হবার পালা। সব বাক্য, সব ইঙ্গিত ও সংকেতের পারে সে-মহামৌন অন্বেষণকারী আর অন্বিষ্টের বহিরঙ্গ পার্থক্য মুছে দেয়। তবু শাস্ত্র নিয়ে বাদ বিসংবাদ, কে কতটা জানে তাই নিয়ে ডেঁয়ো পিঁপড়ের অহঙ্কার ('এবার এসে সবটা চিনির পাহাড় নিয়ে যাবো'), নিজেকে জাহির করতে গিয়ে আপন অলক্ষ্যে মূঢ়তার সাক্ষী হওয়া —এ সবই নিয়ত ঘটছে, শুধু মনের আয়নায় নিজেদের দেখতে পাওয়ার অপেক্ষা।

"একটি জিনিষ কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিষটি ব্রহ্ম।"—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উক্তিটি শুনে বিদ্যাসাগর মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি গল্পও শুনিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ,—"এক বাপের দুটি ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শিখবার জন্য ছেলে দুটিকে বাপ আচার্যের হাতে দিলেন। কয়েক বৎসর পরে গুরুগৃহ থেকে ফিরে এলো, এসে বাপকে প্রণাম করলে। বাপের ইচ্ছা, দেখেন, এদের ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ হয়েছে। বড়-ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাপ! তুমি ত সব পড়েছ, ব্রহ্ম কিরূপ বল দেখি! বড়-ছেলেটি বেদ থেকে নানা শ্লোক বলে বলে ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে লাগলো। বাপ চুপ করে রইলেন। যখন ছোট-ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে হেঁটমুখে চুপ ক'রে রইল। মুখে কোন কথা নাই। বাপ তখন প্রসন্ন হয়ে ছোট-ছেলেকে বললেন, 'বাপু! তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না।' [কথামৃত : ৩য় : ৫ই আগষ্ট, ১৮৮২]

বাক্যমনাতীত এই পরম সত্যকে যাঁরা জানতে পারেন, তাঁদের মধ্যেও একাধিক শ্রেণী। কেউ বা আম খেয়ে আর দশজনকে খাওয়ায়, কেউ বা আম খেয়ে মুখটি মুছে ফেলে, কেউ বা শোলার মত জলে ভাসতে গিয়ে একটি পাখীর ভরেই ডুবে যায়, কেউ বা বাহাদুরী কাঠের মতো শত শত লোককে পার করে। চার বন্ধুর গল্পে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই দু'ধরনের ব্রহ্মজ্ঞানীর কথা বলেছেন। 'কথামৃতে' প্রথম এবং পঞ্চম ভাগে গল্পটির একটু পার্থক্য আছে। প্রথম ভাগে (২২শে জুলাই, ১৮৮৩) গল্পটিতে—'চার বন্ধু ভ্রমণ করতে করতে পাঁচিলে ঘেরা একটা জায়গা দেখতে পেলে। খুব উঁচু পাঁচিল। ভিতরে কি আছে দেখবার জন্য সকলে বড় উৎসুক হল। পাঁচিল বেয়ে একজন উঠলো। উঁকি মেরে যা দেখলে, তাতে অবাক হয়ে 'হা-হা-হা' বলে ভিতরে পড়ে গেল। আর কোন খবর দিল না। যেই উঠে, সেই 'হা-হা-হা' করে পড়ে যায়। তখন খবর আর কে দেবে ?'

পঞ্চম ভাগের (২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩) গল্পটিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন—"প্রাচীরের ওপারে অনন্ত মাঠ। চারজন বন্ধু প্রাচীরের ওপারে কি আছে দেখতে চেষ্টা করলে। এক একজন প্রাচীরে উঠে, ঐ মাঠ দর্শন করে হা-হা করে হেসে অপর পারে পড়ে যেতে লাগল। তিনজন কোন খবর দিলে না। একজন শুধু খবর দিলে। তার ব্রহ্মজ্ঞানের পরও শরীর রইল, লোকশিক্ষার জন্য। যেমন অবতার আদির।"

এ গল্প যিনি বলছিলেন, তিনিও সেই দুর্লভ মানবদেব একজন যাঁরা পরমসত্যের বাণী এইভাবে জগতের কাছে শোনাবার জন্য ফিরে ফিরে আসেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথাসাহিত্যে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কৌতুক

জীবনকে যাঁরা গভীরে তলিয়ে দেখতে চেয়েছেন, তাঁদের মমতা, সহানুভব, প্রীতি, শ্রদ্ধা যেমন সাহিত্যের উপাদান, তেমনি আর একদিক থেকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কৌতুকও মানবচরিত্র-অনুধাবনে সাহিত্যের জগতে বিশেষ আদরের সামগ্রী। হৃদয় এবং বুদ্ধির সংমিশ্রণ ছাড়া শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কখনো দেখা দেয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই গল্পবলার মধ্যে সর্বত্র এক সামঞ্জস্যবোধ এবং স্মিতহাসির সুষমা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁর কথার মধ্যে সর্বত্র ছড়ানো এক বুদ্ধিদীপ্ত

আভা সমগ্র 'কথামৃত'কে নিছক হিতোপদেশের একঘেয়েমি থেকে মুক্ত করে মানবহৃদয়ের একান্ত কাছাকাছি এনে দিয়েছে।

আদর্শ যত মহৎ, তার সাধনপথে অসংগতির সম্ভাবনাও ততখানি। সমাজজীবনের নানা অসঙ্গতি ও ছলনার উদাহরণ দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যে অনেক নকশা, প্রহসন, উপন্যাস এবং নাটক গড়ে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতেও পারিপার্শ্বিক সমাজজীবনের ছায়াপাত কিছু পরিমাণে ঘটেছে। তবু যেহেতু, তাঁর উর্ধ্বচারী দৃষ্টিতে ঈশ্বর ও মানবজীবনের সম্বন্ধই সবচেয়ে বড়ো স্থান অধিকার করেছে, সেহেতু আধ্যাত্মিক জীবনের অসংগতি-গুলির অনুধাবনে ও চিত্রণে তাঁর প্রতিভার আর একটি দিক প্রকাশিত। সব মিলিয়ে মানবচরিত্রেরই এক একটি মূঢ়তা বা দুর্বলতার দৃষ্টান্ত তাঁর হাস্যোজ্জ্বল সন্ধানী দৃষ্টিতে এক একটি অবিস্মরণীয় গল্প হয়ে ফুটেছে।

এ জাতীয় গল্পের মধ্যে সবার আগে স্থান পাওয়ার যোগ্য—'পদ্মলোচনের গল্প।' লেকচার, বক্তৃতা, প্রচার, সংস্কার—এমনি নানা উদ্যমে মুখরিত উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে শ্রীরামকৃষ্ণদেব চেয়েছিলেন পরমসত্যের প্রতিষ্ঠাভূমিতে সুদৃঢ়ভাবে আসীন অবিচল একদল ত্যাগশুদ্ধ চিন্তানায়ক। জাতীয় পুনরুজ্জীবনে এই ত্যাগ, তপস্যা, শুদ্ধতার সঞ্চারে তাঁর অনন্য ভূমিকা। পদ্মলোচনের গল্পটি ব্যঙ্গচ্ছলে অধিকাংশ প্রচারকদের অপূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করলেও যথার্থ লোকশিক্ষকের স্বরূপ সম্বন্ধেও আমাদের অবহিত করে।

সেদিনের আলাপচারীতে শ্রোতার দলে মাষ্টারমশাই নিজে, নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু। এঁরা সবাই সমকালীন ধর্মান্দোলন সম্বন্ধে অবহিত, ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। রামপ্রসাদের 'ডুব দেরে মন কালী বলে' গানটি গাইতে গাইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই গল্পটির প্রসঙ্গে এলেন। ডুব না দিয়ে যারা দুচার কথা ধরতাই বুলি জেনে নিয়েই লেকচারে মাতে তাদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য—"পাণ্ডিত্য কি লেকচার কি হবে যদি বিবেক বৈরাগ্য না আসে···। তাঁকে হৃদয়মন্দিরে আগে প্রতিষ্ঠা কর। বক্তৃতা, লেকচার, তারপর ইচ্ছা হয়তো ক'রো। শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম বললে কি হবে, যদি বিবেকবৈরাগ্য না থাকে, ও তো ফাঁকা শঙ্খধ্বনি।

'এক গ্রামে পদ্মলোচন বলে একটি ছোকরা ছিল। লোকে তাকে পোদো পোদো বলে ডাকতো। গ্রামে একটি পোড়ো মন্দির ছিল। ভিতরে ঠাকুর

বিগ্রহ নাই—মন্দিরের গায়ে অশ্বত্থ গাছ, অন্যান্য গাছ-পালা হয়েছে। মন্দিরের ভিতরে চামচিকে বাসা করেছে। মেজেতে ধুলা, চামচিকার বিষ্ঠা। মন্দিরে লোকজনের আর যাতায়াত নাই।

একদিন সন্ধ্যার পরে গ্রামের লোকেরা শঙ্খধ্বনি শুনতে পেলে। মন্দিরের দিক থেকে শাঁক বাজছে ভোঁ ভোঁ করে। গ্রামের লোকেরা মনে করলে হয় তো কেউ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করছে, সন্ধ্যার পর আরতি হচ্ছে! ছেলে, বুড়ো, পুরুষ, মেয়ে সকলে দৌড়ে দৌড়ে মন্দিরের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত। ঠাকুর দর্শন করবে আর আরতি দেখবে। পদ্মলোচন এক পাশে দাঁড়িয়ে ভোঁ ভোঁ শাঁক বাজাচ্ছে! ঠাকুর প্রতিষ্ঠা নাই—মন্দির মার্জনা হয় নাই—চামচিকার বিষ্ঠা রয়েছে। তখন সে চেঁচিয়ে বলছে—

"মন্দিরে তোর নাইক মাধব।
পোদো, শাঁক ফুঁকে তুই করলি গোল!
তায় চামচিকে এগার জনা দিবানিশি দিচ্ছে হানা"—

যদি হৃদয়-মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করতে চাও, যদি ভগবান লাভ করতে চাও শুধু ভোঁ ভোঁ করে শাঁক ফুঁকলে কি হবে! আগে চিত্তশুদ্ধি কর। মন শুদ্ধ হলে ভগবান পবিত্র আসনে এসে বসবেন। চামচিকার বিষ্ঠা থাকলে মাধবকে আনা যায় না। এগার জন চামচিকে একাদশ ইন্দ্রিয়—পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় আর মন। আগে মাধব প্রতিষ্ঠা, তার পর ইচ্ছা হয় বক্তৃতা লেকচার দিও।"

[কথামৃত : ২য় : ১৭ই অক্টোবর, ১৮৮২]

রূপক ভেঙে এ কাহিনীর অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবই ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা শুধু তুলনামূলকভাবে সংসার সমাজে সর্বত্র এই পদ্মলোচনের দলের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আগে মনুষ্যত্ব, তার পরে নেতৃত্ব। এই আদর্শের বিপরীত উদাহরণই আজকাল দেখতে আমরা অভ্যস্ত। আধ্যাত্মিক জীবনের অন্তঃসারশূন্যতার উদাহরণ হিসাবে পদ্মলোচনের শঙ্খধ্বনি যেমন স্মরণীয়, তেমনি লক্ষণীয় হালফিল দুনিয়ার আদর্শের ধ্বজাধারী রাষ্ট্র বা সমাজনেতৃত্বের কপটতা।

বস্তুত এই গল্পটিকে মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দের 'ভাব্‌বার কথা' নামে ব্যঙ্গ-গল্পগুচ্ছের প্রেরণা। অবশ্য গল্প বলার ভঙ্গীতে গুরু-শিষ্যের পার্থক্য আছে॥ কিন্তু মানব-অন্তরের বিশ্লেষণভঙ্গীর দিক থেকে দেখলে বিবেকানন্দ-সাহিত্যের

মূল উৎস সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ থাকে না। উদাহরণস্বরূপ 'ভাব্‌বার কথা'র বিখ্যাত একটি গল্প এখানে উল্লেখযোগ্য—

"ঠাকুর-দর্শনে এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত। দর্শন-লাভে তাহার যথেষ্ট প্রীতি ও ভক্তির উদয় হইল। তখন সে বুঝি আদানপ্রদান সামঞ্জস্য করিবার জন্য গীত আরম্ভ করিল। দালানের এক কোণে থামে হেলান দিয়ে চোবেজী ঝিমাইতেছিলেন। চোবেজী মন্দিরের পূজারী, পহলওয়ান, সেতারী—দুই লোটা ভাঙ দুবেলা উদরস্থ করিতে বিশেষ পটু এবং অন্যান্য আরও অনেক সদ্‌গুণসাহসী। সহসা একটা বিকট নিনাদ চোবেজীর কর্ণপটহ প্রবল বেগে ভেদ করিতে উদ্যত হওয়ায় সম্বিদা-সমুৎপন্ন বিচিত্র জগৎ ক্ষণকালের জন্য চোবেজীর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বিশাল বক্ষঃস্থলে 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে' হইল। তরুণ-অরুণ-কিরণ-বর্ণ ঢুলুঢুলু দুটি নয়ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া মনশ্চাঞ্চল্যের কারণানুসন্ধায়ী চোবেজী আবিষ্কার করিলেন যে, এক ব্যক্তি ঠাকুরজীর সামনে আপনভাবে আপনি বিভোর হইয়া কর্মবাড়ীর কড়া-মাজার ন্যায় মর্মস্পর্শী স্বরে নারদ, ভরত, হনুমান, নায়ক—কলাবতগুষ্টির সপিণ্ডকরণ করিতেছে। সম্বিদানন্দ উপভোগের প্রত্যক্ষ বিঘ্নস্বরূপ মর্মাহত চোবেজী তীব্র বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"বলি বাপু হে, ও বেসুর বেতাল কি চিৎকার করছ!" ক্ষিপ্র উত্তর এল,—"সুর তানের আবার আবশ্যক কি হে? আমি ঠাকুরজীর মন ভিজুচ্চি।" চোবেজী—"হুঁ, ঠাকুরজী এমনই আহাম্মক কি না! পাগল তুই, আমাকেই ভিজুতে পারিস নি, ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশী মূর্খ?'

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ১ম সং : পৃঃ ৪৫]

চোবেজীর এ গল্পটির সঙ্গে পদ্মলোচনের গল্পের মিলটুকু দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য। স্বামীজী 'উদ্বোধন' পত্রিকায় সমাজ ও ধর্মপ্রসঙ্গে যে ব্যঙ্গাত্মক কথিকাগুলি লিখেছিলেন, আমাদের ধারণা সে জাতীয় গল্পের প্রেরণা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পেই রয়েছে। কোনো কোনো সমালোচক স্বামীজীর এ গল্পগুলিকে রবীন্দ্রনাথের 'ব্যঙ্গকৌতুক'-জাতীয় রচনার সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন। সে জাতীয় কষ্টকল্পনা অপ্রয়োজনীয়। স্বামীজীর নিজস্ব ভাষাভঙ্গী, জীবনদৃষ্টি এবং অধ্যাত্মচেতনার পটভূমিকায় এ জাতীয় গল্পসৃষ্টির জন্য এক শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছাড়া আর কারো কাছে ঋণী বলে মনে হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটি বিশেষ মনোভঙ্গীর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও স্বামীজীর এক জাতীয়

সিদ্ধান্ত হওয়া স্বাভাবিক। তার অর্থ এ নয় যে একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত। বিবেকানন্দসাহিত্যে এ জাতীয় গল্পের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণই পথপ্রদর্শক।

মানুষের মন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় 'ধোপাঘরের কাপড়।' গীতার অভ্যাসযোগ স্মরণ করে বলা যায়, এ মনকে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা রূপান্তরিত করাই সাধনা। বাইরের ভেক নয়, অন্তরে আকুলতাই খাঁটি মনের মাপকাঠি। ধোপাঘরের কাপড় যেমন যে রঙে ছোপানো যায় সেই রঙ ধরে, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় 'মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত।' যেমন ভাব তেমনি লাভ।

"দুজন বন্ধু পথে যাচ্ছে। এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। একজন বন্ধু বললে, এসো ভাই, একটু ভাগবত শুনি। আর একজন একটু উঁকি মেরে দেখলে। তারপর সে সেখান থেকে চলে গিয়ে বেশ্যালয়ে গেল। সেখানে খানিকক্ষণ পরে তার মনে বড় বিরক্তি এলো। সে আপনা আপনি বলতে লাগলো, ধিক আমাকে! বন্ধু আমার হরিকথা শুনছে, আর আমি কোথায় পড়ে আছি! এদিকে যে ভাগবত শুনছে, তারও ধিক্কার হয়েছে। সে ভাবছে, আমি কি বোকা! কি ব্যাড়্ ব্যাড়্ করে বকছে, আর আমি এখানে বসে আছি! বন্ধু আমার কেমন আমোদ করছে।' এরা যখন মরে গেল, যে ভাগবত শুনছিল, তাকে যমদূত নিয়ে গেল, যে বেশ্যালয়ে গিছিল, তাকে বিষ্ণুদূত বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেল!

"ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না। 'ভাবগ্রাহী জনার্দন'।"

এ গল্প নিশ্চয় পুরাণ-বিশ্বাসের, অধ্যাত্মজগতের। কিন্তু মানবপ্রকৃতির মৌলিক সততার প্রশ্ন এখানেও দেখা দেয়। জীবনের বিভিন্ন স্তরে মানুষ এই সততার মূল্যেই তার মনুষ্যত্বের যাচাই করে থাকে। শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব মানুষের নির্জনতম মুহূর্তে নিজেকে নিয়ে আচরণের দ্বারাই বুঝে নেওয়া সম্ভব। সেই সঙ্গে তথাকথিত ধর্মধ্বজিতার বিরুদ্ধে ইঙ্গিতটুকুও লক্ষণীয়।

তবে সকলেই যে শ্রেষ্ঠ সত্যের উপলব্ধি সমানভাবে করতে পারেন, তা কখনো সম্ভব নয়। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন অধ্যাত্মজগতের ক্ষেত্রে তেমনি একথা আরো গভীরভাবে সত্য। জনতার রুচিমাত্রেই অভ্রান্ত কিছু নয়, সে রুচিকে পরিশীলন করার দায় জ্ঞানী গুণীদের। কিন্তু শেষ অবধি রুচি বিদ্যা বা মননের ক্ষেত্রে এক স্তরে আসা কি সম্ভব? মানুষমাত্রেরই কি শক্তি এক

নয়?—বিদ্যাসাগরের এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন। 'তবে তোমাকে দেখতে এসেছি কেন? তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে?' অর্থাৎ সত্যকে ধারণা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ক্ষমতা। আর সেই শক্তির তারতম্যের ফলে কেউ বা নেতা, কেউ বা অনুগামী।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের (চিরঞ্জীব শর্মা) 'কেশবচরিত' বইখানি নিয়ে লেখকের উপস্থিতিতেই একদিন কথা হচ্ছিল। (১২ই এপ্রিল, ১৮৮৫) কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শে বিশ্বাসী ত্রৈলোক্য যখন এদিক ওদিক দুদিক রাখার আদর্শের উপর জোর দিচ্ছেন, তখন রামকৃষ্ণদেবের বক্তব্য—"যারা 'সংসারে ধর্ম' 'সংসারে ধর্ম' করছে, তারা একবার যদি ভগবানের আনন্দ পায় তাদের আর কিছু ভাল লাগে না"…

অবতারবাদ প্রসঙ্গে ব্রাহ্মদের আপত্তি সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বক্তব্য—'সকলে কি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধরতে পারে? রামচন্দ্রকে বারজন ঋষি কেবল জানতে পেরেছিল। সকলে ধরতে পারে না। কেউ সাধু ভাবে; কেউ সাধারণ মানুষ ভাবে; দুচার জন অবতার বলে ধরতে পারে।' এই বলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে গল্পটি বলেছিলেন, আমরা সেটিকে 'হীবের দাম' নাম দিতে পারি।

মানবমনস্তত্ত্বের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে একটি সূক্ষ্ম পরিহাস এ গল্পটিকে আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যসমেত সার্থক ছোট গল্পে পরিণত করেছে। এর বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে যেমন সরসতা, সমগ্র পরিণতির মধ্যে তেমনি বিস্ময়। শুধু গল্পের উপোদ্ঘাতটি আলাদা করে নেওয়া যাক।—"যার যেমন পুঁজি—জিনিসের সেই রকম দর দেয়।"

"একজন বাবু তাঁর চাকরকে বললে, তুই এই হীরেটি বাজারে নিয়ে যা। আমায় বলবি, কে কি রকম দর দেয়। আগে বেগুনওয়ালার কাছে নিয়ে যা।

চাকরটি প্রথমে বেগুনওয়ালার কাছে গেল। সে নেড়ে চেড়ে দেখে বললে—ভাই, নয় সের বেগুন আমি দিতে পারি। চাকরটি বললে, ভাই আর একটু ওঠ, না হয় দশ সের দাও। সে বললে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী বলে ফেলেছি; এতে তোমার পোষায় ত দিয়ে যাও। চাকর তখন হাসতে হাসতে হীরেটি ফিরিয়ে নিয়ে বাবুর কাছে বললে, মহাশয় বেগুনওয়ালা নয় সের বেগুনের বেশী একটিও দেবে না। সে বললে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী

বলে ফেলছি। বাবু হেসে বললে, আচ্ছা এবার কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে যা। ও বেগুন নিয়ে থাকে, ও আর কতদূর বুঝবে! কাপড়ওয়ালার পুঁজি একটু বেশী,—দেখি ও কি বলে।

চাকরটি কাপড়ওয়ালার কাছে বললে, ওহে এটি নেবে? কত দর দিতে পার? কাপড়ওয়ালা বললে, হাঁ জিনিষটা ভাল, এতে বেশ গয়না হতে পারে; তা ভাই আমি নয়শো টাকা দিতে পারি। চাকরটি বললে, ভাই, আর একটু ওঠ, তাহলে ছেড়ে দিয়ে যাই। না হয় হাজার টাকাই দাও। কাপড়ওয়ালা বললে, ভাই, আর কিছু বলো না; আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী বলে ফেলেছি; নয়শো টাকার বেশী একটি টাকাও আমি দিতে পারবো না। চাকর ফিরিয়ে নিয়ে মনিবের কাছে হাসতে হাসতে ফিরে গেল আর বললে যে, কাপড়ওয়ালা বলেছে ন'শো টাকার বেশী একটি টাকাও সে দিতে পারবে না। আরও সে বলেছে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী বলে ফেলেছি।

তখন তার মনিব হাসতে হাসতে বললে, এইবার জহুরীর কাছে যাও—সে কি বলে, দেখা যাক্। চাকরটি জহুরীর কাছে এল। জহুরী একটু দেখেই একেবারে বললে, একলাখ টাকা দেবো।"

শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দেবার যোগ্য অধিকারী কম বলে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের হতাশ হবার কারণ নেই। কারণ অযোগ্যের সম্মাননার মতো নিরর্থক যন্ত্রণাও কম দুঃখের নয়। নিঃসঙ্গতাই মহত্ত্বের পুরস্কার। এই সব দিক থেকে না দেখেও শুধুমাত্র জগৎসংসারে যথার্থ রসিক যে কতো অল্প, সে কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হাসিটুকুর মধ্য দিয়ে এ গল্পে বারংবার যেভাবে উঁকি দিয়েছে—তাও পরম উপভোগ্য।

অধিকাংশ মানুষেরই আকাঙ্ক্ষার দৌড় অতি সামান্য। অর্থ, সম্পদ, দেহসুখ, নামযশ—এগুলির পিছনে অধিকাংশ মানুষের আজীবন সময় কেটে চলেছে। সেইটুকু পূরণ হয়ে গেলেই যারা খুশী, তাদেরও প্রার্থনা ঈশ্বর পূরণ করেন, কিন্তু সেইখানেই তাদের জগৎ সমাপ্ত। দৃষ্টি যত স্বচ্ছ, অনুভূতি যত প্রসারিত, ততই আমাদের প্রার্থনাও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর। কিন্তু সেই পূর্ণতার সন্ধানে যে মানসিক ও আত্মিক কর্ষণ প্রয়োজন, তা আছে কয়জনের? এক বাজীকরের গল্পে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সামান্য আধার মানুষেরং ধরনটি দেখিয়েছেন—

"যে যা মনে করে সাধনা করে তার সেইরূপই হয়। যেমন ভাব তেমনি লাভ। একজন বাজীকর খেলা দেখাচ্ছে রাজার সামনে। আর মাঝে মাঝে বলছে, রাজা টাকা দেও, কাপড়া দেও।

এমন সময়ে তার জিব তালুর মূলের কাছে উল্টে গেল। অমনি কুম্ভক হয়ে গেল। আর কথা নাই, শব্দ নাই, স্পন্দ নাই। তখন সকলে তাকে ইটের কবর তৈয়ার করে সেই ভাবেই পুঁতে রাখলে। হাজার বৎসর পরে সেই কবর কে খুঁড়েছিল। তখন লোকে দেখে যে একজন যেন সমাধিস্থ হয়ে বসে আছে। তারা তাকে সাধু মনে করে পূজা করতে লাগলো। এমন সময় নাড়াচাড়া দিতে দিতে জিব তালু থেকে সরে এল। তখন তার চৈতন্য হলো। আর সে চীৎকার করে বলতে লাগলো, লাগ ভেলকী লাগ। রাজা টাকা দেও, কাপড়া দেও।" [কথামৃত : ৩য় : ৩০শে জুন, ১৮৮৪]

সমাধির তুরীয় লোক থেকে 'টাকা দেও' 'কাপড়া দেও'—এই নিতান্ত স্থূল আকাঙ্ক্ষা অসংস্কৃত মনেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষ এই বহিরঙ্গ বস্তুর মাহাত্ম্যেই খুশী। সিদ্ধাই চায় বেশীর ভাগ, সিদ্ধি চায়, ক'জন? সুতরাং সমাধিস্থ দেখানোটাই বড় কথা নয়, মানস-সমুন্নয়নই যথার্থ আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ। তা যেখানে নেই সেখানে অনন্ত ঈশ্বরের কাছে লাউ-কুমড়োর প্রার্থনাই সার হয়ে দাঁড়ায়।

যারা ঈশ্বরপথের সাধক তাদের মধ্যেও দলগত, মতবাদগত পার্থক্য থাকে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন দর্শনে তাই এত ঘাত-সংঘাত, বাদ-বিতণ্ডা। আপন আপন মতের প্রতি এই একগুঁয়েমিকে মৃদু পরিহাসে ফুটিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দুই বেয়ানের গল্পটি তার সুন্দর উদাহরণ।

পরমসত্য লাভ যাঁরা করেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতানুসারে দুটি ভাগ—জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী। যারা শুধু জ্ঞানী, তারা সবসময় ব্রহ্মের স্বরূপ বিচারে ব্যস্ত, যারা বিজ্ঞানী তারা ব্রহ্মোপলব্ধির আনন্দলাভ করে জগৎকে ব্রহ্মময় দেখছেন। জ্ঞানীর সবসময় ভয়, পাছে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, বিজ্ঞানী ব্রহ্মের নিত্যরূপ ও লীলারূপ—এ দুয়েরই অধিকার পেয়ে সব বাধাবন্ধনের ঊর্ধ্বচারী। আপনস্বরূপ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইঙ্গিত এই বিজ্ঞানীসত্তার দিকে।

জ্ঞানী তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে 'একঘেয়ে'। অন্যদিক থেকে দেখলে যে

সব মানুষ নির্দিষ্ট মতবাদের গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে পড়েন, তাঁদের সম্বন্ধেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য। সব মতবাদের মানুষের সহমর্মিতার সঙ্গে সঙ্গে আপন সত্যে অধিষ্ঠিত থাকার ক্ষমতা যার আছে নিঃসংশয়েই তারাই উচ্চস্তরের মানুষ। বিশেষ মতবাদের অনুগামীরা তাই কিছুটা অনুদার হতে বাধ্য।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিচারে যে বেলের সমগ ওজনের কথা বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, সেই কথাটি জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী অথবা দুই বেয়ান সম্বন্ধে প্রযোজ্য। গল্পটি এই রকম—

"একজন ব্যানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ব্যান তখন সুতা কাটছিল—নানা রকমের রেশমের সুতা। ব্যান তার ব্যানকে দেখে খুব আনন্দ করতে লাগলো; আর বললে—'ব্যান, তুমি এসেছ বলে আমার যে কি আনন্দ হয়েছে, তা বলতে পারি না,—যাই তোমার জন্য কিছু জলখাবার আনিগে।' ব্যান জলখাবার আনতে গেছে;—এদিকে নানা রঙের রেশমের সুতো দেখে এ ব্যানের লোভ হয়েছে। সে একতাড়া সুতো বগলে করে লুকিয়ে ফেললে। ব্যান জলখাবার নিয়ে এলো,—আর অতি উৎসাহের সহিত জল খাওয়াতে লাগলো। কিন্তু সুতার দিকে দৃষ্টিপাত করে বুঝতে পারলে যে, একতাড়া সুতো ব্যান সরিয়েছেন। তখন সে সুতোটা আদায় করবার একটা ফন্দী ঠাওরালে।

সে বলছে, 'ব্যান, অনেক দিনের পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হলো। আজ ভারী আনন্দের দিন। আমার ভারী ইচ্ছা কচ্ছে যে দুজনে নৃত্য করি। সে বললে—'ভাই, আমারও ভারী আনন্দ হয়েছে।' তখন দুই ব্যানে নৃত্য করতে লাগলো। ব্যান দেখলে যে, ইনি হাত না তুলে নৃত্য করছেন। তখন তিনি বললেন, 'এস ব্যান দু'হাত তুলে আমরা নাচি, আজ আনন্দের দিন।' কিন্তু তিনি এক হাতে বগল টিপে আর একটি হাত তুলে নাচতে লাগলেন। তখন ব্যান বললেন, 'ব্যান ওকি! এক হাত তুলে নাচা কি, এস দুহাত তুলে নাচি। এই দেখ আমি দুহাত তুলে নাচছি।' কিন্তু তিনি বগল টিপে হেসে হেসে এক হাত তুলেই নাচতে লাগলেন আর বললেন, 'যে যেমন জানে ব্যান'।"

[কথামৃত : ৩য় : ৩০শে জুন, ১৮৮৪]

দুই বেয়ানের এ কাহিনীতে এক হাত তুলে নাচার অনুদারতায় জ্ঞানীর সঙ্গে বিজ্ঞানীর পার্থক্য যেভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে, তা মনে না রাখলেও বিশুদ্ধ

কৌতুককর কাহিনী হিসাবেও গল্পটির বর্ণনাভঙ্গীর সরসতা শ্রোতাকে আকৃষ্ট করবেই। কৌতুক এসে পরিহাসকে ছুঁয়ে গেছে এক হাত তুলে নাচাব ব্যাখ্যায়—'যে যেমন জানে ব্যান।'

ঈশ্বরলাভের অন্তরায় মানুষের অহঙ্কার। সে অহঙ্কারের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভূতসিদ্ধের গল্পটি বলেছিলেন। কৌতুককর পরিস্থিতির দিক থেকে গল্পটির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।—"একজন ভূতসিদ্ধ হয়েছিল। সিদ্ধ হয়ে যাই ডেকেছে, অমনি ভূতটি এসেছে। এসে বললে, কি কাজ করতে হবে বলো। কাজ যাই দিতে পারবে না, অমনি তোমার ঘাড় ভাঙব।" সে ব্যক্তি যত কাজ দরকার ছিল, সব ক্রমে ক্রমে করিয়ে নিল। তার পর আর কাজ পায় না। ভূতটি বললে, 'এইবার তোমার ঘাড় ভাঙি ?' সে বললে, 'একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।' এই বলে গুরুদেবের কাছে গিয়ে বললে, 'মহাশয়! ভারী বিপদে পড়েছি, এই এই বিবরণ, এখন কি করি ?' গুরু তাকে বললেন, 'তুই এক কর্ম কর, তাকে এই চুল গাছটি সোজা করতে বল। ভূতটি দিনরাত ঐ করতে লাগলো। চুল কি সোজা হয় ? যেমন বাঁকা তেমনি বাঁকাই রইল। অহঙ্কারও এই যায়, আবার আসে।" [কথামৃত : ৩য় : ১৩ই জুন, ১৮৮৫]

আর একটি গল্প কৌতুকের আভাসে মানবমনের আত্মপ্রতারণার সত্যটিকে ফুটিয়ে তোলে। বর্ণনার চমৎকারিত্বের দিক থেকে সে গল্পটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী-ভঙ্গিমার অপূর্ব উদাহরণ—"একজন লোকের পাহাড়ের উপর একখানা ঘর ছিল। কুঁড়েঘর। অনেক মেহনত করে ঘরখানি করেছিল। কিছুদিন পরে একদিন ভারী ঝড় এলো। কুঁড়েঘর টল-টল করতে লাগলো। তখন ঘর রক্ষার জন্য সে ভারী চিন্তিত হলো। বললে, হে পবনদেব, দেখো ঘরটি ভেঙো না। পবনদেব কিন্তু শুনছেন না! ঘর মড়মড় করতে লাগলো। তখন লোকটা একটা ফিকির ঠাওরালে। তার মনে পড়লো, হনুমান পবনের ছেলে। যাই মনে করা অমনি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো,—বাবা, ঘর ভেঙো না, হনুমানের ঘর, দোহাই তোমার। ঘর তবুও মড়মড় করে। কেবা তার কথা শোনে। অনেকক্ষণ হনুমানের ঘর হনুমানের ঘর করার পর দেখলে যে কিছুই হলো না। তখন বলতে লাগলো, বাবা, লক্ষ্মণের ঘর! লক্ষ্মণের ঘর! তাতেও হলো না। তখন বলে, বাবা, রামের ঘর। রামের ঘর। দেখো বাবা ভেঙো না, দোহাই তোমার। তাতেও কিছু হলো না, ঘর মড়মড় করে ভাঙতে

আরম্ভ হলো। তখন প্রাণ বাঁচাতে হবে, লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় বলছে,—যা শালার ঘর।" [কথামৃত : ১ম : ১৫ই জুন, ১৮৮৪]

গল্পটি এসেছিল প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলাপনের সময়; কেশবের দেহাবসানের পরে ব্রাহ্মসমাজের দলাদলি, প্রচারপর্ব ইত্যাদি ছেড়ে প্রতাপ এখন সম্পূর্ণ ঈশ্বরে মন দিন এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইচ্ছা। প্রতাপের বক্তব্য, কর্মসূত্রে তিনি জড়িয়ে আছেন শুধুমাত্র কেশবের নামরক্ষার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন বলছেন, "তুমি বলছো বটে, তাঁর নাম রাখবার জন্য সব করছো; কিন্তু কিছুদিন পরে এ ভাবও থাকবে না।' তার পর এই গল্পটি শুনিয়ে বলছেন—'কেশবের নাম তোমার রক্ষা করতে হবে না। যা কিছু হয়েছে, জানবে—ঈশ্বরের ইচ্ছায়।…তোমার এখন কর্তব্য যে ঈশ্বরেতে সব মন দাও—তাঁর প্রেমের সাগরে ঝাঁপ দাও।"

মূল প্রসঙ্গের দিক থেকে গল্পটির তাৎপর্য অন্যের উপকারের নামে মানুষের আত্মপ্রচারের বাসনাকে পবিহাস করা। মানুষের আকাঙ্ক্ষার দৌড়ের অবধিও এ গল্পে দেখা যেতে পারে। যতক্ষণ পারি, যতটা পারি, আমরা আঁকড়ে ধরতে চাই এ সংসারকে, তার জন্য হয়তো কতো কিছুর দোহাই দিই। অবশেষে সব যখন ছাড়তেই হয়, তখন আর কারু দোহাই না দিয়ে, আকাঙ্ক্ষার বস্তুটিরই দোষ দিয়ে ত্যাগ করি। এমন বাধ্যতামূলক ত্যাগের মধ্যে যে পরিহাসের দিকটি রয়েছে, সেইটিও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইঙ্গিত হতে পারে।

কথাসাহিত্যে হাস্যরস সৃষ্টির দিক থেকে বিচার করলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনেক গল্পেই মৃদু অথবা তীব্র হাস্যচ্ছটা পাঠক বা শ্রোতার মোহাবরণ অপসৃত করে চলেছে। মানবমনের সব স্তরবৈচিত্র্য যাঁরা নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে যেতে পারেন, তাঁরাই শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের স্রষ্টা। বাংলাসাহিত্যে এদিক থেকে 'কমলাকান্ত'-স্রষ্টা বঙ্কিম বা 'ডমরুধর'-স্রষ্টা ত্রৈলোকনাথ মুখোপাধ্যায় অবিস্মরণীয়। এঁদের মতো সচেতন সাহিত্যস্রষ্টা না হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পগুচ্ছ হাস্যরস-সৃষ্টির উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হিসাবে চিরস্মরণীয়। এই বিপুল কথাসাহিত্যেব ভাণ্ডার থেকে আমরা কিছুটা দিগ্‌দর্শন করলাম মাত্র। আরো অনেক গল্প, আরো অনেক বিশ্লেষণ বাকি রইল স্বাভাবিকভাবেই। সবার শেষে আধুনিককালের সভ্যমানুষের সংবাদপত্র-নির্ভরতা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি গল্প উদ্ধৃত করে এ আলোচনার মধুর সমাপ্তি।

কোনো কোনো গল্প শ্রীরামকৃষ্ণদেব বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত—এমনি নানা উপাদান থেকে শ্রুতিপরম্পরায় আহরণ করে সাজিয়েছেন, কোনো গল্প এসেছে বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে, কোনো কোনো গল্পে সমকালীন জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা। একদিন কথায় কথায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্র' নিয়ে প্রসঙ্গ উঠলো। 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিম বৃন্দাবন কাহিনী অনৈতিহাসিক প্রতিপন্ন করেছেন। রামকৃষ্ণদেব জানতেন—'বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে না।' সাধারণভাবে বঙ্কিম লীলায় বিশ্বাসী ন'ন। কিন্তু এর কারণ হিসাবে তিনি যে গল্পটি শোনালেন সেটির মতো তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ সাহিত্যের জগতে কমই মেলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) 'ও সব কথা যে খবরের কাগজে নাই; কেমন করে মানা যায়!

একজন তার বন্ধুকে এসে বললে, 'ওহে! কাল ওপাড়া দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় দেখলাম, সে বাড়িটা হুড়মুড় করে পড়ে গেল।' বন্ধু বললে, 'দাঁড়াও হে, একবার খবরের কাগজখানা দেখি।' এখন বাড়ি হুড়মুড় করে পড়ার কথা খবরের কাগজে কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বললে, 'কই খবরের কাগজে তো কিছুই নাই। ও সব কাজের কথা নয়।' সে লোকটা বললে, 'আমি যে দেখে এলাম।' ও বললে, 'তা হোক, যে কালে খবরের কাগজে নাই, সেকালে ওকথা বিশ্বাস করলুম না।'

আধুনিক মনের গণ্ডীবদ্ধতা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এ বিশ্লেষণটিও আধুনিক। একালের মানুষ বিজ্ঞান, যন্ত্র, সংবাদপত্র, রাজনীতি—এগুলির উপরে অন্ধ নির্ভরতার ফলে কতো ভ্রান্তির দিকে অগ্রসর হতে পারে তার অজস্র উদাহরণ সত্ত্বেও একমাত্র ঈশ্বর বা ধর্ম বিষয়েই মানুষের ভ্রান্তি হতে পারে—এই অলীক ধারণা নিয়ে আমরা চলেছি। মাঝে মাঝে এমন এক একটি ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব প্রয়োজন, যাঁদের দিব্যদৃষ্টি আমাদের যুগযুগান্তসৃষ্ট সংস্কারের গণ্ডী ভেঙে সত্যের আলোকে জীবনকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা-সাহিত্য, জীবন ও সাহিত্য—দুদিক থেকেই আমাদের চিরন্তন প্রেরণা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথাসাহিত্যের উৎসসন্ধানে

উপনিষদের উপমা : পাখী

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখ-কথিত বাণীসংগ্রহে যে সব গল্পের সমাবেশ রয়েছে, তার পটভূমিতে ভারতীয় দর্শন ও অধ্যাত্মসাহিত্যের বহুযুগ-প্রবাহিত ঐতিহ্যের ধারা প্রবহমান। সমগ্র 'কথামৃত' বা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য কথাসংগ্রহ যেমন বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, তন্ত্র, পুরাণ, আউল-বাউল প্রভৃতি অসংখ্য অধ্যাত্মজ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সমষ্টি, এই গল্পগুলির মধ্যেও শাস্ত্রীয় উপমা বা দৃষ্টান্ত নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে তেমনিভাবে তাঁর বক্তব্যকে রূপময় প্রত্যক্ষতা দান করেছে।

কথামৃতে যতগুলি গল্প রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে কবিত্বময় গল্প বোধ করি জাহাজের মাস্তলে বসা পাখীর গল্পটি। গল্পটি একবার 'কথামৃতে' এসেছে অন্যের মুখে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশের দৃষ্টান্ত হিসাবে। রামচন্দ্র দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রচারক। শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে কীভাবে তাঁর ভাবধারা তিনি হৃদয়ঙ্গম করে নিয়েছিলেন, তার একটি সুন্দর উদাহরণ কথামৃতের দ্বিতীয়ভাগে ৫ই এপ্রিল, ১৮৮৪ তারিখের দিনলিপিতে রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণকথিত এই জাহাজের মাস্তলে বসা পাখীর উদাহরণটি সেখানে সংক্ষেপিত আকারে রামচন্দ্র দত্ত 'বুড়ো গোপাল'কে শোনাচ্ছেন। কিন্তু এই আকারে গল্পটির মূল বক্তব্য বোঝা গেলেও গল্প পরিবেশনের নৈপুণ্য এবং সমগ্র কাহিনীর চিত্র ও ভাবরস উপলব্ধি করতে হলে স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় এটি শোনা দরকার। কথামৃতের তৃতীয়ভাগে মাস্টারমশাই যেভাবে গল্পটি শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত বাণী-ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন, তাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্প বলার কৃতিত্ব এক অপরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত কবিতার মতো বাংলাসাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ হয়ে উঠেছে। ক্ষেত্রবিশেষে কথাই যে কবিতা হয়ে ওঠে তার অন্যতম সার্থক নিদর্শন এই গল্পটি। ইচ্ছে করলে পাঠকেরা গদ্য-কবিতার মুক্ত রীতিতে বিন্যস্ত করে দেখতে পারেন। তাতে এ গল্পের ভাবসৌন্দর্য আরো গভীরতা পাবে বলেই আমাদের ধারণা।

"যতদিন সংসারে ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে, ততদিন কর্মত্যাগ করতে পারে না। যতক্ষণ ভোগের আশা ততক্ষণ কর্ম।

"একটি পাখী জাহাজের মাস্তুলে অন্যমনস্কে বসে ছিল। জাহাজ গঙ্গার ভিতরে ছিল, ক্রমে ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে পড়ল। তখন পাখীর চটক ভাঙ্গলো, সে দেখলে চতুর্দিকে কূল-কিনারা নাই। তখন ডাঙায় ফিরে যাবার জন্য উত্তর দিকে উড়ে গেল। অনেক দূর গিয়ে শ্রান্ত হয়ে গেল। তবু কূল-কিনারা দেখতে পেলে না। তখন কি করে, আবার মাস্তুলে বসল।"

"অনেকক্ষণ পরে পাখীটা আবার উড়ে গেল—এবার পূর্ব দিকে গেল। সেদিকে কিছুই দেখতে পেলে না। চারিদিকে কেবল অকূল পাথার। তখন ভারী পরিশ্রান্ত হয়ে আবার জাহাজে ফিরে এসে মাস্তুলের উপর বসল। অনেকক্ষণ জিরিয়ে দক্ষিণ দিকে গেল; এইরূপে আবার পশ্চিম দিকে গেল। যখন দেখলে কোথাও কূল-কিনারা নাই, তখন সেই মাস্তুলের উপর বসল। আর উঠল না। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল। তখন মনে আর কোন ব্যস্তভাব বা অশান্তি রইল না। নিশ্চিন্ত হয়েছে, আর কোন চেষ্টাও নাই।"

"গল্পটিকে এর পর কুটিচক ও বহুদকের উপমায় আবার ব্যাখ্যা করেছেন। মূল বক্তব্য এই—"সংসারী লোকেরা যখন সুখের জন্য চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আর পায় না, আর শেষে পরিশ্রান্ত হয়, যখন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে কেবল দুঃখ পায়, তখন বৈরাগ্য আসে, ত্যাগ আসে।"

[কথামৃত : ৩য় ভাগ : ১৩ই জুন ১৮৮৫ তারিখের দিনলিপি]

পাখীর গল্পটি শুনে সেদিনের শ্রোতাদের একজন—'কাপ্তেন'—বিশ্বনাথ উপাধ্যায় বলে উঠলেন—'আহা, কেয়া দৃষ্টান্ত!' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুভূতি-সমুদ্রের কিছু পরিমাণ গ্রহণক্ষমতা যে এই কাপ্তেনের ছিল, 'কথামৃতে'র নানাস্থানে তার প্রমাণ রয়েছে।

পরবর্তীকালে স্বামীজীর উপমাটি স্বভাবতঃই মনে জাগে—

যতদূর যতদূর যাও বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসারজলধি দুঃখ সুখ করে আবর্তন।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম এ যে নহে পথ পালাবার,
বারংবার পাইছ আঘাত কেন কর বৃথায় উদ্যম?

(সখার প্রতি)

সংসার-জলধির এই অনন্ত বিস্তারের সঙ্গে পক্ষ থেকেও পক্ষহীন বিহঙ্গমের উপমাটি কি স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেব-কথিত পাখীর গল্পের উদাহরণ থেকেই

পেয়েছেন? একটি কল্পনার আলোকরশ্মি কেমন করে আর এক কল্পনার ভুবন খুলে দেয়, তা কবিতার ইতিহাসে আমাদের অজানা নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পে ওই ডানামেলা শ্রান্ত পাখীর উড়ে চলা আর অসীম অনন্ত সমুদ্রের ঢেউ—এ দুয়ের অসম প্রতিযোগিতার অবসানে শ্রান্ত ডানা গুটিয়ে নিয়ে মাস্তলে এসে স্থির হয়ে বসার উপমায় আত্মসত্যে অবিচল সমাহিত হওয়ার আদর্শটি অনেক তত্ত্বালোচনার চেয়ে স্পষ্টতরভাবে আমাদের অন্তরে শ্রেষ্ঠ সাধনার সত্য সঞ্চার করে। বহু সাধকের কাছে ভারতের যুগযুগবাহিত অধ্যাত্ম অনুভবের কথা শুনেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বেদান্তবাদী তোতাপুরী তো বটেই, তাছাড়াও ভৈরবী ব্রাহ্মণী, নারায়ণশাস্ত্রী, বৈষ্ণবচরণ, পদ্মলোচন, এমন কতো-জনের সঙ্গে তাঁর সাধকজীবনের ও সাধনান্তে অধ্যাত্ম-আলোচনার সম্বন্ধ।

পাখীর গল্পের এই উদাহরণের কাছাকাছি একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডে। স্বামী গম্ভীরানন্দজী সম্পাদিত উপনিষদ্-গ্রন্থাবলী থেকে সেই স্থানটি—"স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বাঽন্যত্রায়তনমলব্ধ্বা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সোম্য তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বাঽন্যত্রায়তনমলব্ধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইতি।"

উদ্দালক আরুণি তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে সুষুপ্তির অবস্থা বোঝাতে গিয়ে উদাহরণ দিচ্ছেন—"এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন সূত্রে আবদ্ধ কোনও পাখী ইতস্ততঃ উড়ে আর কোথাও আশ্রয় না পেয়ে অবশেষে বন্ধনস্থানকেই আশ্রয় করে, ঠিক তেমনি, হে সোম্য, উক্ত জীব (স্বপ্ন ও জাগরণে) ইতস্ততঃ বিচরণ করে অন্য কোথাও আশ্রয় না পেয়ে আত্মাকেই আশ্রয় করে; কারণ, হে সোম্য, জীব পরমাত্মাতেই আশ্রিত।"

[উপনিষৎ গ্রন্থাবলী : ২য় ভাগ : স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত : ৫ম সংস্করণ : পৃঃ ৩২৫]

উপনিষদের সূত্রে আবদ্ধ পাখীর উপমার চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পে অনন্ত সমুদ্রে আশ্রয় না পেয়ে পাখীটির মাস্তলে ফিরে আসা অনেক বেশি ব্যঞ্জনাময়।

উপনিষদের উপমা : লবণখণ্ড : নুনের পুতুল

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীসংগ্রহগুলিতে একটি উপমা ঘুরে ফিরে অনেকবার দেখা দিয়েছে, বিভিন্ন সময়ে তার বিভিন্ন তাৎপর্য। আবার সব মিলিয়ে তার একটি

সার্থকতা। সেই উপমাটি নুনের পুতুলের ('নুনের পুতুল')। আমরা এখানে এ উপমা-গল্পটির তিনটি উদাহরণমাত্র দেব। প্রত্যেক উদাহরণেই ব্যঞ্জনার অভিনবত্ব লক্ষণীয়।

(১) নুনের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গিছিল, একটু নেমেই গলে গেল। 'তদাকারকারিত'। তখন কে আর উপরে এসে সংবাদ দেবে, সমুদ্র কত গভীর। [কথামৃত : ১ম : ২৯শে মার্চ, ১৮৮৩]

(২) [সাধনকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিভিন্ন দর্শনের একটি]

আর একবার দেখালেন মহাসমুদ্র। আমি লবণ পুত্তলিকা হয়ে মাপতে যাচ্ছি! মাপতে গিয়ে গুরুর কৃপায় পাথর হয়ে গেলুম। দেখলাম জাহাজ একখানা;—অমনি উঠে পড়লাম! গুরু কর্ণধার!

[কথামৃত : ৪র্থ : ২রা জানুয়ারী ১৮৮৪]

(৩) যাকে চিন্তা করবে তার সত্তা পাওয়া যায়। অহর্নিশি ঈশ্বরচিন্তা করলে ঈশ্বরের সত্তা লাভ হয়। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে তাই হয়ে গেল। [কথামৃত : ৩য় : ৯ই নভেম্বর, ১৮৮৪

মূল উপমা একটি হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ব্যঞ্জনা কতো ভিন্ন ধরনের হতে পারে 'নুনের পুতুলে'র এই তিনটি রেখাচিত্রে তার অনবদ্য উদাহরণ। প্রথম উপমাটিতে দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত থেকে অদ্বৈতের অমেয় অনুভবে উত্তরণ। দ্বিতীয় উপমাটিতে দ্বৈত অদ্বৈতের পারে বিজ্ঞানীর অবস্থা। তৃতীয় উপমাটিতে উপাস্য উপাসকের একাত্মতা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক নুনের পুতুল, কিন্তু অনন্তের উদ্দেশ্যে মানবমনের অনন্ত যাত্রায় কতো ভাবে সেই একই সত্যকে অনুভব করা যায়! অধ্যাত্মরাজ্যে এই নুনের পুতুলের উপমা 'লাখে ন মিলল এক'।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে লবণ ও জলের সম্বন্ধ দিয়ে আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত। আবার আলাদাভাবে লবণখণ্ডের কথাও আছে। 'নুনের পুতুল'—উপমার উৎস বৃহদারণ্যকে থাকা আশ্চর্য নয়। দুটি অংশ উদ্ধৃত করি—

"স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানুবিলীয়েত ন হাস্যোদ্‌গ্রহণায়েব স্যাৎ। যতো যতস্ত্বাদদীত লবণমেবৈবং বা অর ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব। এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীত্যর ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥"

"এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—লবণখণ্ড জলে ফেললে তা যেমন জলেই বিলীন হয়,

কেউ ঐ লবণ খণ্ডটি তুলে নিতে পারে না (আলাদা করা যায় না),—(জলে লবণখণ্ডটি মিশে যাবার পর) যে জায়গা থেকেই জল তোলা হোক না, শুধু লবণের স্বাদই পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি, (প্রিয়া পত্নী মৈত্রেয়ীর উদ্দেশে) অনন্ত অপার এই পরমাত্মা বিজ্ঞানস্বরূপই বটে। (আত্মা যে নিজেকে নানারূপে উপলব্ধি করে তার কারণ) নানারূপে ঐ লবণখণ্ডের মতো আলাদা দেখলেও আবার ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মেই বিলীন হয়। দেহন্দ্রিয় থেকে মুক্ত হলে আর বিশেষ জ্ঞান থাকে না—যাজ্ঞবল্ক্য একথাই বলেছিলেন।"

[উপনিষৎ গ্রন্থাবলী : স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত : ৩য় ভাগ : বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২।৪।১২ দ্রষ্টব্য]

যাজ্ঞবল্ক্যের এই বক্তব্যই আলোচনার শেষ দিকে আর একবার এসেছে, এবারে জল ও লবণের সম্বন্ধ নিয়ে উপমা নয়, শুধুমাত্র লবণখণ্ড (তুলনীয়—'লবণপুত্তলিকা'—শ্রীরামকৃষ্ণ)।—"স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীত্যরে ব্রবীমিতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য।"

দৃষ্টান্ত এই—লবণখণ্ড যেমন—অন্তর্বহিঃশূন্য, সর্বাংশে সমরস, তেমনি এই আত্মা অন্তর্বহিঃশূন্য ও সর্বাংশেই প্রজ্ঞানঘন। আত্মার নিজেকে পৃথক কল্পনা ভূতবর্গের অবলম্বনে প্রকাশ পায়। ভূতবর্গ বিলীন হলে এ কল্পনাও বিলীন হয়। কার্যকারণ বিমুক্ত হলে আর ব্যক্তিত্বের পার্থক্যবোধ থাকে না।

[উপনিষৎ গ্রন্থাবলী : বৃহদারণ্যক : ৪।৫।১৩]।

মৈত্রেয়ীর উদ্দেশ্যে এই ব্রহ্মজ্ঞানতত্ত্বের কথা যাজ্ঞবল্ক্য শেষ করেছেন এইভাবে—'সেই বিজ্ঞাতাকে কি দিয়ে জানবে? (বৃহদারণ্যক : ৪।৪।১৫) অর্থাৎ নিজের থেকে আলাদা হলেই জানা যায়। যেখানে জ্ঞান ও জ্ঞাতা এক সেখানে আলাদাভাবে জানার কোনো উপায় নেই। ব্রহ্মকে জানার অর্থ ব্রহ্ম হওয়া। রামকৃষ্ণদেবের ভাষায়—"লবণ পুত্তলিকা সাগর মাপতে গিছিলো, ফিরে এসে আর খবর দিলে না।" [কথামৃত : ৫ম : ২২শে এপ্রিল, ১৮৮৩]

নুনের পুতুলের এই হ্রস্বতম গল্পটি অধ্যাত্মরাজ্যের দীর্ঘতম অভিজ্ঞতার বাণীরূপ। দিব্যদর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন, তিনিই সেই লবণ পুত্তলিকা। তাঁর উপমার নুনের পুতুল আর সমুদ্রের খবর দিতে ফিরে আসে নি। কিন্তু তিনি

তো ফিরে এসে খবর দিয়েছিলেন! সেই অনন্ত সিন্ধু তাঁরই মাধ্যমে বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে কল্লোলিত।

সাংখ্যদর্শন : পুরুষপ্রকৃতি : কর্তা গিন্নী

'সাংখ্যদর্শনের[১] প্রাচীনতম সূত্রাকার রূপ 'তত্ত্বসমাসে'র দ্বিতীয় সূত্রে 'অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ' এবং চতুর্থ সূত্রে 'পুরুষঃ'—প্রকৃতি এবং পুরুষতত্ত্বের আদি সূচনা হিসাবে গ্রহণ করা চলে। সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি জড়, তবু এই জগৎপ্রপঞ্চের নির্মাণকর্ত্রী। পুরুষের সান্নিধ্যেই প্রকৃতির এই কর্মতৎপরতা। সান্নিধ্যের বলেই নিগুণ নিষ্ক্রিয় আত্মা প্রকৃতির প্রেরণা হয়ে ওঠেন। লোহা আর চুম্বকের উপমাটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রকৃতি পুরুষের এই সম্বন্ধে যে কোনো এক পক্ষের ঔদাসীন্যই অপবর্গ ও মোক্ষ। সাংখ্যসূত্রে রয়েছে—'দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গঃ'। (সাংখ্য-দর্শনম্—৩।৬৫) তবে পুরুষ স্বভাবতঃ উদাসীন। সূত্রের ভাষায় 'নৈরপেক্ষ্যেঽপি প্রকৃত্যুপকারেঽবিবেকো নিমিত্তম্' (সাংখ্যদর্শনম্—৩।৬৮) নিরপেক্ষ পুরুষ প্রকৃতির দ্বারা বিমুগ্ধ হয়ে একীভূত। প্রকৃতির আবরণকে সাংখ্যসূত্রে নর্তকী এবং কুলবধূর সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। 'নর্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ' (সাংখ্যদর্শনম্ ৩।৬৯) নর্তকী যেমন নৃত্যপ্রদর্শনের পর থেমে যায় তেমনি পুরুষের ভোগাপবর্গের সময় প্রকৃতির প্রবৃত্তি এবং অপবর্গের পর নিবৃত্তি।

এর পরের উপমাটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যাখ্যাত সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'দোষবোধেঽপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ।' আপনাতে যে পরিণামিত্ব ও দুঃখিত্ব প্রভৃতি দোষ আছে, সেইসব দোষ পুরুষের দ্বারা দৃষ্ট হলে প্রকৃতি কুলবধূর মতো লজ্জায় আর তার কাছে যান না। (সাংখ্যদর্শনম্ ৩।৭০) এই সঙ্গে যোগ করা চলে 'সাংখ্যকারিকা'র—'যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য।'—(সাংখ্যকারিকা ৬১)।

প্রকৃতিপুরুষের সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব উপমা দিয়েছেন বিয়েবাড়ীর কর্তা ও গিন্নীর। একজন নিষ্ক্রিয় হয়েও কেমন করে কর্তা, আর একজন কর্তৃত্ব না

১ কালীবর বেদান্তবাগীশ-ব্যাখ্যাত ও দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত 'সাংখ্যদর্শনম্' দ্রষ্টব্য।

থাকলেও কেমন করে সক্রিয়—এই বিস্ময়কর বক্তব্যের এর চেয়ে ভালো উপমা সাংখ্যসূত্রকার দিয়েছেন বলে মনে হয় না। সাংখ্যসূত্রের কুলবধূর উপমাটি এ প্রসঙ্গে তাঁর গল্পের উপাদাননির্মাণে একটু সহায়তা করে থাকতে পারে, যদিচ কুলবধূর আচরণ সাংখ্যসূত্রে সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে দেখা হয়েছে।

স্বামী সারদানন্দ তাঁর লীলাপ্রসঙ্গের গুরুভাব-খণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গুরুভাবের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লিখেছেন—"আধ্যাত্মিক জটিল তত্ত্বসকল বুঝাইতে ঠাকুর সাধারণতঃ যে সকল দৃষ্টান্ত ও রূপকাদি ব্যবহার করিতেন···উহাদের প্রত্যেকটির সহায়ে ঠাকুর যেন এক একটি জ্বলন্ত চিত্র দেখাইয়া ঐ জটিল বিষয় যে সম্ভবপর একথা শ্রোতার হৃদয়ে একেবারে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতেন।

"ধর, জটিল সাংখ্যদর্শনের কথা চলিয়াছে। ঠাকুর আমাদিগকে পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তির কথা বলিতে বলিতে বলিলেন, "ওতে বলে পুরুষ অকর্তা, কিছু করেন না। প্রকৃতিই সকল কাজ করেন, পুরুষ প্রকৃতির ঐ সকল কাজ সাক্ষিস্বরূপ হয়ে দেখেন, প্রকৃতিও আবার পুরুষকে ছেড়ে আপনি কোনও কাজ করতে পারেন না।"

শ্রোতার দলে শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বিশেষ কেউই ন'ন, কেউই বিশেষ বুঝতে পারছেন না দেখে তিনি বুঝিয়ে দিলেন—"ওই যে গো দেখ নি, বে-বাড়ীতে? কর্তা হুকুম দিয়ে নিজে বসে বসে আলবোলায় তামাক টানছে। গিন্নী কিন্তু কাপড়ে হলুদ মেখে একবার এখানে একবার ওখানে বাড়ীময় ছুটোছুটি করে একাজটা হল কি না, ও কাজটা করলে কি না, সব দেখচেন, শুনছেন, বাড়ীতে যত মেয়েছেলে আসছে তাদের আদর অভ্যর্থনা করচেন আর মাঝে মাঝে কর্তার কাছে এসে হাতমুখ নেড়ে শুনিয়ে যাচ্চেন—'এটা এইরকম করা হল, ওটা এই-রকম হল, এটা করতে হবে, ওটা করা হবে না' ইত্যাদি। কর্তা তামাক টানতে টানতে সব শুনছেন আর হুঁ হুঁ করে ঘাড় নেড়ে সব কথায় সায় দিচ্চেন। সেই রকম আর কি।" (লীলাপ্রসঙ্গ : গুরুভাব : উত্তরার্ধ : চতুর্থ অধ্যায়)

ব্যাধপুত্র রাজপুত্র : ছাগল ও বাঘ

উপমা ও আখ্যায়িকা মিলে সাংখ্যদর্শন একহিসাবে দার্শনিকের উদাহরণস্থান অজস্র গল্পের ভাণ্ডারস্বরূপ। কপিলের নামে প্রচলিত ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যপ্রবচনের (মূলতঃ 'তত্ত্বসমাসে'র বাইশটি সূত্রের ব্যাখ্যা) বা সাংখ্যদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়টি

'আখ্যায়িকাধ্যায়' নামেই বিখ্যাত। সূত্রের আকারে গাঁথা এই গল্পবীজগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ-কথাসাহিত্যের অন্যতম পূর্বাভাস। এর মধ্যে প্রথম সূত্রটির সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবকথিত ছাগলের পালে ব্যাঘ্রশিশুর লালিত হওয়ার গল্পটি বিশেষভাবে তুলনীয়।

সাংখ্যদর্শনের সূত্রটি এই—'রাজপুত্রবৎ তত্ত্বোপদেশাৎ।' (৪।১) অর্থাৎ তত্ত্ববিষয়ক উপদেশ শোনার ফলে রাজপুত্রের মতো বিবেকজ্ঞান জন্মাতে পারে। সংক্ষিপ্ত এই সূত্রটির ভাষ্যে একটি গল্পের রূপরেখা মেলে। ছোটবেলায় এক রাজপুত্রকে জনৈক ব্যাধ চুরি করে নিয়ে যায়। ব্যাধসমাজে থেকে মানুষ হওয়ায় রাজপুত্র নিজেকে ব্যাধই মনে করতো, এইভাবেই সে বড়ো হয়। এক অমাত্য ব্যাধরূপী রাজপুত্রের কথা জানতে পেরে তাকে রাজধানীতে নিয়ে এসে সে যে ব্যাধের ছেলে নয়, রাজার ছেলে এই কথাটি তাকে মনে করিয়ে দিল। তখন রাজার ছেলের নিজেকে ব্যাধপুত্র মনে করার ভ্রান্তি দূর হয়ে নিজের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দেখা দিল।

রামকৃষ্ণদেবের ছাগলের পালে লালিত বাঘের নিজেকে ছাগল বলেই মনে করা এ গল্পটির সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু 'কথামৃতে' রামকৃষ্ণদেবের গল্পটি সাংখ্য-দর্শনের আখ্যায়িকাপ্রকরণ থেকে নেওয়া বলে পাদটিকায় উল্লেখিত।[১] আমরা এ পর্যন্ত তেমন কোনো সূত্র পাই নি। যদি কেউ সন্ধান দিতে পারেন তো কৃতজ্ঞ থাকবো।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বাঘ ও ছাগলের গল্পটি শুনেছিলেন ন্যাংটা বা তোতাপুরীর কাছে। বেদান্তবিদ্ তোতাপুরী এ গল্পে মায়াবদ্ধ জীবের ব্রহ্মজ্ঞানলাভের দ্বারা মায়াতীত হওয়ার ব্যঞ্জনাই সঞ্চার করেছেন। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের কল্পনায় ছাগলের জায়গায় ভেড়া এবং বাঘের জায়গায় সিংহ দেখা দিয়েছে। জগজ্জালমুক্ত কেশরীর উপমা বিবেকানন্দ আচার্য শংকরের কাছ থেকে পেয়ে থাকবেন। কিন্তু গল্পটি এসেছে তোতাপুরী ও শ্রীরামকৃষ্ণের ধারা বেয়ে। কথামৃতে ২য় ও ৪র্থ ভাগে এ গল্পটি বিধৃত। আমরা ৪র্থ ভাগ থেকে গল্পটি উদ্ধৃত করি—"ন্যাংটা বাঘ আর ছাগলের পালের গল্প বলেছিল; একটা বাঘিনী ছাগলের পাল আক্রমণ করেছিল। একটা ব্যাধ দূর থেকে দেখে ওকে মেরে ফেল্লে। ওর পেটে ছানা ছিল, সেটা প্রসব হয়ে গেল। সেই ছানাটা ছাগলের সঙ্গে বড় হতে

১ কথামৃত : ৫ম ভাগ : পরিশিষ্ট : শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র : ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

লাগলো। প্রথমে ছাগলদের মায়ের দুধ খায়,—তারপর একটু বড় হলে ঘাস খেতে আরম্ভ করলে। আবার ছাগলদের মত ভ্যা ভ্যা করে। ক্রমে খুব বড় হলো—কিন্তু ঘাস খায় আর ভ্যা ভ্যা করে। কোনো জানোয়ার আক্রমণ করলে ছাগলদের মত দৌড়ে পালায়!

"একদিন একটা ভয়ঙ্কর বাঘ ছাগলদের পাল আক্রমণ করলে। সে অবাক হয়ে দেখলে যে, ওদের ভিতর একটা বাঘ ঘাস খাচ্ছিল,—ছাগলদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালালো। তখন ছাগলদের কিছু না বলে ঐ ঘাসখেকো বাঘটাকে ধরলে। সেটা ভ্যা ভ্যা করতে লাগলো। আর পালাবার চেষ্টা করতে লাগলো। তখন সে তাকে একটা জলের ধারে টেনে নিয়ে গেল। আর বল্লে, 'এই জলের ভিতর তোর মুখ দেখ। দেখ, আমারও যেমন হাঁড়ির মত মুখ, তোরও তেমনি।' তারপর তার মুখে একটু মাংস গুঁজে দিলে। প্রথমে সে কোন মতে খেতে চায় না;—তারপর একটু আস্বাদ পেয়ে খেতে লাগল। তখন বাঘটা বল্লে, 'তুই ছাগলদের সঙ্গে ছিলি আর তুই ওদের মত ঘাস খাচ্ছিলি! ধিক্ তোকে।' তখন সে লজ্জিত হলো।

"ঘাস খাওয়া কিনা কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকা। ছাগলের মত ভ্যা ভ্যা ডাকা, আর পালানো—সামান্য জীবের মতো আচরণ করা। বাঘের সঙ্গে চলে যাওয়া,—কিনা, গুরু যিনি চৈতন্য করালেন, তাঁর শরণাগত হওয়া, তাঁকেই আত্মীয় বলে জানা; নিজের ঠিক মুখ দেখা কি না স্ব স্বরূপকে চেনা।"

(কথামৃত : ৪র্থ : ২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩)

দ্বিতীয় ভাগ 'কথামৃতে' (৩রা জুন, ১৮৮৩) গল্পটি বলার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্তব্য—'গুরুর কৃপা হলে আর কোন ভয় নাই। তিনি জানিয়ে দেবেন, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি।'

রূপকের আবরণ ভেঙে পরমসত্যের ঘোষণায় শ্রীরামকৃষ্ণের সহজাত পটুতা এ গল্পটিতে মানবাত্মার অনন্ত সম্ভাবনাকে আলোকিত করেছে। একটু রূপান্তরে এ গল্প তাই বিবেকানন্দের গল্প হয়ে উঠেছে। মানুষের অন্তর্নিহিত মহিমা সম্বন্ধে এমন সুন্দর গল্প আর একটি খুঁজে পাওয়া ভার। এ গল্পের মূল যদি সাংখ্যপ্রবচনের (সাংখ্যদর্শনের) আখ্যায়িকাপ্রকরণে থেকে থাকে, তাহলে তো কথাই নেই, না থাকলেও রাজপুত্রের নিজেকে ব্যাধপুত্র মনে করার কাহিনীটিও এর সদৃশ কাহিনী। হয়তো এ কাহিনী বেদান্তের কোনো গ্রন্থে পাওয়া যেতে

পারে। কারণ গল্পটি মূলত এসেছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বেদান্তগুরু তোতাপুরীর কাছ থেকে।

শ্যেন ও ইষুকার

সাংখ্যদর্শনের আখ্যায়িকাপ্রকরণ থেকে আর দুটি গল্পসূত্র আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের গল্পপ্রসঙ্গে মনে রাখতে পারি। প্রথমটি শ্যেনপক্ষীর গল্প—'শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্' (সাংখ্যদর্শনম্ ৪।৫)—শ্যেনপক্ষীর মতো অত্যাগের দ্বারা দুঃখ এবং ত্যাগের দ্বারা সুখলাভ। পরবর্তীকালে এ গল্প বৌদ্ধজাতকে (সীলবীমংসন-জাতক) এবং ভাগবতে দেখা গিয়েছে।

দ্বিতীয় গল্পসূত্রটি (সাংখ্যদর্শনের আখ্যায়িকাপ্রকরণ থেকে)—'ইষুকারবন্নৈক-চিত্তস্য সমাধিহানিঃ।' (সাংখ্যদর্শনম্ ৪।১৪) ইষুকার বা শরনির্মাতার মতো একাগ্রচিত্তে থাকলে সমাধি ভঙ্গ হয় না। প্রথম গল্পটির মতো এ গল্পটিও ভাগবতের একাদশস্কন্ধে নবম অধ্যায়ে দেখা দিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণসাহিত্যে ভাগবতের প্রভাব ব্যাপকতর। এজন্য ভাগবত থেকে নেওয়া গল্পগুলির আলোচনা আলাদাভাবে করা চলে।

সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরিচিতি প্রসঙ্গে আমরা যে ক'টি গল্পসূত্র পেলাম, সব কটিই ঈশ্বরাভিমুখী। তাঁর পক্ষে নিরীশ্বর সাংখ্যমত গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না।

ভাগবত : অবধূতের গল্প

মহাভারতের আধ্যাত্মিক দর্শনরূপে আমরা 'গীতা'কে গ্রহণ করতে পারি। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে রয়েছে 'উদ্ধবগীতা'। সাধক ও দার্শনিকদের কাছে 'উদ্ধবগীতা' অতি উচ্চস্তরের অধ্যাত্মগ্রন্থ। আসন্ন যদুকুলধ্বংসের আগে ভক্ত সারথি উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব উপদেশাবলীই উদ্ধবগীতা। উদ্ধবগীতায় অবধূতের কাহিনীটি বিস্তৃতভাবে রয়েছে।

ভাগবতে অবধূতের গল্প শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে বলছেন—

অত্র মাং মৃগয়ন্ত্যদ্ধা যুক্তা হেতুভিরীশ্বরম্।
গৃহ্যমানৈর্গুণৈর্লিঙ্গৈরগ্রাহ্যমনুমানতঃ॥

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
অবধূতস্য সংবাদং যদোরমিততেজসঃ ॥
[ভাগবত ১১শ স্কন্ধ : ৭ম অধ্যায় : ১৯, ২০]

"এই মানবদেহেই যুক্ত ভক্তিমান পুরুষেরা সাধারণ দৃষ্টির অতীত আমাকে গৃহ্যমাণ গুণ, রূপ, হেতু ও লিঙ্গের অনুমানে নির্ণয় করেন।"

এই প্রসঙ্গে অবধূত ও পরমবিবেকী যদুর সংবাদ বিষয়ে পুরানো ইতিহাসের উদাহরণ বিদ্বানেরা দিয়ে থাকেন।[১]

যদু ও অবধূতের গল্পটি এই রকম—একদিন পরম ধার্মিক যদুর সঙ্গে অবধূতের দেখা। বয়সে তরুণ, সদসদ্ বিচারসম্পন্ন, নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণকারী, দেহের প্রতি নিদারণ উপেক্ষা—এই 'কিঞ্চিৎ জড়োন্মত্ত পিশাচবৎ' অবধূতকে দেখে যদু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আয়ু, যশ আর ঐশ্বর্যের কামনায় সাধারণ মানুষ ধর্ম-অর্থ-কাম-চর্চায় নিযুক্ত থাকে। আপনি সর্ব বিষয়ে সমর্থ হয়েও এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন? বিষয়সুখের ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধচিত্ত আপনার আনন্দের কারণ কি?

উত্তরে অবধূত বললেন—

সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ।
যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোঽটামীহ তান্ শৃণু ॥
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্‌গজঃ ॥
মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎ সর্প ঊর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ ॥
এতে মে গুরবো রাজন্ চতুর্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।
শিক্ষাবৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ ॥
[ভাগবত ১১শ স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায় : ২২, ২৬, ২৭, ২৮]

'রাজন্, বুদ্ধি পূর্বক আমি যাঁদের শরণাগত হয়েছি এমন আমার অনেক গুরু আছেন, যে গুরুদের কাছে শিক্ষালাভ করে আমি আধ্যাত্মিক শান্তি ও আনন্দলাভ করেছি। আমার সেই গুরুদের নাম শুনুন—প্রথম পৃথিবী, দ্বিতীয় বায়ু, তৃতীয় আকাশ, চতুর্থ জল, পঞ্চম অগ্নি, ষষ্ঠ শশধর, সপ্তম প্রভাকর, অষ্টম পারাবত, নবম

---

১ শ্রীমদ্ভাগবত : বহরমপুর সংস্করণ (১৩০০ সাল) অনুসরণে

অজগর, দশম সিন্ধু, একাদশ পতঙ্গ, দ্বাদশ মৌমাছি, ত্রয়োদশ হস্তী, চতুর্দশ মধুহরণকারী, পঞ্চদশ হরিণ, ষোড়শ মীন, সপ্তদশ পিঙ্গলা, অষ্টাদশ কুরর, একোনবিংশ বালক, বিংশ কুমারী, একবিংশ শরনির্মাতা, দ্বাবিংশ সর্প, ত্রয়োবিংশ ঊর্ণনাভ, চতুর্বিংশ সুপেশকৃৎ (কাঁচপোকা)।'

এই চব্বিশ গুরুর মধ্যে আমিষখণ্ড মুখে পাখীর গল্প এবং শরনির্মাতার গল্পটি ছাড়া সাংখ্যসূত্রেও পিঙ্গলা এবং কুমারীর গল্প রয়েছে। শ্রীধরস্বামীর মতে মধুকর, মধুহারী এবং পিঙ্গলা—এই তিনটি গল্পের গুরুরা অসাধারণ। তার পরের স্তরে কপোত, মীন, হরিণ, কুমারী, গজ, সর্প, পতঙ্গ, কুরর। অবশিষ্ট ক্ষিতি প্রভৃতি বাকি এগারোজন আরো সাধারণ স্তরের।

ভাগবতের এই অবধূত 'দত্তাত্রেয়' নামে ভগবানের অন্যতম অবতাররূপে স্বীকৃত। তবে উপদেশদাতা হিসাবে তাঁর বৈশিষ্ট্য আর সবার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করায়। এ বৈশিষ্ট্য রামকৃষ্ণদেবের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। বিভিন্ন ধর্মসাধনার গুরুদের কাছে যেমন তিনি সাধনপন্থা গ্রহণ করেছেন, তেমনি আবার সব ধর্মমতের মূল সত্যকে এক জেনে বলেছেন, 'যত মত তত পথ', 'অনন্ত মত, অনন্ত পথ'।

শ্রীমদ্ভাগবতে অবধূত 'কুরর'-গুরু প্রসঙ্গে বলেছেন—

পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্ যৎ প্রিয়তমং নৃণাম্।
অনন্তং সুখমাপ্নোতি তদ্ বিদ্বান্ যস্ত্বকিঞ্চনঃ॥
সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলিনোঽন্যে নিরামিষাঃ।
তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত॥

[ভাগবত ১১শ স্কন্ধ, নবম অধ্যায় : ১, ২]

'প্রিয় বস্তু গ্রহণের ফলেই দুঃখের সৃষ্টি, এ কথা জেনে যিনি পরিগ্রহ থেকে বিরত হন, সেই বিদ্বান অনন্ত সুখের অধিকারী হন।

'মুখে করে আমিষের টুকরো নিয়ে যাচ্ছে, এমন একটি কুরর (বাজ) পাখীকে অন্যান্য পাখীরা হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন আমিষের টুকরোটি ফেলে দিয়ে কুরর পাখীটি স্বস্তি লাভ করে।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখে অবধূতের গল্পটি যেভাবে রূপান্তরিত হয়ে দেখা

দিয়েছে, তাতে বর্ণনাশক্তি ও অধ্যাত্ম অনুভবের গভীরতা এ দুয়ের সহজ-মিলন লক্ষণীয়। কথামৃতের প্রথম ভাগে (২৬শে নভেম্বর, ১৮৮৩) গল্পটি এসেছে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রসঙ্গে। শিবনাথের ঈশ্বরানুরাগের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরাগ। কিন্তু তিনি জানেন, নানা সাংসারিক কর্মে ব্যস্ত শিবনাথ সবটা সময় ঈশ্বরস্মরণে দিতে পারেন না। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন—

"বিষয়কর্ম করলেই অশান্তি হয়, অনেক ভাবনা-চিন্তা জোটে।

"শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, অবধূত চব্বিশ গুরুর মধ্যে চিলকে একটি গুরু মনে করেছিলেন। এক জায়গায় জেলেরা মাছ ধরতেছিল, একটি চিল এসে একটা মাছ ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। কিন্তু মাছ দেখে পেছনে পেছনে প্রায় এক হাজার কাক চিলকে তাড়া করে গেল; আর সঙ্গে সঙ্গে কা-কা করে বড় গোলমাল করতে লাগলো। মাছ নিয়ে চিল যে দিকে যায়, কাকগুলোও তাড়া করে সেই দিকে যেতে লাগলো। দক্ষিণ দিকে চিলটা গেল, কাকগুলোও সেই দিকে গেল, আবার উত্তর দিকে যখন সে গেল, ওরাও সেই দিকে গেল। এইরূপে পূর্বদিকে ও পশ্চিম দিকে চিল ঘুরতে লাগলো। শেষে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে মাছটা তার কাছ থেকে পড়ে গেল। চিল তখন নিশ্চিন্ত হয়ে একটা গাছের উপর বসলো। বসে ভাবতে লাগলো—ঐ মাছটা যত গোল করেছিল। এখন মাছ কাছে নাই আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

"অবধূত চিলের কাছে এই শিক্ষা করলেন যে, যতক্ষণ মাছ সঙ্গে থাকে অর্থাৎ বাসনা থাকে ততক্ষণ কর্মঃ থাকে আর কর্মের দরুন ভাবনা, চিন্তা, অশান্তি। বাসনা ত্যাগ হলেই কর্মক্ষয় হয়, আর শান্তি হয়।"

চিলের উড়ে যাওয়ার বর্ণনাভঙ্গীর সঙ্গে সহজেই জাহাজের মাস্তলে বসা পাখীটির উড়ে উড়ে সমুদ্র পার হওয়ার প্রচেষ্টার কথা মনে পড়ে। মাস্তলে বসা পাখীটির গল্পে আদিগন্ত সমুদ্রের পটভূমি এমন এক বিস্তার ও গভীরতার সঞ্চার করেছে, যার সঙ্গে চিলের গল্পটির ঠিক তুলনা হয় না। কিন্তু মূল বক্তব্য দুটি গল্পেই প্রায় এক। সাংখ্যদর্শনে এবং জাতকের গল্পে শ্যেন, ভাগবতে কুরর, কথামৃতে চিল—গল্পের দিক থেকে এই পরিবর্তনটুকু দ্রষ্টব্য।

ঐ একই দিনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবধূতের আর এক্ গুরু মৌমাছির কথা বলেছেন। মৌমাছি এবং মৌচোর দু'জনের কথাই ভাগবতের গল্পে রয়েছে।

একজন মধুকর, অন্যজন মধুহা। মৌচোরের গল্পটিও মূলতঃ মৌমাছিরই গল্প। ভাগবতের গল্পটি এই—

> ন দেয়ং নোপভোগ্যঞ্চ লুব্ধৈর্যদ্দুঃখসঞ্চিতম্।
> ভুঙ্ক্তে তদপি তচ্চান্যো মধুহেবার্থবিন্মধু॥
> সুদুঃখোপার্জিতৈর্বিত্তৈরাশাসানাং গৃহাশিষঃ।
> মধুহেবাগ্রতো ভুঙ্ক্তে যতির্বৈ গৃহমেধিনাম্॥
>
> (ভাগবত ১১।৮।১৫, ১৬)

'মৌমাছিকে অনুসরণ করে মৌচোর যেমন তরুকোটরে মৌচাক থেকে সঞ্চিত মধু হরণ করে, তেমনি যারা কোনোরকম দানধ্যান না করে অর্থলোভে কেবল সঞ্চয়ে ব্যস্ত, তাদের সেই সঞ্চিত ধন, অন্যেরাই ভোগ করে। নিপুণ বিষয়ী লোকদের অতি দুঃখে উপার্জিত ধন থেকে যে সব অন্নাদি হয়, আগে তা সাধুসন্ন্যাসীরাই ভোগ করেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, "অবধূতের আর একটি গুরু ছিল মৌমাছি। মৌমাছি অনেক কষ্টে অনেক দিন ধরে মধু সঞ্চয় করে। কিন্তু সে মধু নিজের ভোগ হয় না। আর একজন এসে চাক ভেঙে নিয়ে যায়। মৌমাছির কাছে অবধূত এই শিখলেন যে সঞ্চয় করতে নাই। সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর করবে। তাদের সঞ্চয় করতে নাই।"

ভাগবতের গল্পটির সঙ্গে সামান্য একটু পার্থক্য এখানে মৌমাছির উপরে জোর দেওয়ায়। ভাগবতে মধুহা বা মৌচোরই গুরু। অবধূতের গুরুর তালিকায় মধুকরও আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পের কেন্দ্র 'মৌমাছি'কে আমরা অবধূতের এই বর্ণনায় পাবো—

> স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্ গ্রাসং দেহো বর্তেত যাবতা।
> গৃহানহিংসন্নাতিষ্ঠেদ্ বৃত্তিং মাধুকরীং মুনিঃ॥
> অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
> সর্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥
> সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্ণীত ভিক্ষিতম্।
> পাণিপাত্রোদরামাত্রো মক্ষিকেব ন সংগ্রহী॥
> সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা না সংগৃহ্ণীত ভিক্ষুকঃ।
> মক্ষিকা ইব সংগৃহ্ন্ সহ তেন বিনশ্যতি॥ (ভাগবত ১১।৮।৯—১২)

'যেটুকু আহারের দ্বারা শরীর রক্ষা হয়, সেইটুকুই গ্রহণীয়। সন্ন্যাসী গৃহস্থকে পীড়ন না করে অল্প অল্প সংগ্রহ করে মাধুকরীর দ্বারা জীবনধারণ করবেন।

মৌমাছি যেমন ফুল থেকে মধুই সংগ্রহ করে, তেমনি বিবেকবান মানুষ সামান্য ক্ষুদ্র ও মহৎ শাস্ত্ররাশি থেকে সর্বতোভাবে সারটুকুই গ্রহণ করবেন।

সন্ধ্যার সময় অথবা আগামীকাল এটুকু খাবো—একথা মনে রেখে কখনো ভিক্ষা করবেন না। করপাত্র অথবা উদরপাত্র হবেন[১]—মৌমাছির মতো কখনো সঞ্চয়ী হবেন না। সন্ন্যাসী কখনো এইভাবে সঞ্চয় করবেন না। যদি করেন তাহলে মৌমাছির মতো মৌচাকের (সঞ্চিত বস্তুর) সঙ্গে বিনষ্ট হবেন।'

ভাগবতের মধুকর মধুহা—এই দুজনে মিলে রামকৃষ্ণদেবের মৌমাছির গল্প গড়ে উঠেছে। সন্ন্যাসীর সর্বত্যাগের এ উদাহরণের শ্রেষ্ঠ প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণদেব। অর্থসঞ্চয় তো দূরের কথা, প্রয়োজনে এতটুকু মুখশুদ্ধির মসলাও তিনি সঞ্চয় করতে পারতেন না।

অবধূতের আর এক গুরু—ইষুকার বা শরনির্মাতা অর্থাৎ ব্যাধ। এই ব্যাধের গল্পটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পে ভাগবত থেকে একটু পরিবর্তিত হয়েছে। সেইসঙ্গে আর একটি গল্পও দেখা দিয়েছে—যা ব্যাধের তন্ময়তার অনুরূপ এবং বাংলার পল্লী অঞ্চলের এক স্বাভাবিক চিত্র।

সাংখ্যদর্শনের আখ্যায়িকাপ্রকরণে ইষুকার বা শরনির্মাতার কাহিনীসম্বলিত সূত্র (৪।১৩) ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার একটি গল্প বলেছেন। একাগ্রচিত্ত শরনির্মাতা যেমন পাশ দিয়ে রাজা চলে গেলেও দেখতে পায় না, সেইরকম একাগ্রতার ফলেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

ভাগবতে অবধূতের অন্যতম গুরু ইষুকার সম্বন্ধে রয়েছে—

তদৈবমাত্মন্যবরুদ্ধচিত্তো
ন বেদ কিঞ্চিৎ বহিরন্তরং বা।
যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্ত—
মিষৌ গতাত্মা ন দদর্শ পার্শ্বে॥ (ভাগবত : ১১।৯।১৩)

'ব্যাধ যেমন একাগ্রচিত্তে লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগী হওয়ায় নানা বাজনা বাজিয়ে রাজার চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পায় নি, শ্রেষ্ঠ ভক্তেরা তেমনি ভগবানে

---

১ যেটুকু হাতে ধরে সেটুকু খাবেন, অথবা যেটুকুতে পেট ভরে সেইটুকু খাবেন।

একান্ত অভিনিবিষ্ট থাকায় বাইরের বা ভিতরের আর কিছুই জানতে পারেন না।'[১]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপন সাধকজীবনের তন্ময়তাপ্রসঙ্গে এই গল্পটি একটু অন্যভাবে শুনিয়েছিলেন—

"গভীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়। একজন ব্যাধ পাখী মারবার জন্য তাগ্ করছে। কাছ দিয়ে বর চলে যাচ্ছে, সঙ্গে বরযাত্রীরা, কত রোশনাই বাজনা, গাড়ী, ঘোড়া—কতক্ষণ ধরে কাছ দিয়ে চলে গেল। ব্যাধের কিন্তু হুঁশ নাই। সে জানতে পারলে না যে, কাছ দিয়ে বর চলে গেল।"

ভাগবতের গল্পের নৃপতির জায়গায় এখানে বর দেখা দিয়েছে। লোকমুখে এই জাতীয় গল্পের কিছু কিছু অদলবদল স্বাভাবিক। এক হিসাবে বরের যাত্রা আর একটু ঘনিষ্ঠ কল্পনার পরিচায়ক। তবে এই গল্পটির সূত্রে রামকৃষ্ণদেব আর একটি গল্প উপস্থাপিত করেছেন। গ্রাম-বাংলার পটভূমিতে সে গল্পটি আরো মনোহারী।

"একজন একলা একটি পুকুরের ধারে মাছ ধরচে। অনেকক্ষণ পরে ফাত্‌নাটা নড়তে লাগল, মাঝে মাঝে কাত হতে লাগল। সে তখন ছিপ হাতে করে টান মারবার উদ্যোগ করছে। এমন সময় একজন পথিক কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছে, মহাশয় অমুক বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী কোথায় বলতে পারেন? কোন উত্তর নাই। এ ব্যক্তি তখন ছিপ হাতে করে টান মারবার উদ্যোগ করছে। পথিক বার বার উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল, মহাশয়, অমুক বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী কোথায় বলতে পারেন? সে ব্যক্তির হুঁশ নাই। তাঁর হাত কাঁপছে, কেবল ফাত্‌নার দিকে দৃষ্টি। তখন পথিক বিরক্ত হয়ে চলে গেল। সে অনেক দূরে চলে গেছে, এমন সময় ফাত্‌নাটা ডুবে গেল, আর ও ব্যক্তি টান মেরে মাছটাকে আড়ায় তুললে। তখন গামছা দিয়ে মুখ মুছে, চীৎকার করে পথিককে ডাকছে—ওহে—শোনো শোনো! পথিক ফিরতে চায় না, অনেক ডাকাডাকির পর ফিরলো। এসে বলছে, কেন মশায়! আবার ডাকছ কেন? তখন সে বললে, তুমি আমায় কি বলছিলে? পথিক বললে, তখন কতবার করে জিজ্ঞাসা করলুম—আর

---

১ উপনিষদের একটি উপমা এক্ষেত্রে তুলনীয়—

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥ মুণ্ডক। ২।৪

এখন বলছো কি বললে ? লোকটি বললে, তখন যে ফাতনা ডুবছিল, তাই আমি কিছুই শুনতে পাই নাই।" (কথামৃত : ৩য় : ১২ই এপ্রিল, ১৮৮৩)

গল্পটি বলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর একটি অপূর্ব উপমায় এই ধ্যানতন্ময়তাকে ফুটিয়েছেন—"গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন বহির্মুখ থাকে না—যেন বার বাড়িতে কপাট পড়লো। ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয় ! রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—বাইরে পড়ে থাকবে।"

অবধূতের আর এক গুরু সুপেশকৃৎ বা কাঁচপোকার উদাহরণও শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্যবহার করেছেন, তবে সেটি গল্পের আকারে নয়। অনুক্ষণ ঈশ্বরতন্ময়তার ফলে মানুষের ঈশ্বরদর্শন বা ঈশ্বরসত্তায় বিলীন হওয়ার উদাহরণরূপে আরশোলার কাঁচপোকায় রূপান্তরের কাহিনী এক পরমাশ্চর্য ঘটনা। অবধূতের এই চতুর্বিংশতিতম গুরু আমাদেরও নমস্ত। 'স্নেহ দ্বেষ বা ভয়ে যে ব্যক্তি যে বস্তুতে অনন্যভাবে মন স্থাপন করে সে সেই রূপই লাভ করে। হে রাজা ! কোটরে প্রবিষ্ট কীট তেলাপোকা কাঁচপোকাকে ধ্যান করে সেই দেহেই কাঁচপোকার সাদৃশ্য লাভ করে।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ উদাহরণটিকে কথ্যবাংলায় রূপায়িত করে বলেছেন—'কুমুরে পোকা চিন্তা করে আরশুলা কুমুরে পোকা হয়ে যায় ; কি রকম জানো ? যেমন হাঁড়ির মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে হয়।' (কথামৃত ১ম : ২৯শে মার্চ ১৮৮৩)

'কুমুরে পোকা ভেবে ভেবে আরশুলা নিশ্চল হয়ে যায়। নড়ে না ; শেষে কুমুরে পোকাই হয়ে যায়। ভক্তও তাঁকে ভেবে ভেবে অহংশূন্য হয়ে যায়। আবার দেখে 'তিনিই আমি', 'আমিই তিনি।' আরশুলা যখন কুমুরে পোকা হয়ে যায়, তখনই সব হয়ে গেলে। তখনই মুক্তি।'

(কথামৃত : ৫ম : ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৫)

ভাগবতে মূল শ্লোকটি এই—যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎসরূপতাম্ ॥
কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্বরূপমসংত্যজন্ ॥

(ভাগবত ১১।৯।২২-২৩)

বেদান্ত : অদ্বৈতবাদ : মায়া

অদ্বৈতবাদী দর্শনে মায়া সৎও নয়, অসৎও নয়, অনির্বচনীয়া শক্তি। এই মায়ার আবরণে জীব আপন স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। মায়া অপসৃত হলেই পরম সত্যের উদ্ভাসন।

রামকৃষ্ণদেবের ভাষায়—'মেঘেতে যেমন সূর্যকে ঢেকে রাখে, মায়াতে তেমনি ঈশ্বরকে ঢেকে রেখেছে, মেঘ সরে গেলেই যেমনি সূর্যকে দেখা যায়, মায়া দূর হলে তেমনি ঈশ্বরকে দেখা যায়।'

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ : সুরেশচন্দ্র দত্ত সংগৃহীত : পৃঃ ৩২-৩৩]

কথামৃতেও এ উপমাটি লক্ষণীয়—'জীবের অহংকারই মায়া। এই অহংকার সব আবরণ করে রেখেছে।…এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না, মেঘ সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহংবুদ্ধি যায়, তাহলে ঈশ্বরদর্শন হয়।…এই দেখ, আমি এই গামছাখানা দিয়ে মুখের সামনে আড়াল করছি, আর আমায় দেখতে পাচ্ছ না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান সকলের চেয়ে কাছে, তবু এই মায়া-আবরণের দরুন তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না।"

(কথামৃত : ১ম : ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮২)

এই মায়া বা অধ্যাস থেকে মুক্তির উপায় মায়ার স্বরূপকে চিনতে পারা। মাত্র আড়াই হাত দূরে রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ দেখতে পাচ্ছেন না, মধ্যবর্তিনী সীতার জন্য। এইদিনের আলোচনাতেই উদাহরণটি আমরা পেয়েছি। সূর্য ও মেঘের উপমাটি আমরা বেদান্ত আলোচনায় দুটি ক্ষেত্র থেকে মনে করতে পারি।

সদানন্দ যতির 'বেদান্তসারে'—"আবরণশক্তিঃ তাবৎ অল্পঃ অপি মেঘঃ অনেক-যোজনায়তং আদিত্যমণ্ডলং অবলোকতৃনয়নপথপিধায়কতয়া যথা আচ্ছাদয়তি ইব, তথা অজ্ঞানং পরিচ্ছিন্নম্ অপি আত্মানং অপরিচ্ছিন্নম্ অসংসারিণং অবলোকয়িতৃবুদ্ধিপিধায়কতয়া আচ্ছাদয়তি ইব তাদৃশং সামর্থ্যম্।"

সদানন্দ যতি-উদ্ধৃত শঙ্কর-শিষ্য হস্তামলকের শ্লোক—

ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কম্
যথা নিষ্প্রভম্মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ।
তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥

(হস্তামলক : ১০ শ্লোক : সদানন্দ যতির 'বেদান্তসার')

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর 'বাণী ও বিচার' (১ম ভাগ) গ্রন্থে 'কথামৃতে'র ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে উদ্ধৃত অংশ তুটির অনুবাদ করেছেন—'মেঘ সামান্য হলেও যেমন অনেক যোজন বিস্তৃত সূর্যমণ্ডলকে (দৃষ্টিকারী) মানুষের চক্ষু আবৃত করে, তেমনি অজ্ঞানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হলেও অপরিচ্ছিন্ন অসংসারী আত্মাকে যেন আবৃত করে ও মানুষ তার জন্য মনে করে আত্মা নাই।' 'মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন বা আবৃত অতি মূঢ় ব্যক্তি যেমন সূর্যকে মেঘাচ্ছন্ন ও নিষ্প্রভ মনে করে, তেমনি যিনি মূঢ়দৃষ্টি ব্যক্তির নিকট বদ্ধের মতো প্রকাশিত হন তিনি সেই নিত্য উপলব্ধি-স্বরূপ আত্মা।' (পৃঃ ১৯)

বাস্তবিক, সূর্য, স্বয়ম্প্রকাশ। মেঘ আমাদেরই দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। মায়া কেবল জীবের পক্ষে, ব্রহ্ম মায়ার দ্বারা কখনো আবদ্ধ হ'ন না।

মায়ার এই মেঘবৎ ভূমিকাপ্রসঙ্গে আমরা সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতির আচরণ মনে রাখতে পারি। নৃত্য শেষে নর্তকীর বিরতি এবং আপন পরিচয় প্রকাশের ফলে কুলবধূর লজ্জায় দূরে অপসরণ—এ তুটিও মায়াকে চিনতে পারলে মায়া চলে যাওয়ার উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যায়।

রামকৃষ্ণদেবের গল্পে এই মায়ার অপসারণ সম্বন্ধে তুটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক। প্রথমটি বাঘের ছাল বা মুখোস পরে হরি বা 'হরের' ভয় দেখানোর গল্প।

"মায়াকে যদি চিনতে পার, আপনি লজ্জায় পালাবে। একজন বাঘের ছাল পরে ভয় দেখাচ্ছে। যাকে ভয় দেখাচ্ছে, সে বললে, আমি তোকে চিনেছি—তুই আমাদের হরে। তখন সে হেসে চলে গেল—আর একজনকে ভয় দেখাতে গেল।' (কথামৃত : ২য় : ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩)

সুরেশ দত্ত-সংগৃহীত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশে বাঘের ছালের জায়গায় বাঘের মুখোশ রয়েছে। গল্পটিও আর একটু বিস্তৃত। এই সঙ্গে একটি গল্প সুরেশ দত্তের সংগ্রহে আছে, যেটি 'কথামৃতে' অনুপস্থিত। সে গল্পটিও চমৎকার—

"মায়াকে চিনতে পারলে সে তখনি পালায়। এক গুরু শিষ্যবাড়ী যাচ্ছিলেন, সঙ্গে চাকর ছিল না। পথের মাঝে এক মুচিকে দেখতে পেয়ে বললেন, ওরে আমার সঙ্গে যাবি? ভাল খেতে পাবি, আদরে থাকবি, চলনা। মুচি বললে, ঠাকুর আমি অতি নীচ জাত, কেমন করে আপনার চাকর হয়ে যাব? গুরু বললেন, তাতে তোর কোন চিন্তা নাই, তুই কাকেও আপনার পরিচয় দিস নি, কি কারু সঙ্গে আলাপ করিস নি। মুচি রাজী হলো। সন্ধ্যার

সময় শিষ্য-বাড়ীতে গুরু সন্ধ্যা করছেন, এমন সময় আর একজন ব্রাহ্মণ এসে সেই চাকরকে বললেন, 'অমুক জায়গা থেকে আমার জুতো-জোড়াটা এনে দে ত ?" চাকর কথা কইলে না। ব্রাহ্মণ আবার বললেন, সে তাতেও চুপ করে রইলো। ব্রাহ্মণ তিন চারবার বললেন, সে তবুও নড়লো না। শেষে ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আরে বেটা, ব্রাহ্মণের কথা শুনিস নে, তুই কি জাত, মুচি নাকি ?' মুচি একথা শুনে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গুরুর দিকে চেয়ে বললে, "ঠাকুরমশায় গো! ঠাকুরমশায় গো। আমায় চিনেছে আমি পালাই।"

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ : পৃঃ ৭৩)

যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ :
যখনই বৈরাগ্য হবে তখনই সংসার ত্যাগ করবে

আত্মজ্ঞানলাভের জন্য সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই সন্ন্যাস। এই বৈরাগ্যের আদর্শ নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দু তিনটি গল্প 'কথামৃতে' রয়েছে। প্রথম গল্পটির সহজ ঘরোয়া ভঙ্গী থেকে আকস্মিক উচ্চগ্রামে উত্তরণ, ভারতবর্ষের বহুযুগের অর্জিত পুণ্যসংস্কারের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। 'জাবালোপনিষদে'র 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'—কথাটি এই আদর্শেরই মহৎ বাণীরূপে সাধকজগতে প্রচলিত। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—"যাই বিবেক এলো, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করলে।" উদাহরণটির সংলাপকুশলতাও নাট্যরসের উপাদান।

"একজন গামছা কাঁধে স্নান করতে যাচ্ছে। পরিবার বললে, তুমি কোনও কাজের নও, বয়স বাড়ছে, এখনও এসব ত্যাগ করতে পারলে না। আমাকে ছেড়ে তুমি একদিনও থাকতে পার না। কিন্তু অমুক কেমন ত্যাগী।

স্বামী—কেন, সে কি করেছে ?

পরিবার—তার ষোলজন মাগ, সে এক-একজন করে তাদের ত্যাগ করেছে। তুমি কখনও ত্যাগ করতে পারবে না।

স্বামী—এক একজন করে ত্যাগ! ওরে খেপী, সে ত্যাগ করতে পারবে না। যে ত্যাগ করে সে কি একটু একটু করে ত্যাগ করে ?

পরিবার (সহাস্তে)—তবু তোমার চেয়ে ভাল।

স্বামী—খেপী, তুই বুঝিস না। তার কর্ম নয়, আমিই ত্যাগ করতে পারব। এই দেখ, আমি চললুম।" [কথামৃত : ৩য় : ১২ই এপ্রিল, ১৮৮৫]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে এই গল্পটি তীব্রবৈরাগ্যের উদাহরণ। ঈশ্বরলাভের সঙ্কল্প মনে জাগা মাত্র ঈশ্বরের বিরোধী সব কিছু নিঃশেষে ত্যাগ। কথামৃতের চতুর্থ খণ্ডে (২৩শে মার্চ, ১৮৮৪) এই গল্পটির পরিসমাপ্তিতে আর একটু যোগ করেছেন—"সে বাড়ীর গোছগাছ না করে—সেই অবস্থায়—কাঁধে গামছা—বাড়ী থেকে চলে গেল।—এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য।"

সেই সঙ্গে মন্দ বৈরাগ্যের উদাহরণও ঐদিনের আলাপচারীতে রয়েছে।

মানবচরিত্রের স্তরভেদ অনুধাবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অধ্যাত্মদৃষ্টির সূক্ষ্ম তীব্রতা এমনিভাবে মুহূর্তে সত্যকে অপাবৃত করে। তীব্র ও মন্দ বৈরাগ্যের দুটি গল্পই আমাদের বৈরাগ্যবাদের দেশে চারপাশেই চোখে পড়বে। তবে বৈরাগ্যের শুদ্ধতম উদাহরণ তিনি নিজে। বিবেকানন্দের ভাষায় 'ত্যাগীশ্বর'।

বৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একালে অনেক বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বিশেষতঃ সাম্যবাদী বা মানবিকতাবাদী দার্শনিকেরা অনেকেই বৈরাগ্যকে জীবনবিমুখতা অথবা শোষণের নামান্তর বা opium of the people মনে করে সহজেই এর বিরুদ্ধে রায় দেন। একথাও ঠিক যে প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শই প্রাধান্য লাভ করতো। তবু 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' কথাটি অনুধাবন করলে একথাই কি মনে হয় না যে 'সংসারনিষ্ঠ' হয়ে তবে ব্রহ্ম-অনুধ্যান নয়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনই তাঁদের আদর্শ ছিল? জনক, যাজ্ঞবল্ক্য বা একালের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির উদাহরণ সত্ত্বেও প্রশ্ন করা চলে বাস্তবক্ষেত্রে ক'জন সাধক সংসার ও ব্রহ্মে সমান মনোযোগ রাখতে পারেন? যে কোনো একটি দিকে বেশী ঝোঁক পড়বেই। 'বৃহদারণ্যকে' যাজ্ঞবল্ক্যের তাই সংসার ত্যাগ—'বিজহার'। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংসারবাসনা এসে অধ্যাত্মসাধনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। একটি বড় আদর্শের নামে তখন মান, যশ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এবং এর ফলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ সবই পর্যায়ক্রমে দেখা দিতে থাকে।

সংসারের মমতাবন্ধন কেমন করে মানুষকে বিড়ালছানা বা কুকুরছানা পুষিয়ে সংসার করায় তার উদাহরণ শ্রীরামকৃষ্ণসাহিত্যে রয়েছে। এমন কি তরুণ নরেন্দ্রনাথও শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যস্পর্শে সমাধিস্থ হতে গিয়ে তথাকথিত আপনজনদের কথা ভেবে ব্যাকুল হয়েছিলেন।

"নরেন্দ্র যখন প্রথম প্রথম আসে, ওর বুকে হাত দিতে বেহুঁশ হয়ে গেল। তারপর চৈতন্য হলে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, ওগো আমার এমন করলে

কেন? আমার যে বাবা আছে, আমার যে মা আছে গো! 'আমার' 'আমার' করা এটি অজ্ঞান থেকে হয়।"—এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গুরুশিষ্যের দুটি গল্প বলেছিলেন। [কথামৃত : ৩য় : ৯ই মে, ১৮৮৫]

"গুরু শিষ্যকে বললেন, সংসার মিথ্যা; তুই আমার সঙ্গে চলে আয়। শিষ্য বললে, ঠাকুর, এরা আমায় এত ভালবাসে—আমার বাপ, আমার মা, আমার স্ত্রী—এদের ছেড়ে কেমন করে যাব। গুরু বললেন, তুই 'আমার' 'আমার' করছিস বটে, আব বলছিস ওরা ভালবাসে, কিন্তু ও সব ভুল। আমি তোকে একটা ফন্দি শিখিয়ে দিচ্ছি, সেইটি করিস্, তাহলে বুঝবি, সত্য ভালবাসে কি না। এই বলে একটা ঔষধের বড়ি তার হাতে দিয়ে বললেন, এইটি খাস, মড়ার মতন হয়ে যাবি। তোর জ্ঞান যাবে না, সব দেখতে শুনতে পাবি। তারপর আমি গেলে তোর ক্রমে ক্রমে পূর্বাবস্থা হবে।

শিষ্যটি ঠিক ঐরূপ করলে। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। মা, স্ত্রী সকলে আছড়া-পিছড়ি করে কাঁদছে। এমন সময় একটি ব্রাহ্মণ এসে বললে, কি হয়েছে গা? তারা সকলে বললে, এ ছেলেটি মারা গেছে। ব্রাহ্মণ মরা মানুষের হাত দেখে বললেন, সে কি, এত মরে নাই। আমি একটি ঔষধ দিচ্ছি, খেলেই সব সেরে যাবে। বাড়ির সকলে তখন যেন হাতে স্বর্গ পেলে। তখন ব্রাহ্মণ বললেন, তবে একটি কথা আছে। ঔষধটি আগে একজনের খেতে হবে, তার পর ওর খেতে হবে। যিনি আগে খাবেন, তাঁর কিন্তু মৃত্যু হবে। এর ত অনেক আপনার লোক আছে দেখছি, কেউ না কেউ অবশ্য খেতে পারে। মা কি স্ত্রী এঁরা খুব কাঁদছেন, এঁরা অবশ্য পারেন।

তখন তারা সব কান্না থামিয়ে চুপ করে রইল। মা বললেন, তাইত, এই বৃহৎ সংসার, আমি গেলে, কে এইসব দেখবে শুনবে, এই বলে ভাবতে লাগলে। স্ত্রী এইমাত্র এই বলে কাঁদছিল,—দিদি গো, আমার কি হলো গো! সে বললে, তাই ত, ওঁর যা হবার হয়ে গেছে। আমার দুটি তিনটি নাবালক ছেলে মেয়ে—আমি যদি যাই এদের কে দেখবে।

শিষ্য সব দেখছিল, শুনছিল। সে তখন দাঁড়িয়ে উঠে পড়ল; আর বললে, গুরুদেব, চলুন, আপনার সঙ্গে যাই।"

প্রথম ও দ্বিতীয় গল্পটির প্রতিপাদ্য একই। তবু দ্বিতীয় গল্পের বর্ণনায় অন্তর্লীন ব্যঙ্গটুকু আরো পরিস্ফুট।

"আর একজন শিষ্য গুরুকে বলেছিল, আমার স্ত্রী বড় যত্ন করে, ওর জন্য গুরুদেব, যেতে পারছি না। শিষ্যটি হঠযোগ করতো। গুরু তাকেও একটি ফন্দি শিখিয়ে দিলেন। একদিন তার বাড়িতে খুব কান্নাকাটি পড়েছে। পাড়ার লোক এসে দেখে হঠযোগী ঘরে আসনে বসে আছে—এঁকে বেঁকে আড়ষ্ট হয়ে। সব্বাই বুঝতে পারলে, তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। স্ত্রী আছড়ে কাঁদছে, ওগো, আমাদের কি হলো গো—ওগো, তুমি আমাদের কি করে গেলে গো—ওগো দিদি গো, এমন হবে তা জানতাম না গো! এদিকে আত্মীয় বন্ধুরা খাট এনেছে, ওকে ঘর থেকে বার করছে।

এখন একটি গোল হ'ল। এঁকে বেঁকে আড়ষ্ট হয়ে থাকাতে সে দ্বার দিয়ে বেরুচ্ছে না। তখন একজন প্রতিবেশী দৌড়ে একটি কাটারি লয়ে দ্বারের চৌকাঠ কাটতে লাগলো। স্ত্রী অস্থির হয়ে কাঁদছিল, সে দুম দুম শব্দ শুনে দৌড়ে এল। এসে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলে, ওগো, কি হয়েছে গো! তারা বললে, ইনি বেরুচ্ছেন না, তাই চৌকাঠ কাটছি। তখন স্ত্রী বললে, ওগো অমন কর্ম করো না গো।—আমি এখন রাঁড় বেওয়া হলুম। আমার আর দেখবার লোক কেউ নাই, কটি নাবালক ছেলেকে মানুষ করতে হবে! এ দুয়ার গেলে তো আর হবে না। ওগো, ওর যা হবার তা তো হয়ে গেছে—হাত পা ওঁর কেটে দাও। তখন হঠযোগী দাঁড়িয়ে পড়ল। তার তখন ঔষধের ঝোঁক চলে গেছে। দাঁড়িয়ে বলছে, তবে রে শালী, আমার হাত পা কাটবে। এই বলে বাড়ী ত্যাগ করে গুরুর সঙ্গে চলে গেল।"

গল্পশেষে স্বভাবতঃই 'সকলের হাস্য'। পর পর দুটি গল্পেই সংসারের বাস্তব দাবী আর ঈশ্বরের জন্য সর্বস্বত্যাগের সঙ্কল্পের মধ্যে যে দুস্তর পার্থক্য—সেই কথাটি যেমন এক মুহূর্তে আমাদের হাসায়, পরমুহূর্তে ভাবিয়ে তোলে। 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'—একথার মতো যথার্থ সংকেত অধ্যাত্ম-জীবনে খুব বেশী নেই।

'জাবালোপনিষদে'র মূল বক্তব্যটি থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় সূত্রটি এই—"যদি বেতরেথো ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাৎ বনাদ্বা। অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো অস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।" (জাবালোপনিষৎ-৯)

"যদিও গার্হস্থ্যাদি স্বীকার না করিয়া অনিয়মে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে

বিরক্ত ব্যক্তিগণের কর্মেতে প্রবৃত্তির অনুপপত্তিহেতু সন্ন্যাসসিদ্ধি হইতে পারে, অর্থাৎ গৃহাশ্রম ও বনবাস ভিন্ন সন্ন্যাস সম্ভব হইলেও এতজ্জন্মাবচ্ছিন্নব্রতাদি সন্ন্যাসসিদ্ধির অঙ্গ নহে; তথাপি অব্রতী বা ব্রতী হউক, স্নাতক বা ব্রতান্তে কৃতস্নান হউক, কি অস্নাতক হউক, অগ্নিহোত্রাগ্নিক হউক, কি অনগ্নিক হউক, যখন সংসারবিরক্ত হইলে, তখনই সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে।"

[অনুবাদ : বসুমতী সংস্করণ, ১৩৬০]

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে, সংসারে থেকে নির্লিপ্তভাবে সাধনাও তো হতে পারে। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য একটু আগেই পেশ করেছি। এখন রামকৃষ্ণদেবের দুটি গল্প পাশাপাশি সাজিয়ে আমরা সংসারবাসনার সূক্ষ্মস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যেসব গৃহী ভক্তেরা আসতেন, তাঁদেরই কেউ হয়তো তাঁর সর্বস্বত্যাগের উপর জোর দেওয়ার কথা শুনে 'নির্লিপ্ত সংসারী'র আদর্শের কথা বলে থাকবেন। উত্তরে রামকৃষ্ণদেব বলছেন—"তোমাদের নির্লিপ্ত সংসারী কেমন জান? বাড়ীতে একটি গরীব ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করতে গেছে। তা বাড়ীর কর্তাটি নির্লিপ্ত সংসারী অর্থাৎ নিজ হাতে একটি পয়সা রাখেন না—সব স্ত্রীর হাতে দেন। বাবু বললেন, তা ঠাকুর, আমি তো পয়সা কড়ি ছুঁই না, আমায় মিছে বলা। ব্রাহ্মণ নাছোড়বান্দা, অনেক কাকুতি মিনতি করে ধরলেন। বাবুজী মনে মনে ভাবলেন, একটা টাকা না নিয়ে ছাড়বে না, প্রকাশ্যে বললেন, আচ্ছা, আপনি কাল আসবেন, যা হয় হবে।

পরে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বললেন, দেখ একটি গরীব ব্রাহ্মণ ভারি বিপদে পড়েছে, তাকে একটা টাকা দিতে হবে। স্ত্রী টাকার কথা শুনে জ্বলে গিয়ে বললে, বাঃ কি দাতাই হয়েছেন, টাকা ওমনি শাক-পাতা কি না দিলেই হল? বাবুজী আম্‌তা আমতা করে বললেন, গরীব মানুষ, অনেক করে ধরেছে, একটা টাকা না দিলে চলে না। স্ত্রী বললে, তা হবে না, টাকা আমি দিতে পারবো না।

বাবুজী শেষে অনেক জেদ করাতে স্ত্রী বললে, তবে এই একটা দুয়ানি আছে, নে যাও। বাবুজী নির্লিপ্ত সংসারী। অগত্যা স্ত্রী যা হাতে তুলে দিলেন ব্রাহ্মণকে তাই এনে দিলেন।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ : সুরেশচন্দ্র দত্ত : পৃঃ ১৯২ দ্রষ্টব্য।)

উদ্ধৃত গল্পটির বর্ণনাভঙ্গী আমাদের আধুনিক জীবনের কথা মনে করিয়ে

দেয়। অর্থকামনা কেমন করে সংসারের অন্যান্য কামনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, তার উদাহরণ হিসাবে গল্পটিতে তথাকথিত নির্লিপ্ততা বা নিরাসক্তির আদর্শের অসারতা সূক্ষ্ম সুচতুরভাবে বিশ্লেষিত। এইবার যে গল্পটি উদ্ধৃত করছি, তা অপেক্ষাকৃত পরিচিত। কিন্তু আরো গভীরভাবে বাসনাকামনার-স্বরূপ বুঝিয়ে দেয় বলে বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। গল্পটির নাম দেওয়া যায়—'এক কৌপীন কা ওয়াস্তে'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বেদান্তগুরু তোতাপুরী বা যে-সব উত্তর-ভারতের সাধুদের সঙ্গ তিনি করেছিলেন, তাঁদেরই কারু কাছে তিনি এ গল্পটি শুনে থাকবেন। প্রত্যক্ষভাবে এ গল্পও কোনো বেদান্তসূত্রের সঙ্গে জড়িত নয়। কিন্তু বৈদান্তিকের বা ত্যাগের পথে সাধকদের দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবে স্মরণীয়।

গুরুর উপদেশ নিয়ে একজন সাধু সাধনভজনের উদ্দেশ্যে কোনো গ্রামের কাছে একটি নির্জন প্রান্তরের মধ্যে সামান্য একটি পর্ণকুটির করে তার মধ্যে বাস করতে লাগলেন। রোজ ভোরে উঠে তিনি স্নান-টান করে তাঁর ভিজে কাপড় ও কৌপীন কুটিরের কাছে একটি গাছে শুকোবার জন্য দিয়ে বেরিয়ে যেতেন। সেই সময়ে ইঁদুর এসে তাঁর কৌপীন কেটে দিয়ে যেত। সাধু তাই দেখে পরদিন আবার ভিক্ষার সময় গ্রাম থেকে নতুন কৌপীন ভিক্ষা করে আনতেন। কিছুদিন পরে আবার যখন কুটিরের ছাতে কৌপীন শুকোবার জন্য দিয়ে গেছেন, তখন ইঁদুর এসে আবার কৌপীন টুকরো টুকরো করে দিয়ে গেছে।

তাই দেখে মনে মনে বিরক্ত হয়ে সাধু ভাবতে লাগলেন, 'আবার কোথায় কার কাছে কৌপীন ভিক্ষে করতে যাবো?' যাই হোক, পরদিন যখন গ্রামবাসীদের কাছে ইঁদুরের উপদ্রবের কথা জানালেন, তারা সব শুনে বললে, 'রোজ রোজ কে আপনাকে নতুন কৌপীন দেবে? এক কাজ করুন—একটা বিড়াল পুষুন, তাহলে বিড়ালের ভয়ে আর ইঁদুর আসবে না।' সাধু তখন গ্রাম থেকে একটা বিড়ালের বাচ্চা নিয়ে এলেন। সেই দিন থেকে ইঁদুরের উপদ্রব বন্ধ হলো। তা দেখে সাধুর আনন্দের সীমা রইলো না।

ক্রমে সাধু সেই বিড়ালটাকে বেশ আদর যত্নে লালনপালন করতে লাগলেন এবং গ্রামে গিয়ে বিড়ালের জন্য দুধ ভিক্ষা করে এনে খাওয়াতে লাগলেন। কিছুদিন পর গাঁয়ের একজন তাঁকে বললে, 'সাধুজী, আপনার রোজ দুধের দরকার, দুচারদিন ভিক্ষা করে চলতে পারে। বারো মাস কে আপনাকে দুধ

দেবে ? আপনি এক কাজ করুন, একটি গোরু পুষুন, তা হলে তার দুধ খেয়ে আপনারও চলবে, বিড়ালেরও চলবে।'

কিছুদিনের মধ্যেই সাধু একটি দুধালো গাই জোগাড় করে নিয়ে এলেন। আর তাঁকে দুধের চিন্তা করতে হয় না। কিন্তু গোরুর জন্য খড়-বিচালি লোকের কাছে চাইতে হয়। কিছুদিন পরে গাঁয়ের লোকে বললে, 'আপনার কুটিরটির কাছে পতিত জমিতে চাষবাস করুন। তা হলে আর খড় বিচালির জন্য ভাবনা থাকবে না।' সাধু তখন ঘরের কাছের জমিতে চাষবাস শুরু করলেন। এখন চাষবাসের জন্য লোকজন চাই। আবার ফসল তুলে তা রাখার গোলাবাড়ী দরকার। এসব করতে গিয়ে সাধু গৃহস্থদের মতোই মহাব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কিছুদিন পরে সাধুটির গুরু এসে সেখানে উপস্থিত। অরণ্যের মধ্যে বিরাট কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি একটি চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে যে একটি ত্যাগী সাধু থাকতেন, তিনি কোথায় গেছেন বলতে পারো ?' চাকরটি কোনো উত্তর দিতে পারলে না। সে তো একজন করিৎকর্মা লোককে দেখেছে, যিনি গৃহস্থদের মতো সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত। তখন সাধুটি সেখানে বিরাট বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে খুঁজতে খুঁজতে শিষ্যকে দেখতে পেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৎস, এ সব কি ?' শিষ্য তখন গুরুর পায়ের উপরে পড়ে বললেন, 'গুরুজী এ সব—এক কৌপীনকা ওয়াস্তে।' একে একে গুরুর কাছে সমস্ত কাহিনী তিনি বলে যেতে লাগলেন। বলতে বলতে গুরুর কৃপায় তাঁর সব আসক্তি কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গুরুর সঙ্গে সব ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ : পৃ: ১৫২-৫৫ দ্রষ্টব্য)

গল্পটির মূল সুর 'তদহরেব প্রব্রজেৎ।' এ গল্পে সাধুটি সব ত্যাগ করেও আবার জড়িয়ে পড়েছিলেন। গুরুর দর্শনে ভুল বোঝামাত্র আবার বেরিয়ে পড়লেন।

নেতি নেতি : এ নয়, এ নয়।

'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌'—'বাক্যমনাতীত'।

'স এষ নেতি নেত্যাত্মা'—বৃহদারণ্যক ৩।৯।২৬ দ্রষ্টব্য। যাঁকে নেতি নেতি বলা হয়, তিনি এই আত্মা। "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি। এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং

নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা, যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণাভে হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ। স এষ নেতি নেত্যাত্মা"—

(বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২)

"পরিব্রাজকেরা এই আত্মাকে পাবার ইচ্ছায় পরিব্রজ্যা গ্রহণ করেন। পরিব্রজ্যার কারণ এই—'আমাদের যাদের কাছে এই আত্মাই একমাত্র অভিপ্রেত, তারা সন্তান নিয়ে কি করবো ?' এই মনে করে প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞেরা একেবারেই সন্তানকামনা করেন নি। পুত্রকামনা, বিত্তকামনা ও লোককামনা থেকে মুক্ত হয়ে তাঁরা ভিক্ষা অবলম্বন করেছিলেন। কারণ যা পুত্রকামনা, তাই বিত্ত-কামনা, যা বিত্তকামনা তাই পুত্রকামনা—কেননা এ দুই-ই কামনা। এই আত্মা তিনিই যাঁকে নেতি নেতি বলা হয়েছে"……

'অবাঙ্মনসোগোচরম্'—বিবেকানন্দের ভাষায়—'বাক্যমনাতীত'।

(বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : 'শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিক' দ্রষ্টব্য)

চর্যাগীতিতে আছে—'বাকৃপথাতীত'।

'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।)—রামমোহনের অনুবাদে 'মনের সহিত বাক্য যাঁহার নিরূপণ-বিষয়ে অক্ষম হইয়া নিবৃত্ত হন।' (ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নানা ব্যাখ্যার মধ্যে একটি—"আমি কে, এইটি খুঁজতে গেলে তাঁকেই পাওয়া যায়। আমি কি মাংস, না হাড়, না রক্ত, না মজ্জা,—না মন, না বুদ্ধি ? শেষে বিচারে দেখা যায় যে আমি এসব কিছুই নয়। 'নেতি' 'নেতি'। আত্মা ধরবার ছোঁবার যো নাই। তিনি নির্গুণ, নিরুপাধি।"

[কথামৃত : ৪র্থ : ১লা জানুয়ারী, ১৮৮৩]

আর একটি—"বিচার করতে করতে আমি-টামি কিছুই থাকে না। প্যাঁজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরু খোসা। এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।…পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ—পূর্ণজ্ঞান হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। তখন আমি-রূপ নুণের পুতুল সচ্চিদানন্দরূপ সাগরে গলে এক হয়ে যায়, আর একটুও ভেদবুদ্ধি থাকে না।…আগেকার লোকে বলতো, কালাপানিতে জাহাজ গেলে ফেরে না।"

[কথামৃত : ১ম : ২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২]

অদ্বৈতবেদান্তের বিচারে 'নেতি নেতি' একটি প্রধান সূত্র বা সাধনপদ্ধতি। আর এই সাধনার ফলেই স্বস্বরূপ বোধ—যা কখনোই বাক্যে বা সাধারণ মনে ধরা দেয় না। অবশ্য অদ্বৈত বিচারের পাশাপাশি শ্রীরামকৃষ্ণদেব সব সময়ই শ্রোতাদের ভক্তিবাদী সিদ্ধান্তের কথাও মনে করিয়ে দিতেন। কিন্তু অদ্বৈতই যে সব সাধনার শেষ কথা—এ সিদ্ধান্ত সবসময়ই তিনি স্বীকার করেছেন, কারণ এ তাঁর উপলব্ধিগত সত্য।

উপমায় উদাহরণে এ সত্যকে বোঝাতে গিয়ে তিনি যে সব ঘটনা বা কাহিনীর বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্যে চাষীর ক্ষেতে চোরের দল এসে খড়ের মূর্তি দেখে ভয় পাওয়া এবং তাদের একজন এসে মূর্তিটিকে যখন মাটিতে শুইয়ে দিয়ে বলছে—এ কিছু নয়, 'নেতি' 'নেতি'—বাংলার গ্রামজীবনের পটভূমিতে এক অসামান্য উদাহরণ। তেমনি ভেল্কি দেখে রাজার বিচার—ঘোড়া, সাজগোজ, অস্ত্রশস্ত্র কিছুই সত্য নয়, সত্য শুধু ঘোড়সওয়ার—বেদান্তের 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম'-বাণীরই লোকসাহিত্যে বিধৃত রূপ। অথবা সেই 'জ্ঞানী চাষার গল্প'—যেখানে স্বপ্নে-দেখা সাতপুত্রের জন্য শোক করবে, না জাগ্রত অবস্থায় এক পুত্রের জন্য শোক করবে, সে কথা চাষী বুঝে উঠতে পারছে না, কিংবা 'সাত দেউড়ির পরে রাজা'—এ জাতীয় গল্পমালা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজস্ব অভিজ্ঞতার সৃষ্টিও হতে পারে, সাধকমণ্ডলীতে প্রচলিত উদাহরণের মালাও হতে পারে। এ বিষয়ে লোকসাহিত্যবিদ্ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যদি লোকসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ও আলোচনা করেন, তাহলে নতুন আলোকপাত হতে পারে। পূর্বোক্ত গল্পগুলি আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। ('শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য' এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণমনীষা ও বাংলাসাহিত্য' পরিচ্ছেদ দুটি দ্রষ্টব্য)।

এ সব কাহিনী বা কাহিনীর আভাসের দুটি ছোট্ট উদাহরণ আমাদের এ আলোচনায় প্রাসঙ্গিক।

"জ্ঞান বিচার আর কতক্ষণ? যতক্ষণ অনেক বলে বোধ হয়,—যতক্ষণ জীব, জগৎ, আমি, তুমি এসব বোধ থাকে। যখন ঠিক ঠিক এক জ্ঞান হয় তখন চুপ হয়ে যায়—যেমন তৈলঙ্গস্বামী।"

"ব্রাহ্মণভোজনের সময় দেখ নাই? প্রথমটা খুব হৈ চৈ। পেট যত ভরে আসছে, ততই হৈ চৈ কমে যাচ্ছে। যখন দধি মুণ্ডি পড়ল তখন কেবল

স্থপ্‌সাপ্‌! আর কোনও শব্দ নাই। তারপরই নিদ্রা—সমাধি। তখন হৈ চৈ আদৌ নাই।" (কথামৃত : ৪র্থ : ১লা জানুয়ারী, ১৮৮৩)

পরমজ্ঞানের পরমনৈঃশব্দ্য সমকালীন শ্রোতাদের কাছে এর চেয়ে সহজ আর কোনো ভাষায় প্রকাশ সম্ভব ছিল না। আর একটি গল্পে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমা-সংকেত—"তিনি যে কি, মুখে বলা যায় না। তিনি বাক্যের অতীত। নেতি নেতি করে যা বাকি থাকে আর যেখানে আনন্দ সেই ব্রহ্ম।

"একটি মেয়ের স্বামী এসেছে। অন্য অন্য সমবয়স্ক ছোকরাদের সঙ্গে বাইরের ঘরে বসেছে। এদিকে ঐ মেয়েটি ও তার সমবয়স্কা মেয়েরা জানালা দিয়ে দেখছে। তারা বরটিকে চেনে না—ঐ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করছে, ঐটি কি তোর বর? তখন সে একটু হেসে বলছে—না। আর একজনকে দেখিয়ে বলছে, ঐটি কি তোর বর? সে আবার বলছে—না। শেষে তার স্বামীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলে—ঐটি কি তোর বর? তখন সে হাঁও বললে না, নাও বললে না,—কেবল একটু ফিক্‌ করে হেসে চুপ করে রইল। তখন সমবয়স্করা বুঝলে যে, ঐটিই তার স্বামী। যেখানে ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান সেখানে চুপ।"

(কথামৃত : ৩য় : ২০ আগস্ট, ১৮৮৩)

ব্রাহ্মণভোজনের উদাহরণটি একালের লোকদের বোঝানো ক্রমে কঠিন হয়ে আসছে। তবে সাধারণভাবে ভোজসভার শেষদিকে অপেক্ষাকৃত নীরবতা অবশ্য এখনও দেখা যায়। কিন্তু ইঙ্গিতের দ্বারা স্বামীকে চিনিয়ে দেবার যে মৌনতা, তার মাধুর্য বিশেষ কোনো কালের অপেক্ষা রাখে না।

উপলব্ধির মহামৌনপ্রসঙ্গে কেনোপনিষদের 'অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম-বিজানতাং'—সূত্রটির অনুবাদে রামমোহন লিখেছেন—"যাঁহারা ব্রহ্মের অগোচর স্বরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই কহেন যে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞেয় আমাদের নহে আর যাঁহারা ব্রহ্মকে না জানেন তাঁহারা কহেন যে ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞেয় হয়েন।" ('চারি প্রশ্নের উত্তর' দ্রষ্টব্য)

"কেনোপনিষদে"র দ্বিতীয় খণ্ডে গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের অন্তরালে অধ্যাত্মসাধনার এক নাট্যধর্মী সংলাপ সচেতন শ্রোতা বা পাঠককে মুগ্ধ করে।

গুরুর প্রশ্ন ও শিষ্যের উত্তর—যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি
নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্‌।

যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষথ নু
মীমাংস্যমেব তে; মন্যে বিদিতম্ ॥
নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ ;
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥
যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥

(গুরু ও শিষ্যের উপস্থিতি ধরে নেওয়া হয়েছে, প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই।)

মূল শ্লোকের অনুবাদটি স্বামী গম্ভীরানন্দজী-কৃত অনুবাদের অনুসরণে—"যদি তুমি মনে কর 'আমি ব্রহ্মকে ভালোভাবে জেনেছি,' তবে উক্ত ব্রহ্মের যে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক ক্ষুদ্র রূপ আছে, তাই মাত্র তুমি জেনেছ ; সুতরাং ব্রহ্ম এখনও তোমার কাছে বিচার্য।

(একথা শুনে যথোচিত বিচার করে শিষ্য বললেন)—"আমার মনে হয়, ব্রহ্মকে আমি জেনেছি।

('জেনেছি', বলার কারণ-ব্যাখ্যায় শিষ্য)—"আমি এমন মনে করি না যে, ব্রহ্মকে আমি ভালোভাবে জেনেছি ; অর্থাৎ 'জানি না'—এও মনে করি না এবং 'জানি' এও মনে করি না। 'জানি না যে তাও নয়, এবং জানি যে তাও নয়'—আমাদের মধ্যে যিনি এই বচনটির মর্ম জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন।

(শ্রুতি অনুযায়ী)—"ব্রহ্ম যাঁর কাছে অবিদিত (বলে নিশ্চিত) তাঁরই কাছে তিনি বিদিত ; যাঁর কাছে বিদিত (বলে নিশ্চিত), তিনি জানেন না। যাঁরা সম্যক জ্ঞানী তাঁরা ব্রহ্মকে জ্ঞাত বলে মনে করেন না ; যাঁরা সম্যক্ জ্ঞানবান ন'ন তাঁরাই মনে করেন যে ব্রহ্ম জ্ঞাত হয়েছেন।" (কেন উপনিষৎ : ২।১,২,৩)

উপনিষদের এই মিষ্টিক উপলব্ধির বাণী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্রহ্মজ্ঞান-প্রসঙ্গে একটি গল্পে সর্বসাধারণের ভাষায় অনুবাদের মতো ফুটে উঠেছে—"এক বাপের দুটি ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শিখবার জন্য ছেলে দুটিকে বাপ আচার্যের হাতে দিলেন। কয়েকবছর পরে তারা গুরুগৃহ থেকে ফিরে এলো, এসে বাপকে প্রণাম করলে। বাপের ইচ্ছা দেখেন, এদের ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ হয়েছে। বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাপ তুমি ত সব পড়েছ, ব্রহ্ম কিরূপ বল দেখি ?' বড় ছেলেটি বেদ থেকে নানা শ্লোক বলে বলে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাতে লাগল। বাপ চুপ করে রইলেন। যখন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে হেঁটমুখে চুপ করে রইলো।

মুখে কোন কথা নাই। বাপ তখন প্রসন্ন হয়ে ছোট ছেলেকে বললেন, 'বাপু, তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না।"

(কথামৃত : তৃতীয় : ৫ই আগস্ট, ১৮৮২)

বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে সেদিন ব্রহ্ম যে কখনো উচ্ছিষ্ট হ'ন নি, এই কথা বলতে বলতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দুই ছেলের উদাহরণটি দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যের মাধ্যমে এদেশের বেদ-বেদান্ত শাস্ত্রাদি যে সর্বসাধারণের চিন্তায় ভাবনায় কতখানি অনুস্যূত হয়ে গিয়েছিল, সে কথাটি আমরা শ্রদ্ধাভরে লক্ষ্য করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নানা কথিকার শাস্ত্রীয় উৎসসন্ধানে একথাটি স্মরণীয় যে, এদেশের পুথিপাণ্ডিত্যহীন শত সহস্র সাধারণ মানুষেরই তিনি প্রতিনিধি। এক হিসাবে, দেশের সব মানুষের আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার মিলিত সমষ্টি। তাঁর ভাষা, উপমা, উদাহরণ সবই সাধারণ মানুষের সৃষ্টি এবং তাঁর অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার স্পর্শে নবজীবনলাভ করে বাংলাসাহিত্যে চিরায়ত আদর্শে পরিণত।

ব্রহ্মজ্ঞান বা অদ্বৈতানুভূতি যে, সব সাধনার শেষ কথা, একথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব নানাভাবে আলোচনা করেছেন। 'লীলাপ্রসঙ্গে' এদিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিদ্ধান্ত সুবিশ্লেষিত। তবে এ বিষয়ে একটি গল্প বা গল্পের আভাসে তিনি যে উদাহরণ দিয়েছেন, সেটি পৌরাণিক পটভূমিকায় মনোজ্ঞ উপস্থাপনা।

'পুরাণে আছে ভগবতী যখন হিমালয়ের ঘরে জন্মালেন, তখন মা তাঁকে নানারূপে দর্শন দিলেন। গিরিরাজ সব রূপ দর্শন করে শেষে ভগবতীকে বললেন, মা, বেদে যে ব্রহ্মের কথা আছে, এইবার আমার যেন ব্রহ্ম দর্শন হয়। তখন ভগবতী বললেন, বাবা ব্রহ্মদর্শন যদি করতে চাও, তবে সাধুসঙ্গ কর।'

(কথামৃত : ১ম ভাগ : ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮৫)

অন্যান্য ঈশ্বরীয় রূপদর্শনের পরপারে ব্রহ্মদর্শনের কথা। তাই ব্রহ্মজ্ঞানীর সঙ্গ না করলে সেই শ্রেষ্ঠ আদর্শে পৌঁছানো যায় না। গিরিরাজ সংসারবাসনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হলে তবে তাঁর ব্রহ্মদর্শন সম্ভব হবে।

এই গল্পটিরই একটু আগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধির বাক্যাতীত স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে আর একটি উদাহরণ দিয়েছেন, যার সজীবতা ও প্রত্যক্ষ বাস্তবতা শ্রোতার মনে চিরস্থায়ী প্রভাব রেখে যায় (সেদিনের অন্যতম শ্রোতা ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার)—"যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'ঘি কেমন খেলে ?' তাকে

এখন কি করে বুঝাবে? হদ্দ বলতে পার, 'কেমন ঘি না যেমন ঘি।' একটি মেয়েকে তার একটি সঙ্গী জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোর স্বামী এসেছে, আচ্ছা ভাই, স্বামী এলে কিরূপ আনন্দ হয়?' মেয়েটি বললে, 'ভাই, তোর স্বামী হলে তুই জানবি, এখন তোরে কেমন করে বুঝাব'।"

'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' : 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'

শঙ্করাচার্যের এই বিখ্যাত সিদ্ধান্ত তাঁর রচনাবলীর নানা জায়গায় ছড়ানো রয়েছে।

'ব্রহ্মৈব সত্যং জগন্মিথ্যেতি নিশ্চয়ো নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ'—'আত্মানাত্ম-বিবেকে'র এই অংশটির অনুবাদ রামমোহনের ভাষায়—"ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা এই প্রকার যে নিশ্চয় সেই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক।" (রামমোহন গ্রন্থাবলী—'আত্মানাত্মবিবেক')

'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥' শঙ্করাচার্যকৃত ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা : ২১*

ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়।

'অয়ং প্রপঞ্চো মিথ্যৈব সত্যং ব্রহ্মাহমব্যয়ম্॥' শঙ্করাচার্যকৃত ব্রহ্মানু-চিন্তন : ২৩*

এই বিশ্বচরাচর মিথ্যা, অব্যয় আমিই ব্রহ্মরূপ সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধ ঠিক হলে মনের লয় হয়, সমাধি হয়।' [কথামৃত : ১ম : ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮২]

'ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; নামরূপ এ সব স্বপ্নবৎ…' [তদেব, ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২]

'বিচার করতে গেলে, এ সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু।' (তদেব)

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এ ধারণায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া কিন্তু সব সাধনার চেয়ে দুরূহ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পানুসারে স্বয়ং শঙ্করাচার্যেরও এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে সময় লেগেছে।

"শঙ্করাচার্য এদিকে ব্রহ্মজ্ঞানী; আবার প্রথম প্রথম ভেদবুদ্ধিও ছিল।

তেমন বিশ্বাস ছিল না। চণ্ডাল মাংসের ভাঁড় লয়ে আসছে, উনি গঙ্গাস্নান করে উঠেছেন। চণ্ডালের গায়ে গা লেগে গেছে। বলে উঠলেন, 'এই তুই আমায় ছুঁলি!' চণ্ডাল বললে, 'ঠাকুর তুমিও আমায় ছোঁও নাই, আমিও তোমায় ছুঁই নাই। যিনি শুদ্ধ আত্মা তিনি শরীর ন'ন, পঞ্চভূত ন'ন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ন'ন।' তখন শঙ্করের জ্ঞান হয়ে গেল।"

"জড়ভরত রাজা রহুগণের পাল্কী বইতে বইতে যখন আত্মজ্ঞানের কথা বলতে লাগলো, রাজা পাল্কী থেকে নীচে এসে বললে, 'তুমি কে গো!' জড়ভরত বললে, 'আমি নেতি, নেতি, শুদ্ধ আত্মা।' একেবারে ঠিক বিশ্বাস, আমি শুদ্ধ আত্মা।"

(কথামৃত : ২য় : ১৫ই জুন, ১৮৮৩)

প্রথম কাহিনীটির উৎস শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যদিগ্বিজয়ঃ (৬।২৫।২৮) এবং দ্বিতীয় গল্পটির উৎস শ্রীমদ্ভাগবত (৫।১০।১০)।*

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পর যখন উপলব্ধি হয় 'তিনিই সব হয়েছেন'—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় যখন 'বিজ্ঞান'-লাভ হয়েছে, তখনকার অবস্থা বোঝাতে যোগবাশিষ্ঠের এই গল্পটি বিশেষ উপযোগী—"যখন রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হল, দশরথ বড় ভাবিত হয়ে বশিষ্ঠদেবের শরণাগত হলেন—যাতে রাম সংসার ত্যাগ না করেন। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে দেখেন তিনি অতি বিমনা ভাবে বসে আছেন—অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য। বশিষ্ঠ বল্লেন, 'রাম, তুমি সংসার ত্যাগ করবে কেন? সংসার কি তিনি ছাড়া?' রাম দেখলেন, সংসার সেই পরব্রহ্ম থেকেই হয়েছে। তাই চুপ করে রইলেন।" (কথামৃত · ৪র্থ : ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩)

'কথামৃতে'র বিভিন্ন ভাগে এই গল্পটি নানা ভাবে রয়েছে। প্রথম ভাগে মহিমাচরণকে এই গল্পটি বলার সময় রামকৃষ্ণদেব সূচনায় বলেছিলেন, 'আমি দেখছি যেখানে থাকি, রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎ সংসার রামের অযোধ্যা।' (কথামৃত : ১ম : ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪)

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে এ কাহিনীর মূল এইভাবে দেখা যায়—

তত্তো দশরথো রাজা রামঃ কিং খেদবানিতি।
অপৃচ্ছৎ সর্বকার্যজ্ঞং বশিষ্ঠং বদতাং বরম্॥

(যোগবাশিষ্ঠ : বৈরাগ্যপ্রকরণ : ৫।১৩)*

[রামচন্দ্র কোনো অজ্ঞাত কারণে মৌন থেকে দিনে দিনে কৃশ হয়ে যাচ্ছেন দেখে]

* দ্রষ্টব্য : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণবাণী ও শাস্ত্রপ্রমাণ : কুমারকৃষ্ণ নন্দী—সঙ্কলিত।

রাজা দশরথ তখন সুপণ্ডিত সর্ববিদ্যাবিশারদ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাম বিষণ্ণ হয়ে আছে কেন ?'

(বশিষ্ঠ উবাচ)—

সর্বমেবমজং শান্তমনন্তং ধ্রুবমব্যয়ম্ ।
পশ্যন্ ভূতার্থচিদ্রূপং শান্তমাস্স্ব যথাসুখম্ ।

(যোগবাশিষ্ঠ নির্বাণপ্রকরণ : পূর্বভাগ ১২৬।৯৮)

[বশিষ্ঠ বললেন, হে রাম !] তুমি এ সব কিছুই আসলে অজ্ঞাত (যার উৎপত্তিই হয় নি), শান্ত, অনন্ত, ধ্রুব, চৈতন্য-স্বরূপ জেনে শান্তভাবে যথাসুখে অবস্থান কর ।]

শিবং সর্বগতং শান্তং বোধাত্মকজং শুভম্ ।
তদেকভাবনং রাম সর্বত্যাগ ইতি স্মৃতঃ ।
ভাবয়ঞ্চ্ছশ্বদন্তঃ স্বং কার্যং কর্ম সমাচর ॥

(যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ১২৬।১০১)

[হে রাম !] শিব, শান্ত, সর্বগত, অজ, বোধাত্মক এক ব্রহ্মভাবনাকেই সর্বত্যাগ বলা হয় । তুমি অনুক্ষণ অন্তরে সেইভাবে ব্রহ্মচিন্তা করে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর ।[১]

রামচন্দ্র আগে ব্রহ্মোপলব্ধি করে তবে দেখলেন জগৎসংসার ব্রহ্মময় । তাই সংসার ত্যাগ করে যেতে পারেন নি । কিন্তু ব্রহ্ম যে অর্থে সত্য, জগৎ সে অর্থে সত্য নয় । তাহলে জগৎসংসারের সম্বন্ধ ছেড়ে সন্ন্যাসের উপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব এত জোর দিতেন না । যে ব্রহ্মদৃষ্টিতে সর্বজীবে চৈতন্যসত্তার দর্শন হয়, তাতেও ব্রহ্মই সত্য, নামরূপময় জগৎ একান্ত বহিরঙ্গ । এ সম্বন্ধে অনেক উদাহরণই তিনি দিয়েছেন । তারই মধ্যে দু' একটি—"কি জান, ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য! জীব, জগৎ, বাড়ি-ঘর, দারা, ছেলেপিলে এ সব বাজিকরের ভেলকি ! বাজীকর কাঠি দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে, আর বলছে, লাগ্ লাগ্ লাগ্ ! ঢাকা খুলে দেখ, কতকগুলো পাখী আকাশে উড়ে গেল ! কিন্তু বাজীকরই সত্য, আর সব অনিত্য । এই আছে, এই নাই ।

১ উৎসনির্দেশে কুমারকৃষ্ণ নন্দী সংকলিত 'শ্রীরামকৃষ্ণবাণী ও শাস্ত্রপ্রমাণ' থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে ।

অনুবাদ : বসুমতী-সংস্করণ 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে'র বঙ্গানুবাদ অনুসরণে ।

"কৈলাসে শিব বসে আছেন, নন্দী কাছে আছেন। এমন সময় একটা ভারী শব্দ হলো। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে, 'ঠাকুর। এ কিসের শব্দ হলো?' শিব বললেন, 'রাবণ জন্মগ্রহণ করলে, তাই শব্দ।' খানিক পরে আবার একটি ভয়ানক শব্দ হলো। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে—'এবার কিসের শব্দ?' শিব হেসে বললেন, 'এবার রাবণ বধ হলো!' জন্ম-মৃত্যু এ সব ভেলকির-মতো! এই আছে, এই নাই। ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য। জলই সত্য, জলের ভুড়ভুড়ি, এই আছে, এই নাই;...ঈশ্বর যেন মহাসমুদ্র, জীবেরা যেন ভুড়ভুড়ি; তাঁতেই জন্ম, তাঁতেই লয়।" (কথামৃত : ৩য় : ১৩ই জুন, ১৮৮৫)

শঙ্করাচার্য উপমা দিয়েছেন স্বপ্ন এবং মরীচিকার সঙ্গে। সে উপমা বৌদ্ধ-দর্শনের পটভূমিতে বাংলায় চর্যাগানেও মেলে। বাস্তবিক, 'জগৎ মিথ্যা' বোধ ব্রহ্ম সত্য উপলব্ধিরই সহজাত।

ত্রিগুণাতীত ব্রহ্ম : তিন ডাকাতের গল্প

'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন' (গীতা ২।৪৫)—গীতায় সাংখ্যযোগে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তিন গুণের অতীত হতে বলেছিলেন। আমাদের জাগতিক যা কিছু ধারণা এই গুণের দ্বারা গড়ে উঠেছে—সত্ত্ব, রজ, তম। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়—'সত্ত্ব গুণে পালন, রজোগুণে সৃষ্টি, তমোগুণে সংহার। কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণের পার। প্রকৃতির পার।" (কথামৃত : ১ম : ২২শে জুলাই, ১৮৮৩)

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে মোক্ষযোগে এই তিন গুণের অধিকারীদের বর্ণনায় আছে—

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥
রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষ শোকান্বিতঃ কর্তা রাজসং পরিকীর্তিতঃ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে॥

(গীতা ১৮।২৬, ২৭, ২৮)

মানবচরিত্রের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে—এই তিন ধরনের মানুষের বর্ণনায়—"ফলে অনাসক্ত, কর্তৃত্ব-অভিমান-বিহীন, ধৃতি ও উদ্যমযুক্ত, ক্রিয়মাণ

কর্মের সিদ্ধিতে হর্ষহীন বা অসিদ্ধিতে নির্বিকার ব্যক্তি সাত্ত্বিক; বাসনাসক্ত, কর্মফলের প্রত্যাশী, অন্যের দ্রব্যে লুব্ধ, নিজের কিছু দিতে অনিচ্ছুক, হিংসাকারী (পরপীড়নকারী), অশুচি, (লাভালাভে) কখনো সুখী, কখনো দুঃখী ব্যক্তি রাজসিক; নানা দিকে মন যাওয়ার ফলে অস্থিরচিত্ত, অপরিণতমানস, রূঢ়-ব্যবহারকারী, বঞ্চনাকারী, নিজের স্বার্থে অন্যের ক্ষতিতে রত, কর্তব্যে প্রবৃত্তিহীন, সর্বদা অবসাদগ্রস্ত এবং দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তি তামসিক বলে পরিচিত।"

এই সত্ত্ব রজ তম—তিন গুণ জাগতিক স্তরের গুণ। স্বয়ং ব্রহ্ম-এর ঊর্ধ্বে। "যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে গুণ পৌঁছতে পারে না। চোর যেমন ঠিক জায়গায় যেতে পারে না; ভয় হয় পাছে ধরা পড়ে। সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণই চোর।"

(কথামৃত : তদেব)

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে আর একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'চোরের' রূপকটি ব্যাখ্যা করেছিলেন—"সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণেতেই মানুষকে বদ্ধ করেছে। তিন ভাই; সত্ত্ব থাকলে রজকে ডাকতে পারে। রজ থাকলে তমকে ডাকতে পারে। তিন গুণই চোর। তমোগুণে বিনাশ করে, রজোগুণে বদ্ধ করে. সত্ত্বগুণে বন্ধন খোলে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছ পর্যন্ত যেতে পারে না।" (কথামৃত : ৪র্থ : ২৫শে মে, ১৮৮৪)

কিন্তু সত্ত্বগুণ ঈশ্বরচেতনার কাছাকাছি। তাই বিদ্যাসাগরের সর্বভূতে দয়ার মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রকাশ দেখে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু ঐখানে থামা নয়, আরো এগিয়ে ঈশ্বরলাভ করতে হবে। কারণ, জগতের কল্যাণ ঈশ্বরই করেন। (কথামৃত: ১ম: ২২শে জুলাই, ১৮৮৩: বিদ্যাসাগরপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)

এই তিন গুণের মধ্যে যিনি ধরা দেন, তিনি সগুণ ব্রহ্ম, এ তিন গুণের পারে নির্গুণ ব্রহ্ম। ২২শে এপ্রিল, ১৮৮৩ তারিখের দিনলিপিতে (কথামৃত : ৫ম) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—"মানুষ তাঁর মায়াতে পড়ে স্বস্বরূপকে ভুলে যায়। সে যে বাপের অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী তা ভুলে যায়। তাঁর মায়া ত্রিগুণময়ী। এই তিন গুণই ডাকাত, সর্বস্ব হরণ করে; স্বস্বরূপকে ভুলিয়ে দেয়। সত্ত্ব, রজ, তম তিন গুণ। এদের মধ্যে সত্ত্ব গুণই ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সত্ত্বগুণও নিয়ে যেতে পারে না।"

'কথামৃতে'র প্রথম ও পঞ্চম ভাগে এই তিন গুণ তিন ডাকাতে (বা চোরে) রূপান্তরিত। লক্ষণীয়, এদের রামকৃষ্ণদেব চোরও বলেছেন অর্থাৎ চোর

বা ডাকাতের মতো এরা মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান বা সর্বস্ব হরণ করে। আমরা প্রথম ভাগের গল্পটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকৃত রূপকব্যাখ্যা সহ উপস্থাপিত করি—'একটি লোক বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময়ে তাকে তিনজন ডাকাত এসে ধরলে। তারা তার সর্বস্ব কেড়ে নিলে। একজন চোর বললে, 'আর এ লোকটাকে রেখে কি হবে?' এই বলে খাঁড়া দিয়ে কাটতে এলো। তখন আর একজন বললে, 'না হে কেটে কি হবে? একে হাত-পা বেঁধে এখানে ফেলে যাও।' তখন তাকে হাত-পা বেঁধে ঐখানে রেখে চোরেরা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বললে, 'আহা তোমার কি লেগেছে? এসো আমি তোমার বন্ধন খুলে দিই।' তার বন্ধন খুলে দিয়ে চোরটি বললে, 'আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো, তোমায় সদর রাস্তায় তুলে দিচ্ছি।' অনেকক্ষণ পরে সদর রাস্তায় এসে বললে, 'এই রাস্তা ধরে যাও, ঐ তোমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে।' তখন লোকটি চোরকে বললে, 'মশাই আমার অনেক উপকার করলেন, এখন আপনিও আসুন, আমার বাড়ি পর্যন্ত যাবেন।' চোর বললে, 'না, আমার ওখানে যাবার যো নাই, পুলিসে টের পাবে।'

'সংসারই অরণ্য। এই বনে সত্ত্বরজস্তম তিন গুণ ডাকাত, জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে লয়। তমোগুণ জীবের বিনাশ করতে যায়। রজোগুণ সংসারে বদ্ধ করে। কিন্তু সত্ত্বগুণ রজস্তম থেকে বাঁচায়। সত্ত্বগুণের আশ্রয় পেলে কাম-ক্রোধ এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয়। সত্ত্বগুণ আবার জীবের সংসারগ্রন্থি মোচন করে। কিন্তু সত্ত্বগুণও চোর, তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না। কিন্তু সেই পরম ধামে যাবার পথে তুলে দেয়। দিয়ে বলে, ঐ দেখ তোমার বাড়ি, ঐ দেখা যায়! যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান সেখান থেকে সত্ত্বগুণ অনেক দূরে।"

(কথামৃত : ১ম : ২২শে জুলাই, ১৮৮৩)

পঞ্চমভাগে গল্পটিতে 'চোর' শব্দের বদলে সর্বত্র 'ডাকাত' রয়েছে। আর গল্প শেষে রূপকব্যাখ্যায়—"সত্ত্বগুণই কেবল ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। দয়া ধর্ম ভক্তি এসব সত্ত্বগুণ থেকে হয়। সত্ত্বগুণ যেন সিঁড়ির শেষ ধাপ; তার পরেই ছাদ। মানুষের স্বধাম হচ্ছে পরব্রহ্ম।[1] ত্রিগুণাতীত না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।"

(২০শে মে, ১৮৮৩)

মান[1] শ্রীরামকৃষ্ণদেব নির্গুণ ব্রহ্মকেই পরব্রহ্ম বলেছেন।

বর্ণন "যখন তিনি তিন গুণের অতীত, তাঁকে নির্গুণ ব্রহ্ম, বাক্যমনের অতীত, বলা যায়; ক্ষ।"

(কথামৃত : ৫ম : ২২শে এপ্রিল, ১৮৮৩)

এ গল্পের রূপকটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোনো শাস্ত্রীয় উদাহরণ থেকেই পেয়েছেন কি না, এ বিষয়ে আমরা এখনো নিশ্চিত হতে পারি নি। তবে ভাবগত উৎসের নির্দেশনা, যা গীতায় মেলে, তাই উদ্ধৃত হয়েছে। একটু দূরগত হলেও রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকে সুদর্শনাকে নিয়ে কাঞ্চীরাজ ও অন্যান্য রাজাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা এই গল্পটির প্রসঙ্গে মনে জাগে। মানবাত্মার আধ্যাত্মিক সমস্যা এ যুগে যাঁর নাটকে অসামান্য রূপলাভ করেছে, তাঁর কথা শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই এসে পড়ে।

'রাজা' বা 'অরূপরতন' যেমন চোখের আলোয় ধরা দেন না, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বর্ণনায় তেমনি 'ব্রহ্ম কি, তা মুখে বলা যায় না।' উপনিষদের ভাষায়—'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'। (তৈত্তিরীয় : ব্রহ্মানন্দবল্লী)

অন্ধের হস্তীদর্শন : মতুয়ার বুদ্ধি

সেদিন ১১ই মার্চ, ১৮৮৩, রবিবার—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি—ফাল্গুন, শুক্লা-দ্বিতীয়া। ভক্তেরা দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন তাঁর জন্মদিন পালন করতে। কথায় কথায় ধর্মসমন্বয়ের প্রসঙ্গ এলো। জনৈক বৈষ্ণব গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করে রামকৃষ্ণদেব বললেন—"আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভিতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে, আবার মুসলমান, খৃষ্টান এরাও পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে। তারা বলে, 'আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে না ভজলে কিছুই হবে না'; কি 'আমাদের মা কালীকে না ভজলে কিছুই হবে না'; আমাদের খৃষ্টান ধর্মকে না নিলে কিছুই হবে না।"

"এসব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি; অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা। এ বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানাপথ দিয়ে পৌঁছানো যায়।"

(কথামৃত : ২য়)

ঈশ্বরপ্রসঙ্গে সসীম ধারণায় আবদ্ধ মানুষ অনেক সময় তাঁকে নিরাকারের মধ্যেও আবদ্ধ করে ফেলতে চায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায়—"যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার।" (তদেব)

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব পর পর দুটি গল্প শুনিয়েছিলেন। প্রথমটি অন্ধের

হস্তীদর্শনের, দ্বিতীয়টি বহুখ্যাত বহুরূপীর গল্প। প্রথম গল্পটির উল্লেখ 'শব্দকল্পদ্রুমে' এইভাবে রয়েছে—'অন্ধহস্তিন্যায়ঃ॥ বহবোঽন্ধা হস্তিনিরূপণার্থং প্রবৃত্তাঃ কেনচিৎ চরণং স্পৃষ্ট্বা স্তম্ভাকারত্বেন, কেনাপি লাঙ্গুলং স্পৃষ্ট্বা রজ্জ্বাকারত্বেন, পরেণ শ্রোত্রং স্পৃষ্ট্বা শূর্পাকারত্বেন গজো নির্ণীতঃ।' (রাধাকান্তদেব-সম্পাদিত 'শব্দকল্পদ্রুমঃ' ২য় ভাগ : পৃঃ ৯৩১ চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী সংস্করণ)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় গল্পটি—"কতকগুলো কাণা একটা হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক বলে দিলে, এ জানোয়ারটি হাতী। তখন কাণাদের জিজ্ঞাসা করা হ'ল, হাতীটা কি রকম? তারা হাতীর গা স্পর্শ করতে লাগল। একজন বললে, 'হাতী একটা থামের মত।' সে কাণাটি কেবল হাতীর পা স্পর্শ করেছিল। আর একজন বললে, 'হাতীটা একটা কুলোর মত।' সে কেবল একটা কানে হাত দিয়ে দেখেছিল। এই রকম যারা শুঁড়ে কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল তারা নানাপ্রকার বলতে লাগল। তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে, ঈশ্বর এমনি, আর কিছু নয়।"

প্রসঙ্গশেষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্তব্য—"ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার, আবার সাকার-নিরাকারেরও পার। তাঁর ইতি করা যায় না।"

এ গল্পটির উৎস নিঃসংশয়ে শাস্ত্রীয়। ভাগবত অন্যতম উৎস। খুঁজলে আরও প্রাচীন উৎস পাওয়া যাবে। হাতীর আকৃতি সম্বন্ধে অন্ধদের মতভেদ অথবা বহুরূপীর রঙ সম্বন্ধে নানা জনের নানা সাক্ষ্য—এ সবের উদাহরণ আমাদের চারপাশের জগতে প্রতিদিনই মেলে। প্রত্যেকের আপন আপন ধারণায় আবদ্ধ থেকে অন্যদের সঙ্গে বাদ-বিসম্বাদকেই রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'মতুয়ার বুদ্ধি'। এ বুদ্ধির দৃষ্টান্ত ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি—সব ক্ষেত্রেই তেমনি প্রযোজ্য।

গীতাপাঠের সার্থকতা : শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ : চৈতন্যচন্দ্রোদয়, চৈতন্যচরিতামৃত ও কথামৃত

ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনা ও আদর্শের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে গীতার উল্লেখ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায় নানাভাবেই দেখা দিয়েছে। খুব সহজভাবে গীতা শব্দটি উল্টে দিয়ে 'তাগী' শব্দটির দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'গীতা'র

মূল বক্তব্য বোঝাতে চেয়েছেন। অবশ্য এভাবে গীতার অর্থ নির্ণয়ের আদর্শ তিনিও পেয়েছিলেন গুরু তোতাপুরীর কাছে। 'ন্যাংটা আমায় শেখাত্তো—উপদেশ দিতো—গীতা দশবার বললে যা হয়, তাই গীতার সার!'

(কথামৃত : ৩য় : ৩০শে জুন, ১৮৮৪)

'গীতা'র উল্টো 'তাগী' শব্দটির 'য'-ফলার অভাবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন—ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। উপস্থিত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তখন মনে করিয়ে দিলেন, "তা য-ফলা না আনলেও হয়, নবদ্বীপ গোস্বামী ঠাকুরকে বলেছিলেন। ঠাকুর পেনেটিতে মহোৎসব দেখতে গিয়েছিলেন, সেখানে নবদ্বীপ গোস্বামীকে এই গীতার কথা বলেছিলেন। তখন গোস্বামী বললেন, তগ্ ধাতু ঘঙ্ 'তাগ' হয়, তার উত্তর 'ইন্' প্রত্যয় করলে তাগী হয়, তাগী ও ত্যাগী এক মানে।" (কথামৃত : ৩য় : ৩০শে অক্টোবর, ১৮৮৫)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায়—'সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যার ত্যাগ হয়ে গেছে, যে ঈশ্বরেতে ষোল-আনা ভক্তি দিতে পেরেছে, সেই গীতার মর্ম বুঝেছে।' (কথামৃত : তদেব)

'হে জীব, সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের আরাধনা কর—এই গীতার সারকথা।'

(কথামৃত : ৪র্থ : ২রা অক্টোবর, ১৮৮৪)

এ প্রসঙ্গে গল্পসরিৎসাগর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বাভাবিকভাবেই দাক্ষিণাত্যে তীর্থ-ভ্রমণরত শ্রীচৈতন্যদেবের কাহিনীটি শুনিয়েছেন—"চৈতন্যদেব যখন তীর্থে ভ্রমণ করছিলেন—দেখলেন একজন গীতা পড়ছে। আর একজন একটু দূরে বসে শুনছে, আর কাঁদছে—কেঁদে চোখ ভেসে যাচ্ছে। চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এসব বুঝতে পারছো? সে বল্লে, ঠাকুর! আমি শ্লোক এসব কিছুই বুঝতে পারছি না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তবে কেন কাঁদছো? ভক্তটি বল্লে, আমি দেখছি অর্জুনের রথ, আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জুন কথা কচ্চেন। তাই দেখে আমি কাঁদছি।" (কথামৃত : ৩য় : ৫ই আগস্ট, ১৮৮২)

চৈতন্যচরিতামৃতের এই কাহিনীটি মূলতঃ রয়েছে পরমানন্দ সেন কবি কর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে—"এবং কচন স্থলে কমপি ব্রাহ্মণমতিমূর্খতয়া শব্দার্থাববোধবিরহেণ শুদ্ধিবর্জিতং ভগবদ্গীতাং পঠন্তং প্রায়শঃ সর্বৈরেব বিহস্যমানমথ চ যাবৎপাঠং তাবদেব পুলকাশ্রুবিবশং বিলোক্য অহে অয়মুত্ত-মোঽধিকারীতি ভগবন্তমবাদীৎ, 'ব্রহ্মন্ যৎ পঠ্যতে তস্য কোঽর্থঃ' ইতি। স

প্রত্যুচে 'স্বামিন্ নাহমর্থং কিমপি বেদ্মি, অপি তু পার্থরথস্থং তোত্রপাণিং তমালশ্যামং শ্রীকৃষ্ণং যাবৎ পঠামি তাবদেব বিলোকয়ামি' ইতি। তদা ভগবতোক্তম্ 'উত্তমোঽধিকারী ভবান্ গীতাপাঠস্য' ইতি তমালিলিঙ্গ। তদনু স খলু গীতাপাঠজাদানন্দাদপি প্রচুরতরমানন্দমাস্বাদ্য, 'স্বামিন্ স এব ত্বম্' ইতি ভূমৌ নিপত্য প্রণমন্নতিশয় বিহ্বলো বভূব।"

'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে'র এই অংশটি কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায়—

[মহাপ্রভু তখন তীর্থপরিক্রমা করতে করতে চাতুর্মাস্য যাপনের জন্য শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে রয়েছেন। এই সময় তিনি বেঙ্কটভট্টের বাড়ীতে ছিলেন।]

সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে বসি করে গীতা-আবর্তন ॥
অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন লোকে করে উপহাসে ॥
কেহো হাসে কেহো নিন্দে তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হইয়া গীতা পড়ে আনন্দিত মনে ॥
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠন।
দেখি আনন্দিত হইল মহাপ্রভুর মন ॥
মহাপ্রভু পুছিলা তাঁরে শুন মহাশয়।
কোন অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয় ॥
বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি ॥
অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর।
বসিয়াছে হাতে তোত্র শ্যামলসুন্দর ॥
অর্জুনেরে কহিতেছেন হিত উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ ॥
যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাও তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতাপাঠে না ছাড়ে মোর মন ॥
প্রভু কহে গীতাপাঠে তোমারি অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার ॥

এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভুর পদ ধরি বিপ্র করেন স্তবন॥
তোমা দেখি তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর মনে লয়॥
কৃষ্ণ স্ফূর্ত্যে তার মন হৈয়াছে নির্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল॥

(চৈতন্যচরিতামৃত : মধ্যলীলা : নবম পরিচ্ছেদ)

ভক্তিসাধনার দৃষ্টিকোণে গীতাপাঠের শ্রেষ্ঠফল এইভাবে সেই আপাতমূর্খ ব্রাহ্মণের করায়ত্ত হয়েছিল বলে অভিনন্দিত হলেও একথা স্মরণীয় যে স্বয়ং মহাপ্রভু শাস্ত্রচর্চা কখনো নিষিদ্ধ করেন নি। ভক্তিশাস্ত্ররচনায় উৎসাহ বৃন্দাবনের গোস্বামীরা তাঁর কাছেই পেয়েছিলেন। অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও আধার অনুযায়ী বিভিন্ন ভক্তকে বিভিন্ন ধরনের শাস্ত্র বা সদগ্রন্থপাঠে উৎসাহিত করেছেন। তবে শাস্ত্রপাঠ জীবনের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য যিনি, তাঁকে জানলে আর শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন নেই। এইটিই শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বক্তব্য।

অধিকারীভেদে শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজনীয়তা আছে, আবার অধিকারীভেদে নেই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমায়, সেই চিঠিটি স্মরণীয়, যাতে সন্দেশ ও ধুতি পাঠাবার কথা লেখা আছে। যে চিঠিটি পেলো, সে ওই দুটি কথা মনে রেখেই চিঠির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে পারে। আবার অন্যস্তরে দেখা যায়, নানা শাস্ত্রচর্চার দ্বারা মার্জিত বুদ্ধি যেমন আত্মজ্ঞানলাভে সহায়ক হয়, তেমনি অন্যান্যদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও (অবশ্য 'চাপরাস' পেলে) তা বিশেষ প্রয়োজনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীসংগ্রহেই তাঁর শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বহুব্যাপ্ত ধারণার সুফলসম্বন্ধে সেরা দৃষ্টান্ত মেলে। তবে এই শাস্ত্রচর্চাকে জীবনচর্যার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তিনি যেভাবে কথ্যরূপ দিয়াছেন, সেইখানে তাঁর অনন্যতা। চৈতন্যচরিতামৃতের ভক্ত ব্রাহ্মণের মতো গ্রন্থপাঠের উদ্দেশ্য সফল হওয়া নিয়েই কথা—তা শাস্ত্রপাঠেই হোক, আর একান্ত ভক্তির দ্বারাই হোক।

কথাসাহিত্য আগে কথা, লোকমুখে তার উদ্ভব, ক্রমপ্রসার ও লেখনীর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এবং এ অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পকথাগুলিকে আমরা এই গঠমান রূপের দিক থেকেই লক্ষ্য করেছি, আর জানতে চেয়েছি এই সব গল্পের মূল আখ্যায়িকা বা ভাববীজের সন্ধান।

বহুসাধনার দেশ এই ভারতবর্ষ, লোককথারও অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসভূমি। বেদে উপনিষদে পুরাণে পাঁচালীতে কতোভাবে সাধনায়, দর্শনে, জীবনানুভবে মিশে গিয়ে অসংখ্য গল্পকথা গড়ে উঠেছে এদেশে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আকাশোপম উপলব্ধির অন্তহীন বিস্তারে এই সব গল্পের নক্ষত্রকণা মাঝে মাঝে ঘনীভূত আকারে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আর এ গল্পগুলির প্রাণসত্তারূপে যে অধ্যাত্মজ্যোতির বিচ্ছুরণ, তা যুগে যুগান্তরে আর্ত, জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী, অর্থার্থী—সকলের প্রেরণার পাথেয় হয়ে আছে। কিছুটা সেই ভাবলোকের সংবাদ-আহরণের প্রয়াসই এই উৎসসন্ধানের মূলে। যাঁরা উৎসের কথা না ভেবে নির্ঝরে, বা নদীতে পরিতৃপ্ত, তাঁরাও শেষ অবধি দেখবেন শ্রীরামকৃষ্ণমানস-সমুদ্রে—'রতন মাণিক্য কত পড়ে আছে অগাধ জলে'।

বাঙালীর মনন, বাঙালীর ভাষা : রাজা রামমোহন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ

১

বাংলা গদ্যের গঠনপর্বে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার ক্রমোন্নতিতে বিশিষ্ট ভূমিকার অধিকারী। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বা রামমোহন—এঁদের মধ্যে বাংলা গদ্যের রূপায়ণে কার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এ নিয়ে অনেকে বিচার করেছেন। ভাষারীতিতে নিশ্চয় বিদ্যালঙ্কারই আগে স্মরণীয়, যদিচ, যে মননশীলতার উপর বাংলাসাহিত্যের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা, তার আদি রূপকার রামমোহন। আর অনুজ বিদ্যাসাগরের মাধ্যমে মৃত্যুঞ্জয়ের প্রচেষ্টা সর্বার্থসাধক হয়ে উঠলেও সমকালীন বুদ্ধিজীবী-মানসে রামমোহনই সবচেয়ে আলোড়ন-সৃষ্টিকারী। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাসংঘাতে যে দ্বন্দ্বচেতনা আমাদের নব-জাগরণের স্বধর্ম, রামমোহনের ইংরেজী ও বাংলা রচনাবলীতেই তার অপর্যাপ্ত উপকরণ।

সেইসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর একটি প্রধান ধর্মান্দোলনের প্রবক্তা ও যোদ্ধারূপে রামমোহন সে-যুগের বাদ প্রতিবাদ ও অনুবাদমূলক সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সেই ধারাটি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, শশধর তর্কচূড়ামণি, বঙ্কিমচন্দ্র এমনি নানা জনের মাধ্যমে বাংলাসাহিত্যে ও সংবাদপত্রে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। লিখিতরূপের এই রচনাবলী কখনো সচেতন, কখনো অচেতনভাবে বাংলা গদ্যকে দৃঢ়, ভারবহনক্ষম ও স্থিতিস্থাপক করে তুলেছে।

যদি বলা যায়, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ চিন্তানায়কদের ধর্মীয় ধ্যানধারণার ঘাতসংঘাত অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মননে ও বাণীভঙ্গিমায় এক সংহত পূর্ণতা লাভ করেছে, তা শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য বিচার নয়, প্রত্যক্ষ সাহিত্য-রূপেই আমাদের লক্ষণীয়—কেউ কেউ অবাক হবেন। কিন্তু ইতিহাসের ভিতরে অনেক ইতিহাস নিহিত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা বেশীর ভাগ এ বিষয়ে অমনোযোগী বলেই এই বিষয়টির প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। অবশ্য ইচ্ছাকৃত অমনোযোগ বা অজ্ঞানকৃত

বিরুদ্ধতার কথা মনে রেখেই এ আলোচনায় ব্রতী হতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকথিত এই শিক্ষার আলোকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম সূত্র—লিখিতরূপের সঙ্গে কথিতরূপের সাহিত্যকে সমান স্বীকৃতি দেওয়া। পৃথিবীর সব প্রাচীন সাহিত্যই আগে কথনশিল্প, পরে লেখনীস্পৃষ্ট। এ যে কেবল প্রাচীনকালেরই কথা তা নয়, একালেও যাঁরা 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ', 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'ঘরোয়া' বা এসবের কিছু আগে প্রকাশিত 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' বইটি পড়েছেন, তাঁরাই বাণীরূপের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন। বাংলাসাহিত্যে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও অনতিক্রান্ত উদাহরণ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'।

বাংলা গদ্যে রামমোহন বেদান্তকে বিষয়রূপে গ্রহণ করে দেখা দিয়েছেন। পরবর্তী কালে তাঁর মসিযুদ্ধের অধিকাংশই শাস্ত্রীয় তর্ক-বিতর্কের সিদ্ধান্তমূলক আলোচনা। সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, লাটিন, গ্রীক, ইংরেজী—এমনি বহু ভাষায় রামমোহনের অবাধ বিচরণক্ষমতা। সমকালীন পণ্ডিতদের তুলনায় তাঁর পড়াশুনোর বিস্তার ও গভীরতা বিস্ময়কর; আর সেই সঙ্গে তাঁর সদাজাগ্রত ক্ষুরধার বুদ্ধি, যার বিশ্লেষণী ক্ষমতায় চিরাচরিত ভারতীয় ঐতিহ্য ও জীবনবাদ নতুন অর্থ ও সামঞ্জস্য নিয়ে দেখা দেয়। কতো দিক থেকে কতো গ্রন্থের উদ্ধৃতি, উদাহরণ, কতো মনীষীর চিন্তা ও সিদ্ধান্তের গ্রহণ-বর্জন, সর্বোপরি নিজস্ব বক্তব্যের উপস্থাপনায় সংযত স্থির বুদ্ধির আত্মস্থতা; এসব কিছুর মূলে এমন একটি মানুষ, যিনি শুধু নিজের দেশের নয়, সমস্ত পৃথিবীর যুগান্তর আসন্ন, একথা জেনে সর্বপ্রথম বিশ্বনাগরিকতার পথে অগ্রসর।

সময়সীমার দিক থেকে রামমোহনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্থক্য ষাট বছরেরও বেশী। মাঝখানে যে সব ব্যক্তিত্ব বাংলাসাহিত্যে দেখা দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দু'জন—মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর—দু'জনের সঙ্গেই রামকৃষ্ণদেবের দেখা হয়েছিল। মধুসূদনের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধিতে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম পথপ্রদর্শক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে মধুসূদনের তেমন কোনো আলাপ হয় নি। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎকারের কথাটি 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে'র জবানবন্দীতে চিরকালের সাহিত্য হয়ে আছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, রামমোহনের ধর্মমূলক চিন্তাধারার সঙ্গে বরং রামকৃষ্ণদেবের চিন্তাধারার

একটি ধারাবাহিকতা ভাবা চলে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্পূর্ণ পৃথক জগৎ বলেই অনেকের ধারণা। অথচ মানবকল্যাণব্রতী এই মহামানবকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে থেকে দেখতে এসেছেন, কারণ এই নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতার মধ্যেই নবযুগ-ধর্মের আভাস। শুধু এই সেবার সঙ্গে জ্ঞানভক্তির সম্মেলন ঘটলেই পরিপূর্ণ জীবনসত্যের প্রকাশ।

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিষয় নিয়ে বিদ্যাসাগর-সাহিত্য কোনো প্রশ্নই তোলে নি। 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ'—কথাটিও বিদ্যাসাগরের আগেই দেবেন্দ্রনাথের সৃষ্টি এবং পরবর্তী কালে শিশুপাঠ্য গ্রন্থে সংযোজিত। সুতরাং চিন্তাধারার দিক থেকে বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যথার্থ পূর্বসূরী রামমোহন। বুদ্ধিগত মননচর্চায় রামমোহন সর্বমানবের ঈশ্বরানুধ্যানের মূলগত ঐক্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন বাংলা গদ্যের সেই আদি পর্বে। তাঁর বেদান্তব্যাখ্যানের দুঃসাহসের মতোই তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পটভূমিকায় মানবজাতির ঐক্যানুভবও কম বিস্ময়কর নয়। রামমোহনের 'প্রার্থনাপত্র' বা 'অনুষ্ঠান' নামে ছোট্ট লেখা দুটিতে সেই বিশ্বমনা উদারপ্রাণের পরিচয়।

রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুথিগত পাণ্ডিত্যের তুলনামূলক আলোচনা অবান্তর। কিন্তু সমগ্র 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' যাঁরা খুঁটিয়ে দেখেছেন তাঁরা শাস্ত্রীয় পরিভাষা ও ধ্যান-ধারণার আলোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহজ দক্ষতার অজস্র উদাহরণ দেখে এই সিদ্ধান্তেই আসবেন যে, বিভিন্ন সাধু মহাপুরুষদের শাস্ত্রীয় আলোচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ এত যুক্তি ও তথ্যনির্ভর, সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে মহিমান্বিত।

প্রথম দর্শনের দিনটিতে মাষ্টার মশাই রামকৃষ্ণদেবের ঘরের সামনে দাঁড়ানো বৃন্দে ঝিকে প্রশ্ন করেছিলেন—"আচ্ছা, ইনি কি খুব বই-টই পড়েন?"

বৃন্দে—"আর বাবা বই-টই। সব ওঁর মুখে।" এর পরে নিজের সম্বন্ধে মাষ্টার মশায়ের মন্তব্য—"মাষ্টার সবে পড়াশুনা করে এসেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনে আরও অবাক হলেন।"

[কথামৃত : ১ম : প্রথম দর্শন[১] : ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮২]

---

১ অবশ্য মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্মৃতিতে নিতান্ত শৈশবে একবার দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখার সম্ভাবনার কথা আছে। তবে এ বিষয়ে খুব নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

আপন অজ্ঞাতেই বৃন্দে ঝি বুঝতে পেরেছিল, তাঁর মুখের কথাই বইয়ের সমান, বা তাঁর মুখের কথা থেকেই বই। যে অর্থেই ধরি না কেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' যে পাঁচ ভাগে মাত্র শেষ হয়েছে, সে কথা ভেবে বেদনাবোধ জাগে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শাস্ত্রপ্রামাণ্য অনুসারে কথা বলেছেন, এ একান্ত বহিরঙ্গ সিদ্ধান্ত; তার চেয়ে অনেক বড়ো কথা বাংলাভাষায় তাঁর দ্বারা নব উপনিষদ সৃষ্ট হয়েছে। সাধারণ দার্শনিক আলোচনার সীমাবদ্ধতায় তাঁকে ধরা অসম্ভব, কিন্তু তাঁর বাণী অনুসরণ করে এক সামগ্রিক দর্শন সৃষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক—বিবেকানন্দ-রচনাবলীতে তার সূচনা।

সম্প্রতি প্রকাশিত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর 'Scholar Extraordinary' (অসাধারণ মনীষী) নামে ম্যাক্সমূলরের অসামান্য জীবনী গ্রন্থখানিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইংরেজী ভাষায় প্রথম জীবনী রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা দেখা গেল। ম্যাক্সমূলরের মতে, বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদবৃন্দ তাঁদের গুরুদেবের উক্তিসমূহের সঙ্গে বাদরায়ণের সূত্রাবলীর পার্থক্যের কথা মনে রাখলেই ভালো করবেন। ম্যাক্সমূলরের ধারণা শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'ভক্ত'; জ্ঞানযোগ তাঁর পথ নয়। অপরপক্ষে উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং এ জাতীয় শাস্ত্রের শঙ্কর বা রামানুজকৃত ভাষ্যকে যতদিন শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তমণ্ডলী মান্য করে চলবেন, ততদিনই নিঃস্বার্থ ভক্তি ও সমুচ্চ আদর্শের অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদের সাফল্য সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত।[১]

শ্রীরামকৃষ্ণজীবন, সাধনা ও বাণীতে তাঁকে শুধুমাত্র 'ভক্ত' হিসাবে দেখার সুযোগ যেমন রয়েছে, তেমনি তাঁর বেদান্তসিদ্ধান্ত অথবা কর্মযোগে অনুপ্রেরণার কথাও রয়েছে। তিনি একাধারে জ্ঞানী ও ভক্ত, যোগী ও কর্মপ্রেরণার উৎস। ম্যাক্সমূলরের কাছে তাঁর বাণীর অতি সামান্যই পৌঁছেছিল, তাঁর জীবনের সামগ্রিক

---

১ "Vivekananda and the other followers of Ramakrishna ought, however, to teach their followers how to distinguish between the perfervid utterances of their teacher, Ramakrishna, an enthusiastic Bhakta (devotee)......and the clear and dry style of the Sutras of Badarayana. However as long as these devoted preachers keep true to the Upanishads, to Sutras and the recognized commentaries, whether of Samkara or Ramanuja, I wish them all the success they deserve by their unselfish devotion and their high ideals." 'Scholar Extraordinary: The Life of Professor the Rt. Hon. Friedrich Max Muller, P. C.': p. 329; Nirod C. Chowdhury. উল্লেখিত গ্রন্থে ম্যাক্সমূলরের মন্তব্যরূপে উদ্ধৃত।

তাৎপর্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেন বিবেকানন্দ বা ব্রহ্মানন্দের মতো সাধকেরা। আর 'কথামৃতে'র পাতায় পাতায় ম্যাক্সমূলরের অমূলক আশঙ্কা অপ্রমাণিত। বেদ-উপনিষদ-তন্ত্র-পুরাণের পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর প্রকাশ—যা একদিকে শাস্ত্রপ্রামাণ্যে প্রতিষ্ঠিত, অপরদিকে নতুন শাস্ত্ররূপেও স্বমহিমায় দীপ্ত। তাঁর অনেক বাণীই নবযুগের ব্রহ্মসূত্র বা ভক্তিসূত্র। ঋষি বা ভাষ্যকারেরা কেবল পুরাকালেই আসেন নি, যুগে যুগেই আসেন। শাস্ত্রব্যাখ্যায় শুধু নয়, উপলব্ধিময় 'শ্রুতি'-প্রমাণরূপেও শ্রীরামকৃষ্ণবাণী বিশেষভাবে বিচার্য।

গভীরতম প্রজ্ঞা, সুন্দরতম প্রকাশ, সহজতম ভঙ্গী—শ্রীরামকৃষ্ণসাহিত্যের এই তিনটি মূল লক্ষণ। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেরই লক্ষণ। এর এক একটি অংশমাত্র অবলম্বন করে সাহিত্যে শিল্পে অবিনশ্বর কীর্তি স্থাপিত হয়। কোথাও জ্ঞানচর্চার দৃষ্টান্ত বেশী, কোথাও প্রকাশভঙ্গিমাই প্রাধান্য পায়, কোথাও বিষয়-অনুসারে ভঙ্গীর তারতম্য। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণবাণী সর্বক্ষেত্রেই পূর্বোক্ত তিনটি গুণের সামঞ্জস্যে বিধৃত। তিনি তো সাহিত্যস্রষ্টাদের মতো নানান্ ঘষামাজার মধ্য দিয়ে বক্তব্য সাজাতে চান নি। সাধু এবং চলতি, বাংলা এবং ইংরেজী—বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁর জীবৎকালে এবং পরবর্তীকালে তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সে সব কথার অনবদ্য বাণীরূপ সবসময়ই মানুষকে মুগ্ধ বিস্মিত করে চলেছে।

রামমোহন বা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার যে ভাষায় শাস্ত্রালোচনা করেছেন, তা নিঃসংশয়ে পাঠকের শাস্ত্রজ্ঞান ও বহুদর্শিতার উপরেই নির্ভরশীল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথার উপলক্ষ সর্বস্তরের মানুষ—যেখানে বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপ মজুমদার, শশধর তর্কচূড়ামণি, মহেন্দ্রলাল সরকার যেমন আছেন, তেমনি আছেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গিরিশ ঘোষ, রামচন্দ্র দত্ত, আবার সারদাদেবী, গোপালের মা, যোগীন মা, গোলাপ মা, লক্ষ্মীদিদি, ভানু পিসি প্রমুখ অন্তঃপুরচারিণীরা, তেমনি আছেন নরেন, রাখাল, নিরঞ্জন, তারক, বাবুরাম, কালী, ভবনাথ, ছোট নরেন প্রমুখ সেকালের ইয়ং বেঙ্গল, কখনো বা ভৃত্যরূপে অন্তরঙ্গ সেবক লাটু, কখনো বা শরণাগত রসিক মেথর, কখনো বা বৃন্দে ঝি। এমন বিভিন্ন ও বিচিত্র স্তরের শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশে যে ভাষায় পরমসত্যের উপলব্ধি সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠবে, সেই ভাষায় প্রতিটি দিন এমন কথার অমৃত বিতরণ করা যে কতো বড়ো শিল্পসাধনার পরিণতি সে কথা সাহিত্যের দিক থেকেই আমাদের চিন্তনীয়।

বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে রামমোহনের প্রথম বাংলা রচনা 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫)। এ বইয়ের ভূমিকা থেকে আংশিক উদ্ধৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির জন্য উপস্থাপিত করি। নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রামমোহনের যুক্তির একটি নমুনা—"যাঁহারা সকল বেদান্ত-প্রতিপাদ্য পরমাত্মার উপাসনা না করিয়া পৃথক ২ কল্পনা করিয়া উপাসনা করেন তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে ওই সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিম্বা অপর কাহাকেও ঈশ্বর কহিয়া তাঁহার প্রতিমূর্তি জানিয়া ওই সকল বস্তুর পূজাদি করেন ইহার উত্তরে তাঁহারা ওই সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহিতে পারিবেন না যেহেতু ওই সকল বস্তু নশ্বর এবং প্রায় তাঁহাদের কৃত্রিম অথবা বশীভূত হয়েন অতএব যে নশ্বর এবং কৃত্রিম তাঁহার ঈশ্বরত্ব কিরূপে আছে স্বীকার করিতে পারেন…।" (বেদান্ত গ্রন্থ : সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ : পৃঃ ৬) বাংলা গদ্যের প্রথম পর্বে ভাষাভঙ্গীর আড়ষ্টতা সত্ত্বেও রামমোহনের যুক্তিবাদী মনোভঙ্গী এখানে পরিস্ফুট। পরবর্তী কালে রামমোহনের গদ্যভঙ্গী উন্নততর।

মাস্টার মশাই বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনলাভের দ্বিতীয় দিনটিতে (১৮৮২) ব্রাহ্মমনোভাবাপন্ন মাস্টার মশাইকে উপলক্ষ করে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন রামমোহনসমেত সমগ্র ব্রাহ্ম আন্দোলনের উদ্দেশেই প্রশ্ন করলেন—'আচ্ছা, তোমার সাকারে বিশ্বাস, না নিরাকারে ?' মাস্টার (অবাক হইয়া স্বগতঃ)—'সাকারে বিশ্বাস থাকলে কি নিরাকারে বিশ্বাস হয় ?'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি মাস্টার—'আজ্ঞা নিরাকার, আমার এইটি ভালো লাগে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—'তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হল। নিরাকারে বিশ্বাস, তাতো ভালোই। তবে এ বুদ্ধি করো না যে,—এইটি কেবল সত্য আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাকবে।'

মাস্টার—'আচ্ছা. যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের ত বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে পূজা ক'রো, মাটিকে পূজো করা উচিত নয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—'তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক। কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায় তার

ঠিক নেই। তুমি বুঝাবার কে? যাঁর জগৎ তিনি বুঝাবেন।…তিনি ত অন্তর্যামী। যদি ঐ মাটির প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হ'ন…তুমি মাটির প্রতিমা পূজা বলছিলে? যদি মাটিরই হয়, সে পূজার প্রয়োজন আছে। নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন।…যার পেটে যা সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।' [কথামৃত : ১ম]

একদা আলোচনাপ্রসঙ্গে অশ্বিনী দত্ত প্রশ্ন করেছিলেন,—'হিন্দুতে ও ব্রাহ্মতে তফাৎ কি?' উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই অপূর্ব তুলনা—"তফাৎ আর কি? এইখানে রোশন চৌকি বাজে, একজন সানাইয়ের ভোঁ ধরে থাকে, আর একজন তারই ভিতর 'রাধা আমার মান করেছে', ইত্যাদি রং পবং তুলে নেয়। ব্রাহ্মেরা নিরাকার ভোঁ ধরে বসে আছে। আর হিন্দুরা রং পরং তুলে নিচ্ছে।'

"জল আর বরফ—নিরাকার আর সাকার। যা জল তাই ঠাণ্ডায় বরফ হয়, জ্ঞানের গরমীতে বরফ জল হয়, ভক্তির হিমে জল বরফ হয়।'

(কথামৃত : ১ম : পরিশিষ্ট)

প্রতিদিনের কথ্য ভাষায় যে দর্শন, বিজ্ঞান, শাস্ত্র সবই একদিন প্রকাশিত হবে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষা কি তারই পূর্বাভাস নয়? ব্রাহ্ম সমাজের কর্ণধারদের সবচেয়ে জটিল অঙ্কটির এমন সমাধান এমন ভাষায় কে ভাবতে পেরেছিল? অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সমাধানে সবাই যে সন্তুষ্ট হবেন, এমন আশা করা কঠিন। কিন্তু অশ্বিনী দত্ত হয়েছিলেন এবং সেকালের ও একালের অনেক মানুষই হ'ন। তার কারণ ব্রহ্ম যে শুধুমাত্র বিচার-বিতর্কে প্রতিপাদ্য নন, তিনি যে প্রত্যক্ষ অনুভব ছাড়া আর কিছুতেই প্রতীয়মান হতে পারেন না, সে কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, উপমায়, তন্ময়তায় পদে পদে প্রমাণিত। কিন্তু সেইজন্যে ধর্মীয় বিষয়ে বিচার-বিতর্ক, এমন কি ঈশ্বর আছেন কি না এ বিষয়ে মৌলিক সন্দেহ—এ সবেরও বুদ্ধিগত প্রয়োজন আছে। সত্যলাভের জন্যই মানুষের সত্যকে যাচাই করে নেওয়ার অধিকার।

সেইজন্যই ঈশ্বরপ্রসঙ্গে আপাত নিরুৎসুক ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে ঈশ্বরতন্ময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলাপনটুকু বারম্বার স্মরণযোগ্য। ১৮৮২-র ৫ই আগস্টের এই আলাপচারীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে শ্রীম মন্তব্য করেছেন—"বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। ষড়্‌দর্শন পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, বুঝি ঈশ্বরের বিষয়ে কিছুই

জানা যায় না।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিন্তু প্রাথমিক আলাপচারীর পরেই সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরপ্রসঙ্গে মগ্ন। 'ষড়্দর্শনের পণ্ডিতে'র কাছে তিনি ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন—"ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়্দর্শন সব এঁটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিষ কেবল উচ্ছিষ্ট হয় হয় নাই, সে জিনিষটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারে নাই।"

বন্ধুদের দিকে চেয়ে বিদ্যাসাগর বলছেন—'বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি নূতন কথা শিখলাম।' (কথামৃত : ৩য়) এই স্বীকৃতি বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্যের নিঃসংশয় অভিজ্ঞান।

উপযুক্ত শ্রোতার কাছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও সেদিন তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার মণিভাণ্ডারটি উজাড় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকীর্তির কথা কি জানতেন শ্রীরামকৃষ্ণ? হয়তো কিছুটা শুনে থাকবেন। বিদ্যাসাগরকে তিনি চিনেছিলেন তাঁর কথায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুদ্ধসত্ত্ব রসিকতার অমন সুন্দর প্রত্যুত্তর দিতে 'কথামৃতে' আর কাউকে দেখি না। আবার বিদ্যাসাগরের হৃদয়, চরিত্র, মনুষ্যত্ব সবই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাই নির্বারিত হয়েছিল তাঁর অন্তর্জগৎ।

ব্রহ্মোপলব্ধির সেই বাক্যমনাতীত জগতের আভাষ দিতে গিয়ে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, "তবে বেদে পুরাণে যা বলেছে—সে কি রকম বলা জান? একজন সাগর দেখে এলে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে বলে—'ও! কি দেখলুম! কি হিল্লোল কল্লোল!' ব্রহ্মের কথাও সেই রকম।...নুনের ছবি সমুদ্র মাপতে গিছলো। কত গভীর জল তাই খপর দেবে! খপর দেওয়া আর হ'ল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর খপর দিবেক?'

আবার বিদ্যাসাগরের নিষ্কাম কর্মের সমর্থনে বললেন—"তুমি যে সব কর্ম করছো, এ সব সৎকর্ম। যদি 'আমি কর্তা' এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কাম-ভাবে করতে পারো, তাহলে খুব ভালো। এই নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে।" সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন—"তুমি যে সব কর্ম করছো, এতে তোমার নিজের উপকার। নিষ্কামভাবে কর্ম করতে

পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে।···অন্তরে সোনা আছে, এখনও খপর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে।"

একদিকে আধুনিক মানবিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী, আর একদিকে নিখিল-সংসারে ব্রহ্মময় উপলব্ধির 'বিজ্ঞানী'দৃষ্টি—এই দুই প্রান্তের যোগসূত্রটি যেন সেদিনের আলোচনায় ধরা দিল। একদিকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে সংশয়ের ফলে শুধুমাত্র জগৎ ও জীবনকে গ্রহণের চেষ্টা, আর একদিকে জগৎকে চিরন্তন সত্যের দিক থেকে মিথ্যা জেনে ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে আবার সর্ব জীবে সর্ব বস্তুতে সেই ব্রহ্মের প্রকাশ উপলব্ধি করা—আন্তরিকতা থাকলে এ দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই চিন্তার স্তরপরম্পরা গড়ে উঠতে পারে।

কিন্তু শুধু কি ঈশ্বর বা ব্রহ্মপ্রসঙ্গই সেদিনের আলোচনার লক্ষণীয় বিষয় ছিল ? অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণসাহিত্যের মূল বিষয় বা রসবস্তু এক ঈশ্বর। ভগবানলাভ যখন মানবজীবনের উদ্দেশ্য, তখন সাহিত্যেরও সেই পরম উদ্দেশ্য। তবু, যে সৌন্দর্যে, সরলতায়, চিত্রধর্মে, ধ্যানস্পর্শে একে একে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাগুলি ফুটে উঠেছিল, তাও কি লক্ষণীয় ছিল না ?

'আজ সাগরে এসে মিললাম।'

'তুমি ক্ষীর সমুদ্র।'

'ছাদে অনেকক্ষণ লোক থাকতে পারে না, আবার নেমে আসে। যাঁরা সমাধিস্থ হয়েছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীব জগৎ তিনিই হয়েছেন।'

'···সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসে; আবার কথা কয়। যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ সময় ভন্ ভন্ করে। ফুলে বসে মধু পান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখনও কখনও গুন গুন করে।'

'বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে, বরুণ রাজার খপর নাই!'

বাংলা সাধু গদ্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সঙ্গে সেদিন বাংলা চলতি গদ্যের মহাশিল্পী কথা বলছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে প্রস্থানোদ্যত বয়ঃকনিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বিদ্যাসাগর সেদিন প্রণাম করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ যেমন শোনা গেছে, বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন সময়ের আলাপনে ঈশ্বরপ্রসঙ্গও তেমনি আমরা মনে রাখতে পারি। এক হিসাবে বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর-প্রসঙ্গের দুর্লভ উদাহরণ হিসাবে এরা যেমন স্মরণীয়, তেমনি বিদ্যাসাগরের আলাপচারীর উদাহরণ হিসাবে রামকৃষ্ণ-কথার পাশাপাশি এরা আমাদের চিন্তার খোরাক জোগাতে পারে।

'কথামৃত'কার মহেন্দ্রনাথের প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর একদিন বলেছিলেন, "তাঁকে তো জানবার যো নাই। এখন কর্তব্য কি? আমার মতে কর্তব্য, আমাদের নিজেদের এরূপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়ে পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়।"

(কথামৃত : ৩য় : ৫ই আগস্ট, ১৮৮২-র দিনলিপিতে বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ)

অথবা ধরুন, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের অভিমত—'এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন, তা বেশ বুঝি। তবে এ পথে না চলিয়া ঐ পথে চলিলে নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এ সকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করি না। লোককে বুঝিয়ে কি শেষটা ফ্যাসাদে পড়ে যাব?'

ফ্যাসাদটি কি? একটি কাল্পনিক গল্পে বিদ্যাসাগর সেই ভয়ের কারণটি উঁচুদরের পরিহাসরসিকতায় প্রকাশ করেছেন—"মনে কর, মরবার পর আমরা সকলে ঈশ্বরের কাছে গেলুম। মনে কর কেশব সেনকে যমদূতেরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গেল। কেশব সেন অবশ্য সংসারে পাপটাপ করেছে। যখন প্রমাণ হল, তখন ঈশ্বর হয়ত বলবেন, ওকে পঁচিশ বেত মারো। তারপরে মনে কর, আমাকে নিয়ে গেল। আমি হয়ত কেশব সেনের সমাজে যাই। অনেক অন্যায় করেছি। তার জন্য বেতের হুকুম হল; তখন আমি হয়ত বললাম, কেশব সেন আমাকে ঐরূপ বুঝিয়েছিলেন, তাই এই রূপ কাজ করেছি। তখন ঈশ্বর দূতদের হয়ত আবার বলবেন, কেশব সেনকে আবার নিয়ে আয়! এলে পরে হয়ত তাকে বলবেন, তুই একে উপদেশ দিছিলি? তুই নিজে ঈশ্বরের বিষয়ে কিছু জানিস না, আবার অপরকে উপদেশ দিছিলি? ওরে, কে আছিস—একে আর পঁচিশ বেত দে।···নিজেই সামলাতে পারি না, আবার পরের জন্য বেত খাওয়া!"

(কথামৃত : ২য় : পরিশিষ্ট)

এই সঙ্গে মনে করা যেতে পারে—ফকির অখিলদ্দিনের গাওয়া সেই বাউল-গানটি, যা শুনে বিদ্যাসাগর চোখের জলে ভেসেছিলেন—

কোথায় ভুলে রয়েছে ও নিরঞ্জন নিল্লয় করবে রে কে,
তুমি কোনখানে যাও কোথায় থাক রে মন অটল হয়ে,
কোথায় ভুলে রয়েছ—।
তুমি আপনি নৌকা আপনি নদী, আপনি দাঁড়ি, আপনি মাঝি,
আপনি হও রে চরণদারজী, আপনি হও যে নায়ের কাছি,
আপনি হও যে হাল বৈঠা।
তুমি আপনি মাতা আপনি পিতা
আপনার নামটি রাখবো কোথা, সে নাম হৃদয়ে গাঁথা,
আমার গোসাঞিচাঁদ বাউলে বলে সে নাম ভুলবো না রে প্রাণ গেলে।
তুমি আপনি অসার, আপনি হও সার,
আপনি হও রে নদীর দুধার, আপনি নদীর কিনার,
আমি অগাধ জলে ডুব দিতে যাই, সে নাম ভুলবো না রে প্রাণ গেলে।
আপনি তরো আপনি সারা, আপনি জরা, আপনি মরা,
আপনি হও যে নদীর পাড়া আবার আপনি হও সে শ্মশানকর্তা গো,
আপনি হও সে জলের মীন, ও নিরঞ্জন তোর কোথায় গো সাকিন,
আমি ভেবে চিন্তে হলেম ক্ষীণ।

এই বাউল গানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নিহিত ধর্মচেতনার মিলটুকু স্মরণ করা যেতে পারে। নিজেকে বাউল বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ; বাউলের সাধনা ভাবনা ও প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল। তবে বাউলের মতো অতটা মিষ্টিক বা গূঢ়সংকেতের জগতে আবদ্ধ ন'ন তিনি। উপনিষদ বা গীতার স্বচ্ছপ্রকাশের সঙ্গেই তাঁর উপলব্ধিজাত ভাষার প্রসাদগুণ বেশী মেলে। আবার ধম্মপদ বা বাইবেলের মতো সাধারণ মানুষের মুখের কথার সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা।

৩

রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিন্তাধারার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যোগ বেশী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের। রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ'

(১৮১৫) ও 'বেদান্তসারে'র (১৮১৫) ভূমিকায় লিখিত রামমোহনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মৃত্যুঞ্জয় তাঁর 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (১৮১৭) গ্রন্থে যে সব যুক্তি উত্থাপিত করেছিলেন, রামমোহন তার জবাবে লেখেন 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার।' ভারতীয় সাধনার বহুবিচিত্র ধারা অবলম্বনে যে দার্শনিক পদ্ধতিগুলি গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগ—অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত। রামমোহন উপনিষদ-কেন্দ্রিক যে ব্রাহ্ম আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা অদ্বৈতবাদেরই কাছাকাছি। কিন্তু পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদ-চিন্তা অনেকটা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ায়, যা ছিল মূলত জ্ঞানপথের সাধনা, তাই হয়ে দাঁড়ালো ভক্তের ব্যাকুলতা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই ব্রাহ্মদের সম্বোধন করেই বলেছিলেন, 'তোমরা জ্ঞানী নও, ভক্ত।'

অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত—আপাত দৃষ্টিতে খুব পৃথক বলে মনে হলেও শেষ অবধি অদ্বৈতবাদই ভারতীয় মানসের অন্বিষ্ট। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার অদ্বৈতবাদী সাধনার দুরূহতার কথা মনে রেখেই সাধারণ মানুষকে সাবধান করার জন্য 'বেদান্তচন্দ্রিকায়' বহুযুগ-প্রচলিত সাকার উপাসনাপদ্ধতির সমর্থনে যুক্তিস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' গ্রন্থে রামমোহন নিপুণভাবে মৃত্যুঞ্জয়ের স্থাপিত যুক্তিগুলি খণ্ডন করলেও দেখা যায় মানসিক স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন উপাসনাপদ্ধতিকে তিনি অস্বীকার করেন নি। ফলাফলের দিক থেকে বিচার করলে মৃত্যুঞ্জয়ের সাকার উপাসনা সমর্থনের ভাবটিই হিন্দুসমাজ পরবর্তীকালে গ্রহণ করেছেন, অবশ্য অনেক পরিমাণে অদ্বৈতবাদের পটভূমিকায় স্থাপন করে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভূমিকা এই মননগত সিদ্ধান্তের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাসাহিত্যে সমকালীন তর্কযুদ্ধের যে সব উদাহরণ রয়েছে, তার কিছু আমরা তুলনামূলকভাবে উপস্থাপিত করতে পারি।

'বেদান্তগ্রন্থে'র 'অনুষ্ঠান' অংশে রামমোহনের অন্যতম যুক্তি—"কেহ ২ কহেন ব্রহ্মপ্রাপ্তি যেমন রাজপ্রাপ্তি হয় সেই রাজপ্রাপ্তি তাহার দ্বারীর উপাসনা ব্যতিরেক হইতে পারে না সেইরূপ রূপগুণবিশিষ্টের উপাসনা বিনা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবেক না। যদ্যপি এ বাক্য উত্তরযোগ্য নহে তত্রাপি লোকের সন্দেহ দুর করিবার নিমিত্ত লিখিতেছি। যে ব্যক্তি রাজপ্রাপ্তি নিমিত্ত দ্বারীর উপাসনা করে সে দ্বারীকে সাক্ষাৎ রাজা কহে না এখানে তাহার বিপরীত দেখিতেছি যে রূপগুণবিশিষ্টকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কহিয়া উপাসনা করেন দ্বিতীয়ত রাজা হইতে রাজার

দ্বারী সুসাধ্য এবং নিকটস্থ সুতরাং তাহার দ্বারা রাজপ্রাপ্তি হয় এখানে তাহার অন্যথা দেখি ব্রহ্ম সর্বব্যাপী আর যাঁহাকে তাঁহার দ্বারী কহ .তেহো মনের অথবা হস্তের কৃত্রিম হয়েন…কিরূপে এমত বস্তুকে অন্তর্যামী সর্বব্যাপী পরমাত্মা হইতে নিকটস্থ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন কহা যায়…

(বেদান্তগ্রন্থ : সা. প. সং : পৃঃ ১০)

এর কিছুদিন পরে রামমোহন 'কেনোপনিষদে'র অনুবাদ ছাপালেন। কেন বা তলবকার উপনিষদে 'উমা হৈমবতী'র যে কাহিনী রয়েছে, সে কাহিনীর উল্লেখ করে কেউ কেউ ব্রহ্মের সাকাররূপধারণের যুক্তি উত্থাপন করতে চাইলেন— 'যদি ব্রহ্ম বিদ্যুতের ন্যায় দেবতাদের সম্মুখে প্রকাশ পাইলেন আর বাক্য কহিলেন তবে তেঁহো একপ্রকার সাকার হইলেন'—একথার উত্তরে রাম মোহনের বক্তব্য— 'যে ব্যক্তি সকল গ্রন্থের পূর্বাপর না পড়িয়া এবং বিবেচনা না করিয়া আশঙ্কা করেন যেহেতু ওই উপনিষদের পূর্বে ব্রহ্মের স্বরূপ যে পর্যন্ত কহা যায় তাহা কহিলেন অর্থাৎ তেঁহো মন বুদ্ধি বাক্য শ্রবণ ঘ্রাণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন পরে এই স্থির করিবার নিমিত্তে যে কর্তৃত্ব ব্রহ্ম বিনা অন্য কাহারো নাই—ওই আখ্যায়িকা অর্থাৎ ইতিহাস কহিলেন যেহেতু ওই উপনিষদে এবং ভাষ্যতে লিখিতেছেন যে এরূপ আদেশ মায়িক বস্তুত তাঁহার উপমা নাই এবং চক্ষুর্গোচর তেঁহ কদাপি হয়েন না ইহা না হইলে উপনিষদের পূর্বাপর বাক্যের একতা থাকে না।'

(ঈশোপনিষৎ : অনুষ্ঠান : রামমোহন গ্রন্থাবলী : সা. প. সং)

রামমোহনের অন্য যুক্তিটিই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে ভেবে দেখতে পারি—"ব্রহ্মমায়া কল্পনায় আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত নাম রূপেতে দেখাইতেছেন তাঁহার বিদ্যুতের ন্যায় মায়া কল্পনা করিয়া দেখান কোন আশ্চর্য আর যেহোঁ যাবৎ শব্দকে কর্ণের গোচর করিতেছেন আর সেই শব্দসকলের দ্বারা নানা অর্থ প্রাণিসমূহকে বোধ করাইতেছেন তাঁহার কি আশ্চর্য যে অগ্নি বায়ু ইন্দ্রের কর্ণে শব্দ দ্বারা অর্থ বোধ করান।" বস্তুতঃ এই ভাবধারারই অন্য বিকাশ 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা' কথাটিতে। এখন প্রশ্ন, এই রূপকল্পনা মানুষের না স্বয়ং ঈশ্বরের ? 'উমা হৈমবতী'র রূপ বা অন্যান্য ঈশ্বরীয় রূপ কি একান্ত মানবিক ধারণার সৃষ্টি ?

রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ' 'বেদান্তসার'—বই দুটি এবং 'কেন' ও 'ঈশোপ-নিষদের' অনুবাদের পরে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'বেদান্তচন্দ্রিকায়' বিস্তারিতভাবে

রামমোহনের বক্তব্যের উত্তর দেবার চেষ্টা করেন। সমগ্র ভারতীয় ধর্মসাধনার ঐতিহ্যের দিক থেকে রামমোহনের বক্তব্যের পাশাপাশি মৃত্যুঞ্জয়ের বক্তব্যও সশ্রদ্ধ অভিনিবেশের যোগ্য। বস্তুতঃ মৃত্যুঞ্জয়ের চিন্তাধারা রামমোহন থেকে যে সম্পূর্ণ পৃথক, তা নয়, বরং ভারত-সংস্কৃতির দিক থেকে এঁরা একে অন্যের পরিপূরক।

দ্বৈতবাদী মাধবাচার্য বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের বেদান্তব্যাখ্যাও যে শঙ্করাচার্যের বেদান্তব্যাখ্যার পাশাপাশি আমাদের স্মরণীয়, সে কথা মৃত্যুঞ্জয় আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। (বেদান্তচন্দ্রিকা : সা. প. সং পৃঃ ১৩২) মৃত্যুঞ্জয়ের বক্তব্য থেকে দু' চারটি সূত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিন্তাধারা উপলব্ধির সহায়করূপে উদ্ধৃত করি।—

(ক) "অচিন্ত্যানন্তশক্তিবিশিষ্ট যে চৈতন্য তিনি স্বশক্তিপ্রাধান্যবিবক্ষাতে দুর্গা, কালী ইত্যাদি নানা নামেতে অভিধেয় ও চতুর্ভুজ, অষ্টভুজ, দশভুজাদি রূপেতে ধ্যেয় নানাবিধ দেবীরূপেতে উপাস্য হন।" (তদেব : পৃঃ ১৩৫)

(খ) "শক্তির কখনো শক্তিমান হইতে পৃথক সত্তা নয়।"

(তদেব পৃঃ ১৩৭)

(গ) …"যেমন কোন মহারাজ আচ্ছন্নরূপে স্বপ্রজাবর্গের রক্ষানুরোধে সামান্য লোকের ন্যায় স্বরাজ্যে ভ্রমণ করেন তেমনি ঈশ্বরও রামকৃষ্ণাদি মনুষ্যরূপে আচ্ছন্ন স্বরূপ হইয়া স্বসৃষ্ট জগতের রক্ষা করেন ইহাতে যেমন আচ্ছন্ন রূপের উপাসনাতে মহারাজোপাসনা হয় তেমনি আচ্ছন্ন লীলাবিগ্রহোপাসনাতে ঐ পরমেশ্বরের উপাসনা হয়।" (তদেব : পৃ : ১৪৩)

(ঘ) "আর যদি মন্দির মসজিদ গিরজা প্রভৃতি যে কোন স্থানে বিহিত-ক্রিয়াদ্বারা শূন্যস্থানে ঈশ্বর উপাস্য হন তবে কি সুঘটিত স্বর্ণমৃত্তিকা পাষাণকাষ্ঠাদিতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয়।" (তদেব : পৃঃ ১৪৫)

"…মহারাজাধিরাজকে অতি ক্ষুদ্র লোকেরা শ্রদ্ধাভক্তিতে যৎকিঞ্চিৎ ফুল জল যদি দেয় তবে কি তিনি তাহাতে আমোদ করেন না।…পিতাকে বালকেরা মিষ্টান্ন বলিয়া মৃৎখণ্ড দিলে তিনি তৎপরিতোষার্থে হাতে লইয়া মুখ লাড়েন না…"

(তদেব : পৃঃ ১৪৬)

ভারতীয় সাধনার রূপময় ও অরূপ-সাধনার ঐতিহ্য মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা'য় যেভাবে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পেয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'কথামৃতে' তার

সমজাতীয় বহু উক্তিই পাঠকদের মনে জাগবে। আমরা সামান্য কিছু সমজাতীয় মন্তব্য উপস্থাপিত করছি।

(ক) "জ্ঞানীরা নিরাকার চিন্তা করে। তারা অবতার মানে না। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করছেন, 'তুমি পূর্ণব্রহ্ম' ; কৃষ্ণ অর্জুনকে বল্লেন, 'আমি পূর্ণব্রহ্ম কিনা দেখবে এস।' এই বলে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে বল্লেন, 'তুমি কি দেখছ ?' অর্জুন বল্লে, 'আমি এক বৃহৎ গাছ দেখছি,—তাত থোলো থোলো কালো জামের মত ফল ফলে রয়েছে।' কৃষ্ণ বল্লেন, 'আরো কাছে এসে দেখ দেখি, ও থোলো থোলো কালো ফল নয়,—থোলো থোলো কৃষ্ণ অসংখ্য ফলে রয়েছে—আমার মত। অর্থাৎ সেই পূর্ণব্রহ্মরূপ বৃক্ষ থেকে অসংখ্য অবতার হচ্ছে যাচ্ছে।... আমি সাকারবাদীর কাছে সাকার, আবার নিরাকারবাদীর কাছে নিরাকার।"

[কথামৃত : ৩য় : ২২শে অক্টোবর, ১৮৮২]

"নিরাকার সাধনা হবে না কেন ; তবে বড় কঠিন। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না হলে হয় না। বাহিরে ত্যাগ আবার ভিতরে ত্যাগ। বিষয়বুদ্ধির লেশ থাকলে হবে না।"

"নিরাকার সাধক হয়ত আগে দশভুজা দর্শন করলে, তারপর চতুর্ভুজ। তারপর দ্বিভুজ গোপাল ; শেষে অখণ্ডজ্যোতিঃ দর্শন করে তাতেই লীন।"

[কথামৃত : ৫ম : ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩]

(খ) "ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। একেকে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়।...দুধ কেমন ? না, ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না।"

[কথামৃত : ১ম : ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২]

(গ) "অবতার যখন আসে তখন সাধারণ লোকে জানতে পারে না, গোপনে আসে। দুই চারজন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে।"

[কথামৃত : ২য় : ১১ই মার্চ, ১৮৮৩]

"অবতারের উপর ভালবাসা এলেই হ'লো। আহা গোপীদের কি ভালোবাসা !" [তদেব : ২য় : ২২শে মার্চ, ১৮৮৩]

"তিনি নরলীলা করবার জন্য মানুষের ভিতর অবতীর্ণ হন, যেমন রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব।"

"অবতারকে চিন্তা করলেই তাঁর চিন্তা করা হয়।"

[কথামৃত : ৫ম : ৯ই মার্চ, ১৮৯৪]

"মানুষের ভিতর তিনি বেশী প্রকাশ।...ঈশ্বরকে খুঁজতে হলে অবতারের ভিতর খুঁজতে হয়।" [কথামৃত : ৫ম : ২১শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩]

(ঘ) "যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমার পূজা করতে করতে সত্যের রূপ উদ্দীপন হয়।"

[কথামৃত : ৪র্থ : ১লা জানুয়ারী, ১৮৮৩]

"প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না? তিনিই মানুষ হয়ে লীলা করছেন।" (কথামৃত : ২য় : ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৪)

"বাপের পাঁচটি ছেলে,—দুই একজন 'বাবা' বলে ডাকতে পারে। আবার কেউ বা 'বা' বলে ডাকে,—কেউ বা 'পা' বলে ডাকে, সবটা উচ্চারণ করতে পারে না। যে বাবা বলে, তার উপর কি বাপের বেশী ভালবাসা হবে?—যে 'পা' বলে তার চেয়ে? বাবা জানে—এরা কচি ছেলে, 'বাবা', ঠিক বলতে পাচ্ছে না।" (কথামৃত : ৪র্থ : ২৩শে মার্চ, ১৮৮৪)

মৃত্যুঞ্জয়ের চিন্তাধারার সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের বক্তব্যের যে মিল এখানে আমরা দেখতে পাই, সেই প্রসঙ্গে একথা অবশ্যই স্মরণীয় যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরানুভবের সঙ্গে রামমোহন বা মৃত্যুঞ্জয় কারুরই তুলনা চলে না। কিন্তু ভারতসংস্কৃতির বিশাল উদার পটভূমিতে রামমোহনের চেয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবের মিল বেশী—এইটিই দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য।

প্রতিমাপূজা প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের সিদ্ধান্ত—(১) প্রতিমা মৃন্ময়ী নয়, চিন্ময়ী। (২) 'ঈশ্বরীয় রূপ মানতে হয়।' (৩) সাকার থেকে নিরাকার সাধনায় ক্রম উত্তরণই অধিকাংশ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক পন্থা। (৪) ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই, তাঁর ইতি করা যায় না, তিনি সাকার, নিরাকার, আবার এ দুয়েরও পার। এ গ্রন্থে এ পর্যন্ত আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যেসব বাণী স্মরণ ও মননের চেষ্টা করেছি, তার মধ্যেই এ বক্তব্য নানাভাবে উদাহৃত, আর বিস্তারের প্রয়োজন নেই।

রামমোহন অবশ্য মৃত্যুঞ্জয়ের যুক্তি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে খণ্ডন করেছেন তাঁর 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' গ্রন্থে। মৃত্যুঞ্জয়ের বক্তব্যের বিরুদ্ধে রামমোহনের কিছু যুক্তি আমরা উপস্থাপিত করছি।

প্রথমতঃ, ব্রহ্মের মূর্তিগ্রহণ সম্বন্ধে রামমোহনের বক্তব্য—"ভট্টাচার্য যদি কহেন ব্রহ্ম বস্তুত অমূর্তি বটেন কিন্তু তাঁহার সর্বশক্তি আছে অতএব তেঁহ

আপনাকে সমূর্তি করিতে পারেন ইহার উত্তর এই জগতের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান বটেন কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূপের নাশ করিবার শক্তি নাই…। কিরূপে পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে ব্রহ্মস্বরূপে আঘাত করিতে উদ্যত হয়েন…।"

(ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার : রামমোহন-গ্রন্থাবলী : সা. প. সং)

দ্বিতীয়তঃ, রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার পুরুষদের সম্বন্ধে রামমোহনের বক্তব্য—"পরমেশ্বর কি রামকৃষ্ণ বিগ্রহে কি আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত শরীরে স্বকীয় মায়াদ্বারা প্রকাশ পাইতেছেন। অস্মদাদির শরীরে এবং রামকৃষ্ণ শরীরে ব্রহ্মস্বরূপের ন্যূনাধিক্য নাই কেবল অবিদ্যা আর বিদ্যামায়ার ভেদমাত্র, যেমন এক প্রদীপ সূক্ষ্ম আবরণেতে অর্থাৎ কাচাদি পাত্রে থাকিলে তাহার জ্যোতি বাহে প্রকাশ পায় সেইরূপ সূর্যাদি দেবতা ও রামকৃষ্ণাদিশরীরে ব্রহ্ম প্রকাশ পান আর সেই দীপ যখন স্থূল আবরণ যেমন ঘটাদি তাহার মধ্যে থাকিলে তাহার জ্যোতি বাহে প্রকাশ পায় না সেইরূপ অস্মদাদির শরীরে অপ্রকটরূপে থাকেন অতএব আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত ব্রহ্মসত্তার তারতম্য নাই।" (তদেব : পৃঃ ১৭৯)

তৃতীয়তঃ, মন্দির মসজিদে উপাসনা ও প্রতিমাপূজাপ্রসঙ্গে রামমোহনের যুক্তি—"মসজিদ গিরজাতে ঈশ্বরের উপাসনা আর স্বর্ণমৃত্তিকাদি প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা এই দুইয়ের সাদৃশ্য যে ভট্টাচার্য দিয়াছেন সে অত্যন্ত অযুক্ত; যেহেতু মসজিদ গিরজাতে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা ঐ মসজিদ গিরজাকে ঈশ্বর কহেন না। কিন্তু স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা উহাকে ঈশ্বর কহেন…।" ব্রহ্মের নিত্য ও লীলা—এ দুটি ভাগকে রামমোহন স্বীকৃতি দেননি বলেই ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ—এমন কোনো সিদ্ধান্ত তাঁকে করতে হয়নি। প্রতিমাপূজা বা অবতারবাদ অপেক্ষা ব্রহ্মোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন বলে অধিকারীভেদের কথা মেনে নিয়েও তিনি এক ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্তনেরই পক্ষপাতী। সগুণ ব্রহ্মোপাসনায় তাঁর আপত্তি নেই, আপত্তি সাকার উপাসনায়। এ বিষয়ে রামকৃষ্ণদেবের অনুভূতিলব্ধ এবং শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত আগেই আমরা জেনেছি।

রামমোহন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপন উপলব্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে আরো ব্যাপক এবং গভীরতম সত্যে, সাধনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেই সিদ্ধান্তকেই বহুদূর অগ্রসর করেছেন। রামমোহনের বুদ্ধিগত মতবাদ ভারতবর্ষের যুগযুগান্তের পূজা, উৎসব, শিল্প, পুরাণ-সাহিত্য, বিচিত্র সংস্কৃতির সহাবস্থান—এসব কিছুকেই নাকচ করতে চেয়েছিল। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা ছাড়া আর সবই যে দুর্বলতর অধিকারীর জন্য উপাসনাপদ্ধতি—একথা মানলে রামানুজ, মধ্ব, শ্রীচৈতন্য, মীরাবাই, রামপ্রসাদ প্রভৃতির ভাবাদর্শ ও সাধনপদ্ধতি সব কিছুই নিম্নপর্যায়ে পড়ে যায়। যতটা উচ্চস্তরে উঠলে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের সাধনা হিসাবে বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতবাদকে দেখা যায়, রামমোহনের সিদ্ধান্তও অতটা কেবলা-দ্বৈতবাদী নয়, তিনিও মূলতঃ সগুণ ব্রহ্মোপাসক। তাঁর চিন্তাধারার এই বৈশিষ্ট্যই পরবর্তী কালে ব্রাহ্মসমাজে ভক্তিবাদী ভাবধারার প্রাধান্যলাভের সুযোগ করে দেয়। দেবেন্দ্রনাথ স্পষ্টতঃই অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্ত বর্জন* করে ভক্ত ও ভগবানের, পিতা ও পুত্রের বা দুই সখার আদর্শকে ব্রাহ্মসমাজে প্রচলন করেন। দেবেন্দ্র-নাথের সগুণ ব্রহ্মের প্রতি এই ভক্তির ধারা কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি পরবর্তী ব্রাহ্ম-নেতাদের ভক্তিসাধনায় পথনির্দেশক।

দেবেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত—'ঈশ্বরের সঙ্গে উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ, এইটি ব্রাহ্মধর্মের প্রাণ।'* এই সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ার ফলে দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব মনোভঙ্গী ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি রামমোহনের মতো শাণিত যুক্তিনির্ভর না হয়ে অন্তরের ধ্যানে ও প্রেমে এত কবিত্বসৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-সাহিত্যে তার বহুবিস্তৃত প্রকাশ। দেবেন্দ্রনাথের রচনাবলী থেকে তাঁর ঈশ্বর-তন্ময়তার বৈশিষ্ট্য আমরা কিছু পরিমাণে মনে রাখতে পারি।

"আমি যখন পূর্বে দেখিতাম যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিতরে লোকেরা কৃত্রিম

---

* দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী': দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। এ বইয়ের 'শ্রীরামকৃষ্ণমনীষা ও বাংলাসাহিত্য' প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। এছাড়া লেখকের "উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য" গ্রন্থে "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : সার্ধশতাব্দীর আলোকে" প্রবন্ধও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

পরিমিত দেবতার উপাসনা করিতেছে, আমি মনে করিতাম, কবে এই জগন্মন্দিরে আমার অনন্ত দেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিব। এই স্পৃহা তখন আমার মনে অহোরাত্র জ্বলিতেছিল।...এখন আকাশে সেই তেজোময়, অমৃতময় পুরুষকে দেখিয়া আমার সমুদায় কামনা পরিতৃপ্ত হইল, এবং আমার সকল যন্ত্রণা দূর হইল।

"আমি এতটা পাইয়া তৃপ্ত হইলাম, কিন্তু তিনি এতটুকু দিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। এত দিন তিনি বাহিরে ছিলেন, এখন তিনি আমাকে অন্তরে দর্শন দিলেন, তাঁহাকে আমরা অন্তরে দেখিলাম। জগন্মন্দিরের দেবতা এখন আমার হৃদয়-মন্দিরের দেবতা হইলেন। এবং সেখান হইতে নিঃশব্দ গম্ভীর ধর্মোপদেশ শুনিতে লাগিলাম।......

"...এখন প্রেম-রবির অভ্যুদয়ে আমার হৃদয়ে জীবন সঞ্চার হইল, আমার চিরনিদ্রা ভঙ্গ হইল, বিপদ-অন্ধকার চলিয়া গেল। ঈশ্বরকে পাইয়া জীবন-স্রোত বেগে চলিল, প্রাণ বল পাইল।...জানিলাম তিনি আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়-সখা, তিনি ভিন্ন আমার এক নিমেষও চলে না।"

(আত্মজীবনী : দ্বাদশ পরিচ্ছেদ)

উপরে উদ্ধৃত বাণীরূপটুকু দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম উপলব্ধির উন্মেষপর্বে সাধকহৃদয়ের প্রতিচ্ছবিরূপে যেমন বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য, এর সাহিত্যগত উৎকর্ষও তেমনি শ্রেষ্ঠ মানদণ্ডে বিচারের যোগ্য। ঈশ্বরাবির্ভাবের অরুণাভাস বাংলা গদ্যে কী ধ্বনিপ্রবাহ সৃষ্টি করেছে, তার সার্থক উদাহরণের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় এমন আরো অনেক দৃষ্টান্তই মেলে। হিমালয়ের পথে পথে একাকী ঈশ্বরনির্ভর হয়ে পরিভ্রমণের সময় তাঁর আর একদিনের অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা মনে করা যায়। সেদিন অন্যমনে দেবেন্দ্রনাথ বৈকালিক পথ-পরিক্রমায় বেরিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন—"আমি দেখি যে, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, সূর্য অস্ত গিয়াছে ; আমার তো আবার এতটা পথ ফিরিয়া যাইতে হইবে ; আমি দ্রুতবেগে ফিরিলাম। রাত্রিও দ্রুতবেগে আসিয়া আমাকে ধরিল : গিরি, বন, কানন সকলই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেই অন্ধকারের দীপ হইয়া অর্দ্ধচন্দ্র আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। কোনো দিকে কোনো সাড়াশব্দ নাই, কেবল পায়ের শব্দ পথের শুষ্ক পত্রের উপরে খড়্ খড়্ করিতেছে। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে কী এক গম্ভীর ভাব হইল।

রোমাঞ্চিত শরীরে সেই বনের মধ্যে ঈশ্বরের চক্ষু দেখিলাম—আমার উপরে তাঁহার অনিমেষ দৃষ্টি রহিয়াছে। সেই চক্ষুই সেই সঙ্কটে আমার নেতা হইল। নানা ভয়ের মধ্যে নির্ভীক হইয়া…বাসাতে পঁহুছিলাম। তাঁহার এই দৃষ্টি চিরকালের জন্য আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।"

(আত্মজীবনী : সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ)

'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও বাণীভঙ্গিমার অন্যতম উদাহরণ। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের sermon বা প্রার্থনাস্তিক ভাষণের অনুসরণে দেখা দিলেও দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রীর এ জাতীয় ভাষণমালা বাংলা ধর্মীয় সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য রচনা। বিশেষতঃ দেবেন্দ্রনাথের ভাষণগুলি সমকালীন বাংলা গদ্যের বিচারেও বিস্ময়কর রচনা। সেকালে লিখিত ভাষণ দেওয়াই পদ্ধতি ছিল। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী অবশ্য বার্ধক্যের অসুবিধার জন্য পুত্র রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুলিখিত। দেবেন্দ্রনাথের এ জাতীয় ভাষণের অংশবিশেষ—"এই প্রাতঃকালে এই সুবর্ণময় সূর্য-কিরণের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছি; এই সূর্য-কিরণের ন্যায় ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া তাঁহার কার্যে অনুরক্ত থাক। এই সময়ে আমাদের মনে বিচিত্র-ভাবের আবির্ভাব হইতেছে, কিন্তু তথাপি আমরা দিবস ভুলিয়া যাইতেছি না। এই প্রকার আমাদের সমুদয় কার্যের মধ্যে ঈশ্বরের আভা যেন সর্বদাই প্রকাশিত থাকে। যাহারা আপনাকে লইয়া ব্যস্ত, এই সমগ্র বিশ্বসংসার তাহাদের আমোদের স্থল, তাহাদের ক্রীড়ার আলয়। কিন্তু যাহারা ঈশ্বরের প্রেমে প্রেমী, এই জগৎ-সংসার তাহাদের নিকট পবিত্র দেবমন্দির। ইহার সত্তাতে তাহারা এক মহত্তর উচ্চতর সত্তা দেখিতে পায়; তাঁহাব জ্ঞান, তাঁহার মঙ্গলজ্যোতিতে ইহাকে পবিত্র দেখে।" ('ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' : ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৮২ শকাব্দ)

প্রকৃতি, ঈশ্বর ও মানবসংসারে মিলে দেবেন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্মচেতনাই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্যাপ্ত পরমসত্যের অনুভব। এক্ষেত্রে রামমোহন-অনুগামী হলেও দেবেন্দ্রনাথের কবিহৃদয়ের স্বাতন্ত্র্য যেমন লক্ষণীয়, তেমনি সংসার ও ব্রহ্মের যোগ সম্বন্ধে রামমোহনের ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ অনুসরণের দিকটিও তাৎপর্যপূর্ণ।

পরমজ্ঞানলাভের জন্য সর্বস্বত্যাগ বা কামিনীকাঞ্চনত্যাগের আদর্শের কথা রামমোহনও জোর দিয়ে বলতে পারেন নি; দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখেরাও বলেন নি

অথচ এঁদের ঈশ্বরপরায়ণতাও বহিরঙ্গ ভানমাত্র নয়, জীবনের মূল প্রেরণা থেকেই তাঁদের পরমের অনুসন্ধান। তবু মনে হয়, জগতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের সঙ্গে তুলনা করলে সংসার ও ভগবান—দুকূল রক্ষার প্রচেষ্টা খুব সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। বিশেষতঃ রামমোহনের মতো বেদান্তবাদীর পক্ষে আরো নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে—'বিষয়বুদ্ধির লেশ থাকলে হবে না'—ব্রহ্মজ্ঞান সেক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাতের বিবরণ 'কথামৃতে'র প্রথম খণ্ডে যেভাবে বিধৃত তার মধ্যে লক্ষণীয় একটি মন্তব্য—"দেখলাম, যোগ, ভোগ দুই-ই আছে; অনেক ছেলে পুলে, ছোট ছোট, ডাক্তার এসেছে; তবেই হ'লো, অত জ্ঞানী হয়ে সংসার নিয়ে সর্বদা থাকতে হয়। বললুম, তুমি কলির জনক। 'জনক এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি'।"

(কথামৃত : ১ম : ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪)

৫

সমগ্র ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিন্তাধারার ঐক্য ও অনৈক্য প্রসঙ্গে একথা সর্বাগ্রে স্মরণীয় যে, 'হিন্দু' বা 'সনাতন' ধর্মের যে বিভিন্ন ধারা যুগে যুগে দেখা দিয়েছে, ব্রাহ্মসমাজ তারই অন্যতম বিকাশ। কখনোই মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এমন কি কেশবচন্দ্র যখন বিবাহবিষয়ক সুবিধার জন্য নিজেকে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছেন না, তখনও সামাজিক বিশেষ একটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সব ব্যাপারেই তিনি বৃহত্তর হিন্দুধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত থেকে গেছেন। তাঁর শেষজীবনের 'নববিধান' প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং ইদানীংকালের ব্রহ্মজ্ঞানীদের উদ্দেশে রামকৃষ্ণদেবের নমস্কার স্বধর্মেরই আধুনিক রূপান্তরের উদ্দেশে নমস্কার। তাঁর বিপুল গভীর অধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় তিনি একথা বুঝেছিলেন যে এমন বহু মতবাদেরই উদ্ভব ও বিলয় ঘটবে, তবে মূল ধর্মচেতনাটি চিরন্তন। হিন্দুধর্ম তাই চিরপ্রসারণশীল।

দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ ব্রাহ্মসমাজের এই মূল বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলে সমগ্র বাঙালীসমাজের হিন্দু অংশের সঙ্গে তাঁদের বিরোধের কারণ কমে আসতে থাকে। অপরপক্ষে ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সামাজিক কারণকে অবলম্বন করে ক্রমবর্ধমান বিরোধ অবশেষে ব্রাহ্ম আন্দোলনকে একটি সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে নির্দিষ্ট করে দেয়। তবু একথা স্মরণীয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনা ও বাণীর গুণগ্রাহীরা ভারতবর্ষীয় (পরে নববিধান) এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেই বেশী ছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজে তাঁর প্রভাব ততটা ক্রিয়াশীল হয় নি।

বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখের মতো দেবেন্দ্রনাথ যেমন বাংলা গদ্যের গঠনপর্বে উল্লেখযোগ্য শিল্পী, তেমনি পরবর্তীকালে বঙ্কিমযুগের আর একজন বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী কেশবচন্দ্র। ইংরেজী ও বাংলা—এ দুই ভাষাতেই পারদর্শিতার ক্ষেত্রে রামমোহন ও বিবেকানন্দের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও রচনাবলীর সঙ্গে বিবেকানন্দের আকৈশোর পরিচয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের প্রত্যক্ষ আলাপপরিচয় শুরু হবার পরে কেশবেরই উৎসাহে তাঁর পত্র-পত্রিকায় এবং ক্রমে অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় রামকৃষ্ণদেবের কথা প্রচারিত হতে থাকে। সুতরাং ১৮৭৫-এর ১৫ই মার্চের পর থেকে কেশবচন্দ্র ধর্মপ্রসঙ্গে যা বলেছেন বা লিখেছেন তাতে ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণদেবের প্রভাব পড়তে থাকে, একথা অনুমান করা খুব ভুল নয়। কেশবের নিজস্ব ভাষাদর্শের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের মুখের কথায় আধ্যাত্মিক চেতনার পরমপ্রকাশে মিলে এক নতুন ভাব ও ভাষার সৃষ্টি হতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুগামীদের মধ্যে অনেকেই কেশবচন্দ্রের ভাষণে মুগ্ধ হয়ে পরে রামকৃষ্ণদেবের কাছে এসে কেশবের প্রেরণা-উৎসবের সন্ধান পেয়েছেন। আবার এমন অনেক লোকও ছিলেন, যাঁরা কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার দ্বারাই জীবনপথে পরিচালিত হয়েছেন—সেকালের ইয়ং বেঙ্গলদের সংখ্যাগরিষ্ঠ কেশবেরই অনুগামী।

বাইবেলের প্রতি কেশবচন্দ্রের বিশেষ অনুরক্তির কথা মনে রেখে আমরা সবার আগে কেশবচন্দ্রের 'খ্রীষ্টসমাগম' বক্তৃতাটি থেকে তাঁর রচনাভঙ্গীর উদাহরণ দিই—"ও ঈশা, তোমার চাঁদমুখ দেখলে কান্না পায়। তুমি রাজার পুত্র রাজবেশ পরিয়া বেড়াইবে। যেখানে যাইবে হাজার লোক সম্মান করিবে। দেখিতেছি তোমাকে কেহই গ্রাহ্য করে না। ধনী বিদ্বান কেহ আসেন না। জেলে ছুতর এদের হাতে শেষে পড়িলে কেন? তোমার বিদ্যা বা ধন নাই। তোমার মা তোমাকে ফকীর হইতে বলিয়াছেন। তুমি যদি শোক ঘাড়ে পেতে না নেবে

তবে মানুষ উদ্ধার হবে কিসে? তোমার গায়ে রাজার লক্ষণ কিছু নাই। ও সমস্ত মা কেড়ে নিয়ে বুঝি ফকীর করেছেন?......ও ঈশা, এ আবার কি রকম বৈরাগ্য? বৈরাগীরা তো সংসার ছাড়িয়া জঙ্গলে গিয়া বসিয়া থাকে। তোমার কাপড় যে ছেঁড়া তা নয়। এ ফকীরি ভস্ম মাখিয়া জঙ্গলে বাসের ফকীরি নয়, রাজার কাছেও যাইতেছ, প্রজার কাছেও যাইতেছ।...আপনি খাবে বিষ, আর পরকে দিবে মধু। আপনি এক কড়িও নেবে না। আর পরকে লক্ষ লক্ষ টাকা দেবে। আপনি মাথা রাখিবার স্থান চাইবে না, কিন্তু পরকে অট্টালিকা দেবে।" (খৃষ্টসমাগম)

দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় ও রচনায় হিমালয় ও তপোবনের স্মৃতিময় ঐতিহ্যের প্রভাব সম্বন্ধে অজস্র উদাহরণ মেলে। প্রাচীন ভারতীয় এই আদর্শের প্রতি কেশবচন্দ্রের অনুরাগের রূপায়ণ তাঁর 'ঋষিসমাগম' বক্তৃতাটিতে। 'হিমালয়েব গাত্রোত্থান' নামে তাঁর আর একটি রচনার অংশবিশেষ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"হে হিমালয়, তুমি কথা কও, যেমন তুমি চারি হাজার বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কথা কহিয়াছ, আমাদের সঙ্গে সেইরূপ জীবন্তভাবে কথা কও। তুমি আমাদের মুনি ঋষিদের বাসস্থান, তুমি এ দেশীয় ভক্তদিগের সাধনের স্থান, আমরা তোমাকে আদর করিব, তোমার প্রশংসা করিব এবং তোমার নিকট যোগধর্ম শিক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইব। তোমার কথা সমস্ত ভারত গ্রহণ করিবে। কেন-না তুমি আমাদের সকলেরই।" (২৭শে জুন, ১৮৮০)

'জীবনবেদে'র বক্তৃতামালায় কেশবচন্দ্র তাঁর জীবনে ঈশ্বরের মাতৃরূপের আবির্ভাব-কথা বলেছেন, বলা বাহুল্য সেই আনন্দময়ীর বার্তাবহ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। "হে ঈশ্বর, রক্ষা কর, রক্ষা কর; হে ভগবান বাঁচাও" এই বলিয়া দিন যাইতেছে; শীঘ্র ভক্তির পথ আন, এ কথা তো কেহই বলিলেন না। কেবল একজন বলিলেন, যাঁর বলিবার তিনি বলিলেন। সাহারার মধ্যে কমল ফুটিল। পাথরের উপর প্রেমফুল প্রস্ফুটিত হইল।...কে কে আমার আনন্দময়ী মাকে দেখিয়াছেন? যিনি দেখিয়াছেন তাঁকে আমার সখা বলি, আলিঙ্গন করি, তিনি আমার বন্ধু হন; তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

(জীবনবেদ : ৭ম সংস্করণ : পৃ : ৬২-৬৩)

মঙ্গলকাব্য ও শাক্তপদাবলীর দেশ এই বঙ্গভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগে থেকেই মাতৃনামের মহিমা উচ্চারিত হলেও মাতৃভাবের যে বিপুল ভাববন্যা তাঁর

ব্যক্তিত্বে রূপায়িত তার সঙ্গে একমাত্র চৈতন্যদেবের মধুর ভাবসাধনারই তুলনা চলে। সুতরাং যাঁরা মনে করেন কেশবচন্দ্রের মাতৃভাবে ব্রহ্মচিন্তায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাবই বিশেষভাবে কার্যকর, তাঁরা ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক, দুদিক থেকেই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত। সাহিত্যের দিক থেকে সে প্রভাবের আর একটি মাধুর্যমণ্ডিত নিদর্শন—"যদি শক্তিমূর্তি—কালীমূর্তির পূজা করিবে প্রজ্ঞাবলে হৃদয়-কপাট উন্মুক্ত কর, এবং আপনার জীবনী-শক্তিমধ্যে তাঁহাকে দর্শন কর। সেই শক্তির অন্তর্ধানে তোমার শরীরের নিপাত। মহাশক্তি তিরোভাবে জীবের নিশ্চিত প্রলয়। সেই শক্তি ভিন্ন কিছুই জন্মে না, কিছুই স্থিতি করিতে পারে না। এই যে প্রকাণ্ড সমুদ্রের ন্যায় মহাকালী বাস করিতেছেন, ঐ সমুদ্রের কিছুমাত্র আমাদের সমস্ত শক্তির আধার। আমার দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি সমস্ত শক্তি ঐ কণামাত্র শক্তিকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মতেজ মনুষ্যের শরীর-মনকে তেজ দিতেছে। অনন্ত ঘোরতরা কালীশক্তি, বিবিধশক্তি মহাকালীর হস্তে অহঙ্কারী মানুষের মুণ্ড ঘুরিতেছে। সেই ভয়ঙ্করা বিশ্বজননীর কাছে ভ্রুকুটি করিও না। হে মানব, শক্তির কাছে তোমার তেজ খাটিবে না, সেই দর্পহারিণীর নিকটে তোমার সমুদয় অহঙ্কার চূর্ণ হইবে, কেন না তোমার সমস্ত শক্তি তাঁহার আশ্রিত বলিয়া তোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার পদানত হইবে।" (আদ্যাশক্তি : ১লা আগস্ট, ১৮৮০)

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় যে ব্যক্তিত্বের যাদু ছিল, তা এই সব লেখায় কিছুটা ধরা পড়ে। বাংলায় তাঁর অধিকাংশ লেখাতেই কথোপকথনের ভঙ্গীটি সঞ্চারিত। তবে রামমোহনের যুক্তিবাদী ঋজুতা, অথবা দেবেন্দ্রনাথের তন্ময় কবিধর্মের তুলনায় কেশবচন্দ্রের ভঙ্গী অনেকটা স্বগতোক্তির মতো। ইংরেজী বাইবেলের ভাষাসারল্য এ বিষয়ে তাঁর কিছুটা পথপ্রদর্শক। তাঁর নিজস্ব অন্তর্মুখী স্বভাবই এর মূলে। সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। কেশব-অনুচর ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালের সাক্ষ্য অনুযায়ী—"উভয়ের যোগে (এক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ) ধর্মজগৎ অনেক বিষয়ে উপকৃত হইয়াছে, হিন্দুধর্মের শাখাপ্রশাখার মধ্যে যে সকল আধ্যাত্মিক মধুরভাব আছে তাহা বিধান-বিশ্বাসীদিগের দ্বারা (নববিধান-অনুগামীদের দ্বারা) ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যে ধর্ম এক সময় নিতান্ত কঠোর নীরস ছিল, এইরূপে তাহা সরস এবং অত্যন্ত সরল হইল। কোথায় বৈদান্তিক

জ্ঞানবিচার, আর কোথায় মাতার সহিত শিশুর কথোপকথন। আরাধনা প্রার্থনায় গ্রাম্য কথার প্রচলন এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে।" (কেশব চরিত : চিরঞ্জীব শর্মা। চিহ্নিত অংশগুলি বর্তমান লেখকপ্রদত্ত।)

ঐতিহাসিক দিক থেকে ব্রাহ্মভাবধারার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবধারার সম্মেলনের সাক্ষ্যরূপে ত্রৈলোক্যনাথের মন্তব্যটি বিশেষ মূল্যবান। অবশ্য অন্য-জাতীয় যুক্তিও সেকালে বা একালে অনেক পাওয়া যায়। সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে মনে হয় বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাবের সূচনা কেশবচন্দ্রের রচনাবলীতেই সর্বপ্রথম লক্ষণীয়। তাছাড়া কেশবানুচর গিরিশচন্দ্র সেন, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের কথাও এ প্রসঙ্গে ভেবে দেখা যায়। প্রতাপচন্দ্রের রামকৃষ্ণদেবপ্রসঙ্গে অমর রচনাটি তো বহুখ্যাত। ত্রৈলোক্যনাথ বা চিরঞ্জীব শর্মার ব্রহ্মসঙ্গীত বাংলা সঙ্গীত-সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। এই গানগুলির কথারূপে অনেক ক্ষেত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন, আদর্শ, ও ভাবধারার প্রভাব ওতপ্রোত। দুটি গান আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবলোকের প্রভাবজাত সৃষ্টিরূপে এখানে স্মরণ করি—

চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় রে।
(জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় দয়াময়!)
উথলিল প্রেমসিন্ধু, কি আনন্দময়, (আহা)
চারিদিকে ঝলমল, করে ভক্তগ্রহদল,
ভক্তসঙ্গে ভক্তসখা, লীলারসময়। (হরি)
স্বর্গের দুয়ার খুলি, আনন্দলহরী তুলি, নববিধান বসন্ত-সমীরণ বয়;
(কিবা) ছুটে তাহে মন্দ মন্দ, লীলারস প্রেমগন্ধ,
ঘ্রাণে যোগিবৃন্দ যোগানন্দে মত্ত হয়।
ভবসিন্ধুজলে, বিধানকমলে, আনন্দময়ী বিরাজে;
আবেশে আকুল, ভক্ত-অলিকুল, পিয়ে সুধা তার মাঝে।
দেখ দেখ মায়ের প্রসন্ন বদন, ভুবনমোহন চিত্তবিনোদন,
পদতলে দলে দলে সাধুগণ, নাচে প্রেমে হইয়ে মগন।
কিবা অপরূপ আহা মরি মরি, জুড়াইব প্রাণ দরশন করি,
প্রেমদাসে বলে সবে পায়ে ধরি, গাও ভাই মায়ের জয়॥

এ গানটি শুনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মনে হতো যেন তাঁর হৃদয়াকাশ জুড়ে পূর্ণচন্দ্র উঠেছে। ত্রৈলোক্যনাথের আর একটি গানের গভীর অর্থ তাঁকে মুগ্ধ করতো—

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি গুহাবাসী॥
অনন্ত আঁধার কোলে মহানির্বাণহিল্লোলে।
চিবশান্তি পরিমল অবিরল যায় ভাসি॥
মহাকালরূপ ধরি আঁধাব বসন পরি
সমাধি-মন্দিরে ওমা কে গো তুমি একা বসি॥
অভয় পদ-কমলে প্রেমের বিজলী খেলে।
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি॥

কথামৃতের বর্ণনায়—"নরেন্দ্র যাই গাইলেন, 'সমাধিমন্দিরে ও মা কে তুমি গো একা বসি!' অমনি ঠাকুর বাহ্যশূন্য সমাধিস্থ।"

(কথামৃত : ৫ম : ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৫)

কেশবচন্দ্রের পবিণতজীবনের সাধনায় ব্রাহ্ম-হিন্দুর বহিরঙ্গ ভেদ মুছে গিয়ে সাধনার ও উপলব্ধির উদারতা কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল, তার অন্যতম প্রমাণ ত্রৈলোক্যনাথের অমর সঙ্গীতসৃষ্টি। আবার এসব গানের পটভূমিতে একথাও বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে শ্রীরামকৃষ্ণ-কেশবচন্দ্রের যোগাযোগ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আবহমান হিন্দুসাধনার ধারাকে সংযুক্ত করে দিয়েছিল। ফলে একদিকে কেশবেব বংশগত বৈষ্ণব ঐতিহ্য, রামমোহনের তুলনামূলক ধর্মচর্চা, দেবেন্দ্রনাথের ভক্তি আন্দোলন এবং অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের বৈষ্ণব, শাক্ত ও অন্যান্য সব ধর্মসমন্বয়ের সাধনার ঐতিহ্য—এ সব কিছুর মিলনে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের সমন্বয়চেতনার প্রকাশ ত্রৈলোক্যনাথের ও আরো অন্যান্য ব্রাহ্ম কবিদের সংগীতরচনা। এরই মধ্যে আমরা মনে রাখতে পারি কেনোপনিষদে উমা হৈমবতীর আবির্ভাব সম্বন্ধে রামমোহনের ব্যাখ্যা, নির্জন হিমালয়েব পথে দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বরের অনিমেষ চক্ষু দর্শন, কেশবচন্দ্রের আদ্যাশক্তিরূপে ব্রহ্মের বর্ণনা। সাকার-নিরাকারের বহিরঙ্গদ্বন্দ্ব কখন আপনি সমাধানের পথে পরিচালিত। তাই ত্রৈলোক্যনাথের গানে সমাধিমন্দিরে মাতৃরূপিণী একা বসে আছেন। তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের কালী। সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যাননেত্রে কালীর আবির্ভাব।

কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র দু'জনেই শ্রীরামকৃষ্ণের অনুজ। তবু প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের দিক থেকে এঁরা যখন বাংলার বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সাধনসমাপনান্তে ধীরে ধীরে কলকাতার মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করেছেন মাত্র। কিন্তু অধ্যাত্মসাধনার সমুচ্চ মানদণ্ডে কেশবচন্দ্রই সমকালীনদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণমহিমার অনেকটা আভাস পেয়েছিলেন —তরুণতর নরেন্দ্রনাথ বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখেরা ইতিহাসের দিক থেকে স্বভাবতঃই পরবর্তীকালের।

বঙ্কিমের সহপাঠী কেশবচন্দ্র কলেজ ছাড়ার অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতার তরুণ ও শিক্ষিতসমাজে পরিচিত হ'ন এবং তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতায় সমগ্র দেশেই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। সেকালে বঙ্কিমের কর্মচারীদের একজন সাক্ষ্য দিয়েছেন—"আমি যখন বারুইপুরে অল্পদিন মাত্র বঙ্কিমবাবুর অধীনে আছি, যখন তাঁহার যশোসূর্যের অরুণোদয়ের লেশমাত্র পরিদৃশ্যমান হয় নাই, সেই সময় কলিকাতার কোন স্থলে একদিন কেশববাবুর সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর সাক্ষাৎ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন—'I wish to know how far you have outgone me'.* এ কথা কেশববাবুর নিজের মুখে শুনিয়াছি।" (কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : পৃঃ ১০৫ : 'প্রদীপ' ; ১৩০৫ : থেকে কালীনাথ দত্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধের অংশ)

কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও বক্তৃতার অনুরাগীদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতম। সহপাঠীর প্রতি মাৎসর্যহীন শ্রদ্ধার যে সাক্ষ্য তিনি 'ধর্মতত্ত্বে' রেখেছেন, তার সঙ্গে মধুসূদনের উদার বন্ধুবাৎসল্যের তুলনা চলে, তবে এ শ্রদ্ধা গভীরতর। 'ধর্মতত্ত্বে' আদর্শ মনুষ্যত্বের সন্ধানী বঙ্কিম গুরু-শিষ্যের কথোপকথনে লিখেছেন—

"গুরু।…যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব ; যিনি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত, অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক তাঁহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব।"

'আমি জানতে চাই, তুমি আমাকে কতটা ছাড়িয়ে গেছ।'

শিষ্য। অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মণ শিষ্য ; ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন ?

গুরু। কেন করিব না ? ঐ মহাত্মা সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণসকলে ভূষিত ছিলেন। তিনিও সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র।" (ধর্মতত্ত্ব : বঙ্কিম রচনাবলী : দ্বিতীয় খণ্ড : সাহিত্যসংসদ সং : পৃঃ ৬১৮)

তবু কেশবচন্দ্র পরবর্তী হিন্দু চিন্তাধারার নব-আন্দোলনের সঙ্গে বঙ্কিমের মতো যুক্ত ন'ন। সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে এই হিন্দু চিন্তাধারা ক্রমে জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' বা 'দেবী চৌধুরাণী'তে স্বদেশপ্রেম ও আদর্শ মনুষ্যত্বের সন্ধান তাঁর পরিণত জীবনদৃষ্টির পরিচায়ক। সে জীবনদৃষ্টির অন্তরালে বঙ্কিমচন্দ্রের সত্যসন্ধানী মনন কীভাবে পথসন্ধান করে ফিরেছিল 'ধর্মতত্ত্বে' 'গুরুর' বক্তব্যে তার সন্ধান মেলে—"অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, "এ জীবন লইয়া কি করিব ?" "লইয়া কি করিতে হয় ?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোকপ্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী-বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।" (তদেব : পৃঃ ৬২২)

এ অনুসন্ধানের সঙ্গে বিবেকানন্দের 'সখার প্রতি' কবিতার আশ্চর্য সুর-সঙ্গতি পাঠকের মনে জাগতে পারে—

বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মতো, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায় ;
ধর্ম তরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়,
নদীতীর পর্বতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কত কাল যায়।
অসহায় ছিন্নবাস ধ'রে দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জন ?

শোন বলি, মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার—
মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম ; 'প্রেম' 'প্রেম' এইমাত্র ধন।

(বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড)

বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহকেন্দ্রিক বুদ্ধিনির্ভর জীবনজিজ্ঞাসা বিবেকানন্দের অনিকেত সাধন মনন উপলব্ধির বিপুল বিস্তারের তুলনায় সীমাবদ্ধ হলেও পরমসত্যের আভাসে বঙ্কিমচন্দ্রও যে কিছুটা আলোকিত হয়েছিলেন, সেইটিই আমাদের লক্ষণীয়। 'আনন্দমঠে'র সূচনায় তাই জীবন তুচ্ছ, ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত ও বঙ্কিমবন্ধু অধর সেনের বাড়িতে রামকৃষ্ণদেব ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪ তারিখে একবার এসেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি এ বাড়িতে এসেছেন, কিন্তু এই তারিখটি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাতের দিনটির (৫ই আগস্ট, ১৮৮২) গুরুত্ব মনে করিয়ে দেয়। বিদ্যাসাগরের মতোই বঙ্কিমও এখানে মূলতঃ শ্রোতা, তবে বিদ্যাসাগরের মহিমার তুলনায় কিছুটা নিষ্প্রভ। এ সাক্ষাৎকারের কয়েকদিন পরে ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৪ তারিখে শ্রীম—বা মাষ্টার মশাই দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে 'দেবী চৌধুরাণী'র অংশবিশেষ স্থানে স্থানে পড়ে শুনিয়েছিলেন। (কথামৃত : ২য় ভাগ)

'দেবী চৌধুরাণী'তে বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বের রূপায়ণপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতামত উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলনের পটভূমিকায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় নেতৃত্বের অনুসন্ধানী বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন, এই কৃষ্ণচরিত্রের আলোকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলার সমাজজীবন ও ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পটভূমিতে স্থাপন করলেন 'দেবী চৌধুরাণী'কে। আদর্শ নায়কের এই আদর্শ নায়িকায় রূপান্তর সাহিত্যের জগতে কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা। তবে মঙ্গলকাব্যের দেশ বাংলায় মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশরূপে নারী-চরিত্রকল্পনা অনেক পরিমাণেই মনস্তত্ত্বসম্মত।

'কথামৃতে' প্রফুল্লের ভবানীঠাকুরের কাছে সাধনার বিবরণ শুনে, বিশেষভাবে তার বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন শুনে রামকৃষ্ণদেবের মন্তব্য তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমের চিন্তাধারার পার্থক্যটি স্পষ্ট করে তোলে। 'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রফুল্লের বিদ্যাশিক্ষার

আরম্ভ—ব্যাকরণ পড়া হল, রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা। একটু সাংখ্য, একটু বেদান্ত, একটু ন্যায়।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—এর মানে কি জ্ঞান? না পড়লে শুনলে জ্ঞান হয় না। যে লিখেছে, এ সব লোকের এই মত। এরা ভাবে, আগে লেখাপড়া, তারপর ঈশ্বর; ঈশ্বরকে জানতে হলে লেখাপড়া চাই। কিন্তু যদু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ করতে হয় তাহলে তার ক'খানা বাড়ী, কত টাকা, কত কোম্পানীর কাগজ, এসব আগে আমার অত খবরে কাজ কি? যো সো করে—স্তব করেই হোক, দ্বারবানের ধাক্কা খেয়েই হোক, কোন মতে বাড়ীর ভিতর ঢুকে যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে হয়। আর যদি টাকাকড়ি ঐশ্বর্যের খবর জানতে ইচ্ছা হয়, তখন যদু মল্লিককে জিজ্ঞাসা করলেই হয়ে যাবে।...আগে রাম, তারপর রামের ঐশ্বর্য জগৎ।"

রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্র—দু'জনেরই চিন্তাধারায় সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের প্রসঙ্গে ধর্মজিজ্ঞাসা জেগেছে। সেদিক থেকে রামকৃষ্ণদেবের সিদ্ধান্ত প্রথমে পরমসত্য লাভ, তারপরে মানবকল্যাণের সাধনা। নিষ্কাম কর্মে প্রফুল্লের আত্ম-নিয়োগ-প্রসঙ্গে ভবানীঠাকুর যেখানে শ্রীকৃষ্ণে কর্মফল সমর্পণের কথা বলছেন, সেই অংশ-প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেব মনে করিয়ে দিয়েছেন,—"এ বেশ। গীতার কথা। কাটবার যো নাই। তবে আর একটি কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণে ফল সমর্পণ বলেছে; শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি বলে নাই।" অবশ্য বঙ্কিম শেষ অবধি ভক্তিতেই মানবজীবনের সার্থকতা অনুভব করেছেন। একটু অন্য ভাবে বললেও প্রফুল্ল বুঝেছিল—"মেয়েমানুষের ভক্তির কি শেষ আছে?" কিন্তু এ ভক্তি মূলতঃ ভালোবাসা—তার কাছে স্বামী ব্রজেশ্বরকে ছাড়িয়ে বৃন্দাবনেশ্বর কখনো বড়ো হতে পারে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' আসলে এক দাম্পত্য প্রেমের কাহিনী, এ কাহিনীর অধ্যাত্মভূমিকা আরোপিত, প্রাণ থেকে উৎসারিত নয়।

আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার সীমাবদ্ধতা সবচেয়ে বেশী প্রকাশিত অর্থের ব্যাপারে প্রফুল্লকে ভবানীঠাকুরের উপদেশদানে। প্রসঙ্গটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শের আলোকে কীভাবে প্রতিভাত হয়েছিল, তা লক্ষণীয়—"প্রফুল্ল—যখন আমার সকল কর্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম তখন আমার এ ধনও শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম।

ভবানী—সব?

প্রফুল্ল—সব।

ভবানী—ঠিক তাহা হইলে কর্ম অনাসক্ত হইবে না। আপনার আহারের জন্যও যদি তোমাকে চেষ্টিত হইতে হয়, তাহা হইলে আসক্তি জন্মিবে। অতএব তোমাকে হয় ভিক্ষাবৃত্ত হইতে হইবে, নয় এই ধন হইতেই দেহরক্ষা করিতে হইবে। ভিক্ষাতে আসক্তি আছে। অতএব এই ধন হইতে আপনার দেহরক্ষা করিবে।"

আর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে ও বাণীতে কাঞ্চনসংস্পর্শ পর্যন্ত পরিহার্য। যুগ যুগ ধরে ভারতের সর্বত্যাগী সাধক ও যোগীরা এই নিষ্কিঞ্চনতার সাধনা করে এসেছেন। অন্নবস্ত্রের সব সুযোগ নিয়ে ঈশ্বরকে ডাকার মতো সুবিধাবাদ তাঁদের ছিল না। তাই পাঠক মাস্টারমশাই যখন ভবানীঠাকুরের এ যুক্তিকে পাটোয়ারী বলে সহাস্য মন্তব্য করলেন, তখন তাঁকে সমর্থন করে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন--"হাঁ, ওইটুকু পাটোয়ারী, ঐটুকু হিসাববুদ্ধি। যে ভগবানকে চায়, সে একেবারে ঝাঁপ দেয়। দেহরক্ষার জন্য এটুকু থাকলো, এ সব হিসাব আসে না।"

বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে পাশ্চাত্য উপযোগিতাবাদের প্রভাব, তার ফলেই যথার্থ সন্ন্যাসীর সম্পূর্ণ কাঞ্চনত্যাগ তাঁর কাছে বাস্তব হতে পারে না, এমন কি অবতারকল্প দেবী চৌধুরাণীর কাছেও নয়। সুতরাং সর্বভূতে ধনদানের কথা প্রফুল্লের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়ে কারণ হিসাবে সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থানের কথা বলা হলো। ভবানীঠাকুরের মুখে 'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র' ইত্যাদি গীতার শ্লোক উচ্চারিত হলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই শ্লোকের লক্ষণগুলি উত্তম ভক্তের বলে চিহ্নিত করলেন। কিন্তু তারপরেই ত্যাগের আদর্শ সম্বন্ধে ধারণার অভাবে বঙ্কিমের ভবানীঠাকুর বলে বসলেন—'কখন কখন কিছু দোকানদারী চাই।' বলাবাহুল্য, সর্বভূতে ধনবিতরণের জন্যই প্রফুল্লর 'দেবী চৌধুরাণী'র সাজসজ্জার বা দোকানদারীর দরকার। একথা শুনে তীব্র বিরক্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, 'দোকানদারী চাই, যেমন আকর তেমনি কথাও বেরোয়। রাতদিন বিষয়চিন্তা, লোকের সঙ্গে কপটতা এসব করে করে কথাগুলোও এইরকম হয়ে যায়।...দোকানদারী কথাটা না বলে ঐটে ভাল করে বললেই হতো, 'আপনাকে অকর্তা জেনে কর্তার ন্যায় কাজ করা।"

দেবী চৌধুরাণীর মুখে ঈশ্বরপ্রসঙ্গে যেখানে রয়েছে—"ঈশ্বর মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়"—সেই অংশটি শুনে রামকৃষ্ণদেবের মন্তব্য—"মনের প্রত্যক্ষ। সে এ

মনের নয়। সে শুদ্ধ মনের। এ মন থাকে না। বিষয়াসক্তি একটুও থাকলে হয় না। মন যখন শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ মনও বলতে পার, শুদ্ধ আত্মাও বলতে পার।" তখন মাষ্টারমশাই দেবী চৌধুরাণীর ধর্মপ্রসঙ্গ থেকে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগের কথা বললেন। "এই যোগ-দূরবীন দিয়ে ঈশ্বরকে দেখা যায়।" শ্রীরামকৃষ্ণ এ মন্তব্য সমর্থন করলেন, কারণ, গীতার সঙ্গে মেলে।

স্বামীর সঙ্গে দেখা হলে পর দেবী চৌধুরাণী যখন বলছেন, "তুমি আমার দেবতা। আমি অন্য দেবতার অর্চনা করতে শিখিতেছিলাম, শিখিতে পারি নাই। তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ।"—সে কথা শুনে রামকৃষ্ণদেব সহাস্যে বললেন—"'শিখিতে পারি নাই'। এর নাম পতিব্রতার ধর্ম। এও আছে।···এ একরকম মন্দ নয়, পতিব্রতাধর্ম। প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না? তিনিই মানুষ হয়ে সব লীলা করছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণায় আদর্শ মনুষ্যত্বই অবতার-লক্ষণ। দেবী চৌধুরাণীর মধ্যে তিনি সেই আদর্শ রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। এমন কি উপন্যাসের শেষে গীতার 'সম্ভবামি যুগে যুগে' এই বাণী উদ্ধৃত করে 'কৃষ্ণচরিত্রে'র গ্রন্থাকারে আবির্ভাবের আগেই দেবী চৌধুরাণীর মাধ্যমে তাঁর কল্পিত অবতারের আবির্ভাব ঘোষণা করেছেন।

অন্য দিকে এই গ্রন্থপাঠ যিনি শুনছিলেন সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বঙ্কিম-পরিকল্পিত অনুশীলনধর্মের আদর্শ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সচেতন ন'ন, বইপড়া বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর অনীহা তো সর্বজনবিদিত, অথচ মানুষে, প্রতিমায়, অবতারে, সাকারে নিরাকারে সব পন্থায় পরমসত্যের উপলব্ধির এমন এক বিশাল সমুদ্র, যাঁর সঙ্গে তুলনীয় অধ্যাত্মব্যক্তিত্ব বাংলার ইতিহাসে এক চৈতন্যদেব ছাড়া আর কেউ ন'ন। নিজের সম্বন্ধে তিনিই বারংবার ভক্ত অনুরাগীদের বলেছেন—'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।' অবতারতত্ত্বের দিক থেকে না দেখেও শুধুমাত্র ঈশ্বরোপলব্ধির অনন্ত প্রকাশের বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, বঙ্কিমের কল্পিত দেবী চৌধুরাণী তার ক্ষীণতম প্রতিভাসও নয়। তবু, ইতিহাসের কৌতুক এই, অধ্যাত্মজগতের অবতারশ্রেণীর মহাপুরুষদেরই একজন, সাহিত্যিকের কল্পনাসৃষ্ট অবতার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' রামকৃষ্ণদেবের জীবিতকালেই 'প্রচারে' প্রকাশিত

হতে থাকে। 'প্রচারে' ও 'নবজীবনে' বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মসম্বন্ধে মতামত নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যা শুনেছিলেন, তা থেকে বুঝেছিলেন—'বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে না।' 'আবার বলে নাকি—কামাদি এ সব দরকার।' বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-লীলাকে বঙ্কিম ঐতিহাসিক গুরুত্ব না দেওয়ায় তাঁর মন্তব্য—'ও সব কথা যে খবরের কাগজে নাই। কেমন করে মানা যায়।'

'কৃষ্ণচরিত্র' এবং 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহাবসানের পরে। রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বঙ্কিমের যে একটিদিনমাত্র আলাপচারীর বিবরণ 'কথামৃতে' রয়েছে, তার দ্বারা বঙ্কিমের চিন্তাধারায় কোনো পরিবর্তন হওয়া বোধ করি সম্ভব নয়। তবু 'ধর্মতত্ত্বে'র একটি অংশ রামকৃষ্ণদেবের স্যাকরার দোকানের গল্পটির অনুষঙ্গ মনে জাগিয়ে দেয়।

"এখন বুঝিলে ভক্তি কি? ঘরে কপাট দিয়া পূজার ভান করিয়া বসিলে ভক্ত হয় না। মালা ঠক্‌ঠক্ করিয়া হরি! হরি! করিলে ভক্ত হয় না; হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! বলিয়া গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না; যে আত্মজয়ী, যাহার চিত্ত সংযত, যে সমদর্শী, যে পরহিতে রত, সেই ভক্ত। ঈশ্বরকে সর্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া, যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বরানুরূপী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে।"

(ধর্মতত্ত্ব : বঙ্কিমরচনাবলী : সাহিত্যসংসদ সং : ২য় খণ্ড : পৃঃ ৬৩৬)

বহিরঙ্গ ভেকধারী স্যাকরাদের 'হরি হরি' 'হর হর' জাতীয় ভক্তির প্রতি রামকৃষ্ণদেবের তীব্র ব্যঙ্গ এবং যথার্থ ভক্তরূপে তাঁর দিব্যচরিত্র—এ দুইই বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভক্ত' সম্বন্ধে ধারণাকে স্বচ্ছতর করে তুলতে সহায়তা করেছিল, এমন কথা মনে করতে বাধা নেই।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মানবিকতার আদর্শের সঙ্গে বঙ্কিমের মানবিকতা-বোধের পার্থক্য মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'বাংলার নবযুগ' বইটিতে এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন— (উদ্ধৃত অংশে শুধু বিবেকানন্দের নাম থাকলেও বিবেকানন্দের এ দৃষ্টি রামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টি থেকেই সঞ্চারিত)—'বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বে, মানুষের প্রকৃতিসুলভ যে মনুষ্যত্ব—তাহার সেই দেহ-মন-প্রাণের ধর্মকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে, এবং সেইজন্য পূর্ণ-মনুষ্যত্ব-লাভকে

সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা বা সর্ববৃত্তির অনুশীলন-সাপেক্ষ করা হইয়াছে। এইরূপ দৈহিক ও মানসিক ব্যাপার ব্যতিরেকেও 'তথাকথিত জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার অভাবেও, অন্য উপায়ে মানুষের আত্মা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্ব তাহার যেন প্রতিবাদী। ইহার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দের মত, আত্মার স্বাতন্ত্র্য-মহিমায় (বিবেকানন্দের 'Individuality') বিশ্বাস করতেন না; ছোট-বড় সকল মানুষের মধ্যেই সেই এক শক্তি-বীজ নিহিত আছে, তাহার স্ফুরণ যে সর্বাবস্থাতেই সম্ভব—সামাজিক অবস্থা বা মানসিক উৎকর্ষের উপরে তাহা নির্ভর করে না; চরিত্রবলই যে চিত্তশুদ্ধির নিদান, এবং তাহা অশিক্ষিতের মধ্যেও সুলভ,—বঙ্কিমচন্দ্রের 'Doctrines of Culture' (অনুশীলনতত্ত্ব) তাহা গ্রাহ্য করে নাই। এজন্য তিনি একরূপ Intellectual aristocracy-র (মননগত আভিজাত্য) সমর্থন করিয়াছেন। বিবেকানন্দও কম aristrocrat (অভিজাত) নহেন, কিন্তু তাঁহার aristocracy (আভিজাত্য) আত্মার aristocracy, তাই তাহা ডেমোক্রেসিরও (গণতন্ত্রের) চূড়ান্ত।"

(বাংলার নবযুগ—দ্বাদশ অধ্যায়)

৭

বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র—বাংলা গদ্যের এ দুই মহারথীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেখা ও আলাপ মাত্র এক একটি দিনে সীমাবদ্ধ হওয়াতে জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে এঁদের পারস্পরিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে অনেক কথাই অজানিত থেকে গেছে। বিদ্যাসাগর যেমন কথা দিয়েও দক্ষিণেশ্বরে যেতে পারেন নি, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রও আর একদিন সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলেও কার্যত আর কোনো সাক্ষাৎকার ঘটে নি। বিদ্যাসাগরের কাছে রামকৃষ্ণদেব যেমন হৃদয় উজাড় করে কথা বলেছিলেন, বঙ্কিমের সঙ্গে আলাপনে সে তুলনায় একটু সংবৃত হলেও তাঁর সহজ ভাষাভঙ্গীর হের-ফের হয় নি। তুলনামূলকভাবে বঙ্কিমের 'ধর্মতত্ত্বে' গুরু ও শিষ্যের আলাপ এবং শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ—পাশাপাশি রাখলেই অধ্যাত্মপ্রসঙ্গের সজীবতায়, ব্যাখ্যা ও অনুভূতি-সঞ্চারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মৌখিক ভাষার কৃতিত্ব অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থিতিতে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর অধ্যাত্মপ্রসঙ্গে যে ভাবা

ও ভাবের লাবণ্যসম্ভার আপন অলক্ষিতে রেখে গিয়েছেন, তার সামান্য কিছু উদাহরণ—(ভক্ত অধরের কাছে বঙ্কিমের পরিচয় পেয়ে) "শ্রীরামকৃষ্ণ—বঙ্কিম! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো! বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে)—আর মহাশয়! জুতোর চোটে। (সকলের হাস্য) সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা। শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন। শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন। কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যা কেউ কেউ করে, শ্রীরাধার প্রেমে ত্রিভঙ্গ। কালো কেন জানো? আর চৌদ্দপো, অত ছোট কেন? যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে, ততক্ষণ কালো দেখায়; যেমন সমুদ্রের জল দূর থেকে নীলবর্ণ দেখায়।...সূর্য দূরে বলে ছোট দেখায়; কাছে গেলে আর ছোট থাকে না।

... ...

"হাঁসের গতি দেখেছো? এক দিকে সোজা চলে যাবে। শুদ্ধ ভক্তের গতিও ঈশ্বরের দিকে।

... ...

"তাঁকে জানলে সব জানা যায়, কিন্তু সামান্য বিষয় জানবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। বেদেও একথা আছে। যতক্ষণ না লোকটিকে দেখা যায়, ততক্ষণ তার গুণের কথা কওয়া যায়; সে যেই সামনে আসে, তখন ও-সব কথা বন্ধ হয়ে যায়। লোকে তাকে নিয়েই মত্ত হয়, তার সঙ্গে আলাপ করে বিভোর হয়, তখন আর অন্য কোন কথা থাকে না।

... ...

"আর সব পথেই ভুল আছে, সবাই মনে করে আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে, কিন্তু কারও ঘড়ি ঠিক যায় না। তা বলে কারু কাজ আটকায় না। ব্যাকুলতা থাকলে সাধুসঙ্গ জুটে যায়, সাধুসঙ্গে নিজের ঘড়ি অনেকটা ঠিক করে লওয়া যায়।

... ...

"তোমায় বলি, উপরে ভাসলে কি হবে? একটু ডুব দাও। গভীর জলের উপর হাত পা ছুঁড়লে কি হবে? ঠিক মাণিক ভারী হয়, জলে ভাসে না; তলিয়ে গিয়ে জলের নীচে থাকে। ঠিক মাণিক লাভ করতে গেলে জলের ভিতর ডুব দিতে হয়।

বঙ্কিম—মহাশয় কি করি, পেছনে শোলা বাঁধা আছে। (সকলের হাস্য) ডুবতে দেয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে স্মরণ করলে সব পাপ কেটে যায়। তাঁর নামেতে কালপাশ কাটে। ডুব দিতে হবে, তা না হলে রত্ন পাওয়া যাবে না। একটা গান শোনো—'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।'"

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলাপচারীর যে অংশগুলি আমরা নির্বাচন করেছি, তাতে প্রকাশভঙ্গীর যে মাধুর্য ও সরস গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে, বঙ্কিম তা লক্ষ্য করেছেন কি না, ঠিক করে বলা কঠিন। কিন্তু 'প্রচার' পত্রিকায় যখন নব্য লেখকদের উদ্দেশে তাঁর বিখ্যাত দ্বাদশসূত্র নিবেদন করেছেন, তখনই তাঁর ঘোষণা—"সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক।" বঙ্কিমের আর একটি সূত্রও আমরা এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে পারি—"যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মানবজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।"

(প্রচার, মাঘ, ১২৯১ ; বঙ্কিম রচনাবলী : ২য় : সা. স. সং : পৃঃ ২৭২)

'কথামৃতে' বিধৃত শ্রীরামকৃষ্ণবাণী যিনি সংগ্রহ করেছিলেন সেই মহেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাষা ও সাহিত্যের এ দুটি প্রধান গুণ অনুভব করেই বিশ্বকল্যাণে এই বাণীসংগ্রহ উত্তরকালের জন্য রেখে গেছেন। অবশ্য মনে রাখতে হবে 'কথামৃত' রামকৃষ্ণদেবেরই বাঙ্ময় প্রকাশ, মহেন্দ্রনাথ অনুলেখক মাত্র। কেউ কেউ ভুল করে এ বিষয়ে মহেন্দ্রনাথকেই এ রচনার কৃতিত্ব আরোপ করে বসেন। শ্রীরামকৃষ্ণবাণী ছাড়া অন্যান্য বর্ণনায় ও মননে মহেন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভার সমুজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে। বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণ-বাকভঙ্গিমার যথাযথ উপস্থাপনাতেই মহেন্দ্রনাথ নিবেদিতপ্রাণ, তাঁর নিজস্ব বক্তব্য শুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-কথার পটভূমিরূপেই দেখা দিয়েছে। 'কথামৃতে' বা অন্যান্য বাণীসংগ্রহে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সহজাত সাহিত্যপ্রতিভার আত্মপ্রকাশের ফলে বাংলার প্রতিদিনের ভাষা আজ তুচ্ছতার বন্ধন মুক্ত হয়ে অনন্তের অধিকারী। বাংলাসাহিত্যে এ ঘটনার বৈপ্লবিক সম্ভাবনা সমকালীন খুব কম জনেই বুঝতে পেরেছিলেন, আজ এতদিন পরেও সেকথা সমান সত্য। অভ্যস্ত ধারণার বাইরে আমরা সাহিত্য সম্বন্ধেও অগ্রসর হতে অনিচ্ছুক।

বিদ্যাসাগর থেকে বঙ্কিম—এর মধ্যে বাংলা গদ্যের ইতিহাস অনেক দূর অগ্রসর। বাংলার ভাষাসমস্যায় সাধু ও চলতি গদ্যের কৃত্রিম দ্বন্দ্ব এর মধ্যে যথেষ্ট মাথাচাড়া

দিয়েছে। যদিচ শরৎচন্দ্র অবধি বাংলা গদ্যে সাধু ভাষাই প্রধান ভাষা, তবু মুখের কথা ক্রমেই তার দাবী বাড়িয়ে চলেছে। বঙ্কিম হয়তো একথা ভেবেই আগে থেকে সাবধানবাণী শুনিয়েছিলেন—"যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে।" (বাঙ্গালা ভাষা—বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্কিমরচনাবলী : ২য় খণ্ড : পৃঃ ৩৬৮)

প্যারীচাঁদ, হুতোম বা বঙ্কিমের প্রবন্ধে উল্লেখিত 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকার প্রবন্ধকার শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়—এঁরা সকলেই নিজের নিজের আদর্শ অনুযায়ী মুখের ভাষা ও লেখার ভাষার পার্থক্য দেখাতে চেয়েছিলেন। 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' অবশ্য মুখের ভাষা। তবু সর্বত্র কিছু পরিমার্জনার প্রশ্ন ওঠে, সেদিক থেকে 'কথামৃত'ও একেবারে সবটাই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাষার যথাযথ শব্দ ও উচ্চারণ-সহ আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে নি। তবে এ ভাষা তাঁর মুখের ভাষার সবচেয়ে কাছাকাছি।

কথন ও লেখনের ভাষা সম্বন্ধে 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বঙ্কিমের আর একটি মন্তব্য অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপ্রমাণিত। বঙ্কিমের মতে—"কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান চিত্তসঞ্চালন।" এক্ষেত্রে লেখক বঙ্কিম কথোপকথন, আলাপচারী, বক্তৃতা প্রভৃতির ভাষা ব্যবহারের কথা মনে রাখেন নি। কিন্তু বিশ্বসাহিত্যে প্লেটো, গ্যেটে, ডঃ জনসন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখদের উদ্দেশ্য শুধু সামান্য জ্ঞাপন ছিল না—এঁদের কথার গুরুত্ব লেখার চাইতে কম নয়। অনেকসময়ই কথা থেকেই লেখা। যেখানে তা নয়, সেখানেও কথার নিজস্ব সাহিত্যমূল্য অস্বীকার করার উপায় নেই।

৮

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথার সাহিত্যমূল্য-বিচারে নিঃসংশয়ে প্রথম স্থান স্বামী বিবেকানন্দের। বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাষার প্রভাবের দিক থেকে কেশবচন্দ্রের ভাষণাবলীর পরেই স্মরণীয় গিরিশচন্দ্রের নাট্যসংলাপ। তারপরেই স্বামী বিবেকানন্দের গদ্যরীতি। বাংলা গান ও কবিতার ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার (প্রখ্যাত কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ছোট ভাই) প্রমুখদের রচনা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাব আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে আমরা পরবর্তী কোনো অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করবো। বর্তমানে আমাদের আলোচনা শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ভাষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য বিষয়েই নিবদ্ধ রাখছি।

স্বামী বিবেকানন্দের 'ভাব্‌বার কথা' গ্রন্থের 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধটি প্রথমে 'হিন্দুধর্ম কি?' এই নামে প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণ 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে এই প্রবন্ধটি উপলক্ষ্য কবে জাতীয় জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষার উপযোগিতাপ্রসঙ্গে স্বামীজীব বক্তব্য—"আমার মনে হয়, সকল জিনিষের মতো ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন ঐরূপ হয়েছে বলে বোধ হয়। **ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ও ভাষায় আবার নূতন স্রোত এসেছে। এখন সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে। নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে।**......

"দেশ সভ্যতা ও সময়ের উপযোগী করে সকল বিষয়ই কিছু কিছু change করে নিতে হয়। **এর পর বাঙলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখবো মনে করছি।** সাহিত্যসেবিগণ হয়তো তা দেখে গালমন্দ করবে। করুক, তবু **বাঙলা ভাষাটাকে নূতন ছাঁদে গড়তে চেষ্টা করব।**"

(বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : ১ম সং : পৃঃ ৯৩-৯৭)

"ঠাকুরের ভাব তো সবাইকে দিতে হবেই ; অধিকন্তু বাঙলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে।"

['উদ্বোধন'-পত্রিকা প্রচারের মধ্য দিয়ে] "দেশে নবভাব প্রচারের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হবে। এই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম বুঝি...সাধন-ভজনের চেয়ে কম মনে করেছিস?"

"উদ্বোধনে' সাধারণকে কেবল positive ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে। Negative thought (নেতি-বাচক ভাব) মানুষকে weak (দুর্বল) করে দেয়। দেখছিস না, যে-সকল মা-বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়, বলে, এটার কিছু হবে না, 'বোকা', 'গাধা'—তাদের ছেলেগুলি তাই হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বললে—উৎসাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম, children in the higher region of thoughts (চিন্তারাজ্যের উচ্চস্তরে যারা শিশু) সম্বন্ধেও তাই। Positive

ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে পারলে সাধারণে মানুষ হয়ে উঠবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কাবিতা, শিল্প সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐ সব বিষয় কেমন করে ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে করতে পারবে, তাই বলে দিতে হবে।···ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমবা হেয় মনে করতুম, তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতি-গতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমটা অদ্ভুত।

"ধর্মপ্রচারটা কেবল যাতে তাতে এবং যার তার উপর নাকসিঁটকানো ব্যাপাব বলে যেন বুঝিস নি। Physical, mental, spiritual (শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক) সকল ব্যাপাবেই মানুষকে positive ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে।···পবস্পরকে ঘেন্না করে করেই তোদের অধঃপতন হয়েছে। এখন কেবল positive thought (গঠনমূলক চিন্তা) ছড়িয়ে লোককে তুলতে হবে। প্রথমে ঐরূপে সমস্ত হিঁদুজাতটাকে তুলতে হবে, তারপর জগৎটাকে তুলতে হবে। ঠাকুরের অবতীর্ণ হওয়াব কারণই এই। তিনি জগতে কারও ভাব নষ্ট করেন নি। মহা অধঃপতিত মানুষকেও তিনি অভয় দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে তুলে নিয়েছেন। আমাদেবও তাঁর পদানুসরণ করে সকলকে তুলতে হবে, জানতে হবে।

"···বেদ-বেদান্তের উচ্চ-উচ্চ ভাবগুলি সাদা কথায় মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সদাচার, সদ্ব্যবহার ও বিদ্যা-শিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে একভূমিতে দাঁড় করাতে হবে। 'উদ্বোধন' কাগজে এই সব লিখে আবালবৃদ্ধবনিতাকে তোল্ দেখি।" (তদেব : পৃঃ ১৭৩-১৭৭)

বাংলাভাষা ও সাহিত্যপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভূমিকাকে সর্বপ্রথম সচেতন-ভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন বিবেকানন্দ। তাই 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবেব সাহিত্যিক ভূমিকা সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য আমরা একত্রে তুলে ধরলাম। এ থেকে কয়েকটি সূত্র সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের বিচারে যা প্রণিধানযোগ্য—(ক) শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাব এদেশের ইতিহাসে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, বিবেকানন্দের ধারণায় বাংলাভাষায়ও এর দ্বারা যুগান্তরের সূচনা। (খ) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই নবপ্রতিভার আদর্শেই বিবেকানন্দের সাহিত্য-সৃষ্টির সার্থকতা। (গ) শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ভাষায় সর্বসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় যে সরলতা ও প্রসাদগুণ রয়েছে,

তার সঙ্গে বিবেকানন্দের অভীমন্ত্রের ওজস্বিতার সম্মেলনে এক নতুন ভাষাপদ্ধতি গড়ে তোলা দরকার, সে ভাষা জাতীয় জাগরণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। (ঘ) সাহিত্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মনুষ্যত্বের জাগরণ, গঠনমূলক চিন্তা বিস্তার তার প্রধান কর্তব্য। মানুষ-গড়ার এ কাজে আমাদের শাস্ত্রে ও ঐতিহ্যে নিবদ্ধ চিন্তাধারা ও আদর্শ সর্বজনের উপযোগী ভাষায় ছড়িয়ে দিতে হবে।

বাংলা সাধু গদ্য ও চলতি গদ্য—এ দুই বিষয়ে রামকৃষ্ণদেবের প্রেরণাকে কেন্দ্র করে স্বামীজী নতুন কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন।* সাধু গদ্য বা সাধারণভাবে বাংলা গদ্যভঙ্গী সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য—"এখনকার বাঙলা-লেখকেরা লিখতে গেলেই বেশী verbs (ক্রিয়াপদ) use (ব্যবহার) করে, তাতে ভাষায় জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে verb (ক্রিয়াপদ)-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার বেশী জোর হয়—এখন থেকে ঐরূপে লিখতে চেষ্টা কর্ দিকি।...ভাষার ভেতর verb-গুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস?—ঐরূপে ভাবের pause (বিরাম) দেওয়া; সেজন্য ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার মতো দুর্বলতার চিহ্নমাত্র। ঐরূপ করলে মনে হয়, যেন ভাষার দম নেই।...আহারে, চালচলন ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়।" (তদেব : পৃঃ ১৪-১৫)

সাধু গদ্য নিয়ে স্বামীজীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রেরণা রামকৃষ্ণদেবের কথোপকথন থেকে এসেছে বললে একটু বিস্ময়ের সৃষ্টি হতে পারে। তবে আমরা এ গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণসাহিত্যের পটভূমি সন্ধান করে যা দেখেছি, তাতে মনে হয় বেদবেদান্ত ও আধ্যাত্মিক জগতের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের মুখের ভাষার সম্বন্ধ এত অব্যবহিত ও নিগূঢ় যে, তাঁর কথা শুনতে শুনতেই তরুণ নরেন্দ্রনাথের চিন্তাধারা প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের ভাষাভঙ্গীর যুগে পরিভ্রমণ করেছে। প্রমাণস্বরূপ তাঁর বিখ্যাত 'বাঙলাভাষা' রচনা (বা পত্রাংশ) থেকে স্মরণ করুন—"ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান, ভাষা পরে। হীরে-মতির সাজ-পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায়? সংস্কৃতের দিকে দেখ দিকি। 'ব্রাহ্মণে'র সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর 'মীমাংসাভাষ্য' দেখ, পতঞ্জলির

* বর্তমান লেখকের 'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে 'বাংলা গদ্যের চলতি রূপ ও স্বামী বিবেকানন্দ' এবং 'সাধু গদ্য ও স্বামী বিবেকানন্দ' অধ্যায় দুটি দ্রষ্টব্য।

'মহাভাষ্য দেখ,' শেষ—আচার্য শঙ্করের ভাষ্য দেখ, আর অর্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ। এখুনি বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত কথা কয়, মরে গেলে মরাভাষা কয়।" (বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ২য় সং পৃঃ ৩৬)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষা স্বামীজীর নির্দিষ্ট 'জেন্ত' ভাষা। তা একদিকে যেমন শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রকাশ, আর এক দিকে তেমনি সাধারণ মানুষের নিরলঙ্কার সহজ প্রাণের ভঙ্গিমা। প্রাচীন কালের সংস্কৃত ভাষার যে দৃঢ়তা, সংযম ও অর্থদ্যোতনা ছিল তা যেমন সমকালীন ভারতচেতনার প্রাণ-শক্তিরই পরিচায়ক, আধুনিক কালের বাংলা গদ্যেও তেমনি সে জাতীয় সংহতি সঞ্চারের প্রয়োজন। পরবর্তী সংস্কৃতে ভাষা ক্রমে বাক্‌জাল-বিজড়িত অরণ্যে পর্যবসিত। শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি অতি অলঙ্করণ বা অতিকথন ক্ষয়শীলতার চিহ্ন। স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় আবার ভাব, ভাষা ও মনীষার যথাযথ সম্মেলন ঘটেছে। সাধু গদ্যে লেখা স্বামীজীর প্রবন্ধাবলী তাঁর ভাষাগত সাধনার একটি বিশিষ্ট দিক।

চলতি গদ্যের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হলেও আমরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অনুপ্রাণিত ভাষা-আন্দোলনের মূল সূত্রটি যে গণ-চেতনাব সঙ্গে একাত্মতায়—সেকথা খুব কমই মনে রাখি। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের চেয়ে এক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ-রাধানাথ শিকদার-কালীপ্রসন্ন সিংহের (হুতোম প্যাঁচার) কাছেই আমরা বেশী ঋণী। তবু জ্ঞানের সাহিত্য বা ভাবের সাহিত্যে সাধু গদ্যের শিল্পীদের সঙ্গে এঁদের তুলনা চলে না। বাস্তবিক পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথার মধ্য দিয়েই বাংলা চলতি গদ্যের নবজন্ম, আর বিবেকানন্দের লেখনীতে ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের অনুলেখনে সে ভাষার বিস্তার। বিবেকানন্দের চলতি গদ্যরীতি নিশ্চয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চেয়ে স্বতন্ত্র— কিন্তু গুরু-শিষ্য দু'জনেই সাধারণ মানুষের ভাষায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে অসাধারণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে গেছেন—এইখানে বাংলা চলতি গদ্য-আন্দোলনে তাঁদের বিশিষ্ট ভূমিকা।

স্বামীজীর 'বাঙ্গালাভাষা'-রচনাটিতে চলতি গদ্যের জয়গানের পিছনে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাষাদর্শের জয় গান। "আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। **বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা 'লোকহিতায়'**

এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। (তদেব : পৃঃ ৩৫)

বাংলাসাহিত্যে এই গণচেতনার অভিব্যক্তিই চলতি গদ্যের আন্দোলনের মূলে। স্বামীজীর দৃষ্টিতে যেমন ভারতবর্ষে ধর্মান্দোলনই সব বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা,[১] তেমনি চলতি গদ্যের একচ্ছত্র আধিপত্যরূপ বাংলা ভাষাবিপ্লবের অগ্রদূত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলন।[২]

বাঙালীর মনন ও ভাষার ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভূমিকা-প্রসঙ্গে, আমাদের আলোচনার প্রান্তে এসে তাঁর ভাষা-কৃতির দীর্ঘ উদাহরণ আর উপস্থাপিত না করে, এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো, যা আজ বাংলা ভাষার ভূষণে ভঙ্গিমায় প্রাণসত্তায় মিলে মিশে এক হয়ে গেছে, তবু যা বিশেষভাবে তাঁরই বাগ্‌ভঙ্গির অন্যতম দিক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশিষ্ট বাক্য, বাক্যাংশ বা প্রবাদ-প্রবচন-সৃষ্টি অথবা প্রয়োগনৈপুণ্য আজ আমাদের ভাষাগত ঐতিহ্যকে কতখানি মহিমামণ্ডিত ও অর্থগৌরবে গরীয়ান করে তুলেছে, সামান্য কিছু দৃষ্টান্তের দ্বারা এখন আমরা সেই বিষয়ে পাঠকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর যে বাক্যটি সবচেয়ে প্রচারিত সেইটি সর্বাগ্রে স্মরণ করি—'যত মত তত পথ।' এ কথাটিকে তিনি আরো দুভাবে প্রকাশ করেছেন—'অনন্ত মত অনন্ত পথ'; 'তিনি অনন্ত, তাঁর পথও অনন্ত।' একটু আশ্চর্য শোনালেও একথা ঠিক যে, কথামৃতে 'যত মত তত পথ' কথাটি পাই নি, পেয়েছি 'লীলাপ্রসঙ্গে'।

'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি' অথবা 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি' ('বর্তমান ভারত' : স্বামী বিবেকানন্দ—শেষাংশে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্ঘর্ষ'—অংশ দ্রষ্টব্য) আমাদের শিক্ষাচিন্তার চিরন্তন দিশারী। আপন জীবনে তিনি কতো জনের কাছ থেকে কতো ভাবেই না শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, সে শিক্ষাকে পরিপূর্ণতা দিয়ে বিশ্বজনের উদ্দেশে বিতরণ করেছেন। তোতাপুরী বা যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণীর সঙ্গে তাঁর গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ সেই জীবনব্যাপী শিক্ষাগ্রহণেরই অঙ্গ।

পরমসত্য লাভের পথে স্মরণীয়—'সত্যকথা কলির তপস্যা', 'কলিতে নারদীয় ভক্তি', 'মন মুখ এক করা'; 'লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়'; 'ধ্যান করবে মনে বনে কোনে'—চলতি বাংলায় এ তাঁর সাধনপদ্ধতির ভাষা।

---

১ বর্তমান ভারত : 'ক্ষত্রিয় শক্তি'—অংশ দ্রষ্টব্য।

২ এ প্রবন্ধের কোনো কোনো পঙ্‌ক্তির স্থূলাক্ষর লেখক কর্তৃক নির্দিষ্ট

সাধকের সতর্কতার প্রয়োজনে—'কামিনী কাঞ্চন' ; 'বিশালাক্ষীর দ' ; [১] 'মতুয়ার বুদ্ধি' ; 'ভাবের ঘরে চুরি'—একথাগুলি সাবধানী সংকেত। কামিনী-কাঞ্চনের দ্বন্দ্বসমাসে আপত্তি করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অথচ নারীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম শ্রদ্ধার কথা তাঁর জীবনকাহিনীতে কতোভাবেই না প্রকাশিত। সাধারণভাবে পুরুষের কাছে নারী এবং নারীর কাছে পুরুষের আকর্ষণগত দিকটির প্রতি ইঙ্গিতই এখানে উদ্দেশ্য। কাম ও অর্থই যে বিশ্ব-সংসারের নিয়ন্ত্রী দুটি মূল শক্তি, সেকথা মার্কস্ এবং ফ্রয়েড ভালোভাবেই ব্যাখ্যা করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুধু পরমসত্যলাভের পথে দুটি বন্ধন সম্বন্ধে সতর্ক হবার প্রয়োজন আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমানযুগের পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী রূপেই কি এদের নেওয়া চলে না ?

যাত্রী নৌকার মাঝে মাঝে ঘূর্ণাবর্তে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, তাই 'বিশালাক্ষীর দ'—সংসারচক্র যার প্রতীক। কোনো একটি মতবাদে অতিবিক্ত গোঁড়ামিই 'মতুয়া' বা মতবাদীর বুদ্ধি। ধর্মক্ষেত্রে তো বটেই, সব রকমের কর্মক্ষেত্রেই এ সম্বন্ধে সতর্কতার প্রয়োজন। আর বাইরে একজাতীয় ভাব দেখিয়ে ভিতরে অন্য ভাব পোষণ করছি—'ভাবের ঘরে চুরি'—সত্যসন্ধানীর কাছে এর চেয়ে বড়ো অপরাধ আর কি হতে পারে ?

সেই সঙ্গে তিনি সাবধান করেছেন—"কামিনী কাঞ্চনের ভিতর থাকতে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যত সেয়ানই হও না কেন কাল দাগ একটু না একটু গায়ে লাগবেই।" কাজলের ঘরের এই উপমা আজ সাধারণ মানুষেরও মুখে মুখে ফেরে।[৩]

'চালকলা বাঁধা বিদ্যা'—পুরুতবামুনের প্রাপ্য থেকে আমাদের অর্থকরী শিক্ষার প্রতীকরূপে পরিণত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৈশোরকাল থেকে। সে শিক্ষায় তিনি কখনো রাজী হন নি। সম্পূর্ণ অনাসক্তির সাধনায় তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' ; তাই—গীতার অর্থ, দশবার গীতা বললে যা হয় তাই অর্থাৎ ত্যাগী ত্যাগী'[২]—এ সিদ্ধান্ত তাঁর পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক।

যথার্থ জ্ঞান তো কেবল বই পড়া বিদ্যা নয়, প্রত্যক্ষ অনুভব। তাই তাঁর

---

১ কলকাতার অদূরে সাঁকরাইলের কাছে গঙ্গায় এই নামে দ' বা ঘূর্ণি ছিল। দ' মূলে দহ বা হ্রদ। তবে অন্য কোনো সমনামের দহের কথাও বলে থাকতে পারেন।

২ ত্যগ্ ধাতু ঘঞ্ ইন্=ত্যাগী ৩ কথামৃত : ১ম : ২২শে অক্টোবর, ১৮৮৫

মতে 'পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল।' এ যেমন ঈশ্বরলাভের ক্ষেত্রে তেমনি সাধারণ বিদ্যার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

পরীক্ষা পাসের সঙ্গে ঈশ্বরানুরাগের সম্বন্ধ কিছু অপরিহার্য নয়, বরং তাঁর ভাষায় 'যার যতটা পাস, তার ততটা পাশ।' পাশ কথাটির সাধারণ অর্থ বন্ধন, সেভাবেও জীব যখন মায়ার অধীন, তখন সে পাশবদ্ধ, কিন্তু পাশমুক্ত যখন তখন সে স্বরূপতঃ শিব। 'পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।'

এ সংসারে নানা দ্বন্দ্বসংঘাতের অন্তরালেই পরমসত্যের অবস্থান। সেকথা মনে রেখে তিনি বলতেন, 'গোলে মালে মাল আছে, গোল ছেড়ে মালটি নেবে।' তিন 'স'-এর উদাহরণ দিয়ে বলতেন, 'স ষ শ' অর্থাৎ সহ্য কর। আর বলতেন, 'যার হেথায় আছে তার সেথায় আছে,—যার হেথায় নাই, তার সেথায়ও নাই।' সত্য যা, তাকে খুঁজতে বাইরে যেতে হয় না, সে অন্তরে আছে বলেই বাইরেও পরিব্যাপ্ত। তাই সাধক যখন তীর্থে বা ভ্রমণে ঈশ্বব অনুসন্ধান করে বেড়ান, তখন একথা মনে রাখেন না যে, নিজের মধ্যে যা পাওয়া যায়, তারই খোঁজে তিনি দূর-দূরান্তে ঘুরে ফেরেন।

'মানুষ আর মান হুঁশ'—এ দুয়ের ব্যাখ্যাটি তাঁর মতানুসারে চিন্তনীয়। 'যার-হুঁশ আছে চৈতন্য আছে, সে নিশ্চিত জানে ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য—সেই মানহুঁশ।' এই মানুষের সাধারণ স্তরটিই 'কাঁচা আমি', আর ঈশ্বরোপলব্ধিময় সত্তাটিই 'পাকা আমি'। ভাষান্তরে রবীন্দ্রনাথের 'ছোট আমি, বড়ো আমি'।

'এক কৌপীনকা ওয়াস্তে' থেকে শেষ অবধি আমাদের সহস্র বন্ধন। শরণাগত ভক্ত অবশ্য জানেন এ সংসারে 'রামের ইচ্ছা'ই সব ইচ্ছার মূল। তাই 'ভাগবত ভক্ত ও ভগবান, তিনে এক, একে তিন'—একথা ভক্তির অদ্বৈত-বোধের চরমকথা। তিনি তো বলেছেন—'শুদ্ধজ্ঞান আর শুদ্ধাভক্তি এক'—এই একটি কথায় জ্ঞান-ভক্তির বহুদিনের বহিরঙ্গ দ্বন্দ্ব নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

'জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ'। তাই সেই ব্রহ্মচারীর কথায় 'এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও'। তারপর তাঁর কৃপা হলে 'হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে আলো লয়ে এলে একক্ষণে অন্ধকার পালিয়ে যায়। একটু একটু করে যায় না।' সেই পরম উপলব্ধির প্রকাশ কেমন?—'কেমন ঘি, না যেমন ঘি।' আর সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে, ভাষায় বলা হয়েছে, কেবল 'ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নাই।'

সাধারণ সাধকের ক্ষেত্রে আগে সাধন পরে সিদ্ধি, আর অবতার পুরুষদের

ক্ষেত্রে আগে সিদ্ধি পরে সাধন—যেমন শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ। 'লাউ কুমড়ো গাছে আগে ফল হয়, তারপর ফুল।'

ভক্তের আদর্শ 'বিড়ালছানা' হওয়া, 'বাঁদরছানা' নয়। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ভক্তের আচরণ 'ঝড়ের আগে এঁটোপাতা'র মতো। ঝড় যেখানে নিয়ে যায়, সেখানেই পড়ে থাকে। ভক্তের সব আর্তি ও আকুতি তাঁর কাছে পৌঁছে গেছে—'তিনি খুব কানখড়কে'। তবু ভক্ত যেন নির্বোধ না হয়ে পড়ে—'ভক্ত হবি' তা বলে বোকা হবি কেন?' যথার্থ ভক্ত সাধারণ লোকের কথায় কানই দেবে না, ভাববে 'লোক না পোক'। গিরিশচন্দ্রের মতো ভক্ত, তাঁর বিশ্বাস শুধু ষোলো আনা নয়, 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস।' আবার একাধারে জ্ঞানী ও ভক্ত নরেন্দ্রনাথ ত্যাগে বৈরাগ্যে মনুষ্যত্বে 'খাপখোলা তলোয়ার'!

সংসারে থাকতে গেলে ভালো মন্দ নানা রূপেই নারায়ণের দেখা মিলবে। 'হাতী নারায়ণ, মাহুত নারায়ণ'—এ দুয়ের মধ্যে 'মাহুত নারায়ণে'র কথা শুনেই চলতে হবে। আবার অন্যায়কারী অত্যাচারীর কাছে আত্মরক্ষার জন্য 'ফোঁস করতে' হবে, তবে 'বিষ ঢালা' চলবে না।

তিনি বলতেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' বাইরের প্রয়োজন কিছুটা মেটাতে হবে বৈ কি। তবে একথাও বলেছেন, 'সে ঘরের উল্টো চাবি।' ঈশ্বরকে পেতে হলে জগতের প্রচলিত ধারার উলটো পথে যেতে হবে। ছুঁচে সুতো পরানোর উপমায় এতটুকু আঁশ থাকলে যেমন হবে না, তেমনি ভগবান-লাভের ক্ষেত্রে এতটুকু বাসনা থাকলে সত্যলাভ সম্ভব নয়—এও তাঁরি সিদ্ধান্ত। আবার 'চাঁদ মামা সকলেরই মামা'—ঈশ্বর আমাদের সকলেরই একান্ত আপন—এও তাঁরি দেওয়া আশ্বাস।

এমনি ভাবে অনন্ত উপলব্ধির অজস্র প্রকাশে বাংলাভাষাকে তিনি প্রবাদ প্রবচনে বিশিষ্ট বাক্যে সমৃদ্ধ করে গেছেন। শুধুমাত্র জ্ঞানীর বা বৈরাগীর শুষ্কতা চান নি। প্রার্থনা করেছিলেন, 'মা, আমায় রসে বশে রাখিস।' আনন্দময়ী তাঁর পরমপ্রিয় সন্তানের জীবনে, মননে, সাধনে, বচনে তাই রসের ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছেন। বাঙালী জাতির, বাংলাভাষার তা চিরকালের সম্পদ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ইংরেজীভাষা

বাংলাভাষার ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব দু'জনেই প্রাণবেগ-সঞ্চারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। শ্রীচৈতন্যদেবের নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গী আজ অনুমানসাপেক্ষ। রামকৃষ্ণদেবের ক্ষেত্রে আমাদের অশেষ সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীম এবং অন্যান্য রামকৃষ্ণপার্ষদবৃন্দের দ্বারা তাঁর বাক্‌ভঙ্গী অনেক পরিমাণে সুরক্ষিত। এদিক থেকে যাঁরা ভাষাশাস্ত্রী তাঁরা সেযুগের আঞ্চলিক কথ্যভাষা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে শ্রীরামকৃষ্ণবাণীকে মূল্যবান উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা শ্রীবামকৃষ্ণদেবের ভাষাভঙ্গিমার একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবো। সমকালীন ইংরেজী শিক্ষিতদের সংস্পর্শে এসে প্রায় শতবর্ষের ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের কথাবার্তায় আলাপচারীতে যে সব ইংরেজী শব্দ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল তা এই মহামানবের ভাষাকেও কিছু প্রভাবিত করেছিল। বাংলা শব্দভাণ্ডারের বৈচিত্র্যের দিক থেকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথনে ব্যবহৃত ইংবেজী শব্দ প্রসঙ্গে পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করতে ইচ্ছুক।

প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা ভালো যে, মেকলের উদ্যোগে এবং তদানীন্তন ভারত-শাসক উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের অনুমোদনে আমাদের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজীর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থির হয় ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে। আর ১৮৩৬-এ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব কামারপুকুরের দরিদ্র ব্রাহ্মণকুটিরে। তাঁর পুথিগত বিদ্যাব পরিধিতে আব যাই হোক ইংরেজী শিক্ষার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আর সব বিদ্যার মতো, ইংরেজী শব্দের ক্ষেত্রেও তিনি "শুনেছেন" অনেক। সেকালের ইস্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী পড়ুয়াব দল তাঁর দক্ষিণেশ্বরের ঘরটিতে অনেককাল থেকেই যাতায়াত করতো। তরুণ বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুদিন কলকাতায় থেকেছেন এবং তারপব অদূরে দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রায়ই কলকাতায় যাতায়াত করতেন। সুতরাং তাঁর সদাজাগ্রত কৌতূহলী মন সেকালের ইংরেজী শিক্ষিতদের ধরণধারণ কথাবার্তা ভাবভঙ্গী ভালোভাবেই লক্ষ্য করেছিল। তাছাড়া যে সময়ে তাঁর আলাপচারী ও উপদেশাবলী বাংলা ও ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে, সে সময় এই ইংরেজী-

শিক্ষিতের দলই তাঁর প্রধান শ্রোতা এবং সেই শ্রোতাদের ভাব ও প্রকাশের অনুরূপ শব্দ ব্যবহার তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। শ্রোতার মানসিক স্তর ও পরিবেশ অনুযায়ী আলাপনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিস্ময়কর দক্ষতার অজস্র নিদর্শন 'কথামৃতে'র পাতায় পাতায়।

আরো একটি কথা এই সঙ্গে বলে রাখা ভালো। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, এ আমাদের কৌতূহলী মনের অন্বেষণজাত আলোচনা। কিন্তু তাঁর সাধনা, আদর্শ, উপলব্ধি ইংরেজীভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, ম্যাক্সমূলর, রমাঁ্যা রলাঁ, নিবেদিতা, খ্রীস্টোফার ঈশারুড— এমনি নানাজনের লেখনী-মাধ্যমে। স্বামীজীর কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান, ভাষা পরে।"—কথাটি অবশ্য বাংলাভাষা প্রসঙ্গে। কিন্তু সব ভাষার ক্ষেত্রেই এ কথা স্মরণীয়। ইংরেজীভাষায় যে বিস্তৃত শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্য গড়ে উঠছে, তার মূলে রামকৃষ্ণদেবের উপলব্ধিময় জগৎ। সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই আপাততঃ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দ প্রসঙ্গে বক্তব্য সীমাবদ্ধ করি।

সর্বভাবের সমন্বয়কারী শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের শেষ ইংরেজী বৎসরটিতে (১৮৮৬) তিনি কাশীপুরে অধ্যাত্ম অনুভূতির ক্ষেত্রে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর কাছে 'কল্পতরু'-রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। সেই থেকে পয়লা জানুয়ারি বাংলাদেশের বিশেষ একটি পুণ্যদিন; কেবলমাত্র ইংরেজী নববর্ষ বলেই স্মরণীয় নয়। হয়তো এই ঘটনা নিতান্ত আকস্মিক যোগাযোগ নয়, এরই মাধ্যমে পাশ্চাত্যজগতের সঙ্গে আমাদের বাঙালী প্রাণের চিরন্তন হৃদয়সম্বন্ধ ঘটে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথনে ইংরেজী শব্দ ব্যবহারের স্মিতহাস্যময় সৌজন্য-সূচক শব্দ ব্যবহারটি সর্বাগ্রে স্মরণ করি—"Thank you" (থ্যাঙ্ক য়ু)— ধন্যবাদ। পাশ্চাত্য আদবকায়দার এই রীতিটি আমাদের দেশে শুধুমাত্র নম্র ভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশ করে। যারা এখন ধন্যবাদ বলি কথায় কথায়, তারা না জেনেই পাশ্চাত্যরীতির অনুকরণ করি। এ যেমন ব্যক্তিগত ধন্যবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি প্রযোজ্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদের ক্ষেত্রেও। যিনি আত্মীয়তম তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া যে কিছুই না দেওয়া সেকথাটি অনুকরণের মোহে ভুলে যাই। তবু মাঝে মাঝে এই মৌখিক স্বীকৃতিরও মূল্য আছে বইকি। সভ্যতার শ্রেষ্ঠ রীতিনীতি কোনো দেশ বা সমাজেই আবদ্ধ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও সেকালের

ইংরেজীশিক্ষিতদের 'থ্যাঙ্ক য়্যু' কথাটির সুপ্রয়োগের দ্বারা সেকথার প্রমাণ রেখেছেন।

১৮৮৩-র ১৯শে আগস্ট। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরটির উত্তর-পূবের বারান্দায় বসে নরেন্দ্রনাথ ও হাজরামশাই তত্ত্বালোচনায় রত। ঘরের মধ্যে ভক্তদের সঙ্গে প্রসঙ্গ ত্যাগ করে হঠাৎ ঠাকুর ওই বারান্দায় চলে এলেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি গো। তোমাদের কি সব কথা হচ্ছে?"

নরেন্দ্র (সহাস্যে)—আমাদের কত কি কথা হচ্ছে—'লম্বা' 'লম্বা' কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কিন্তু শুদ্ধজ্ঞান আর শুদ্ধাভক্তি এক। শুদ্ধজ্ঞান যেখানে শুদ্ধাভক্তিও সেইখানে নিয়ে যায়। ভক্তিপথ বেশ সহজ পথ।

নরেন্দ্র—'আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে, দে মা পাগল করে।' (মাষ্টারের প্রতি) দেখুন, হ্যামিল্টন্-এ পড়লুম—লিখেছেন, A learned ignorance is the end of Philosophy and the beginning of Religion.'

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—এর মানে কি গা?

নরেন্দ্র—ফিলসফি (দর্শনশাস্ত্র) পড়া শেষ হলে মানুষটা পণ্ডিতমূর্খ হয়ে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম ধর্ম করে। তখন ধর্মের আরম্ভ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—Thank you! Thank you! (হাস্য)"

(কথামৃত : ১ম ভাগ)

হ্যামিল্টনের উক্তির স্পষ্ট প্রত্যক্ষরূপ তখন নরেন্দ্রনাথে মূর্ত। বহু জিজ্ঞাসার সমুদ্র পার হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণপদপ্রান্তে তাঁর যথার্থ অধ্যাত্মজীবন শুরু হয়েছে। আর নরেন্দ্রনাথ যে এমন কথা অন্তর থেকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন, সেকথা জেনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমপ্রসন্নতার আনন্দরূপ ওই 'Thank you' উচ্চারণ।

অবশ্য 'কথামৃতে' বিধৃত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলাপচারীতে কালানুক্রমিক-ভাবে দেখলে এর আগে সুরেন্দ্রের আত্মীয় কৃতবিদ্য বৈদ্যনাথের সঙ্গে আলাপ-প্রসঙ্গেও 'Thank you'-র ব্যবহারটি লক্ষণীয়। সেদিন (১৫ই এপ্রিল, ১৮৮৩) কথাপ্রসঙ্গে বৈদ্যনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন—'তর্ক করা ভাল নয়, আপনি কি বলো?'

"বৈদ্যনাথ—আজ্ঞে হাঁ, তর্ক করা ভাবটি জ্ঞান হলে যায়।

'শ্রীরামকৃষ্ণ—Thank you. (সকলের হাস্য) তোমার হবে।"

এ দুই উদাহরণে শ্রোতার অন্তরে সত্যগ্রহণের উন্মুখতাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

অভিনন্দনমূলক ধন্যবাদের কারণ, কিন্তু প্রয়োগের দিক থেকে সৌজন্যে ও সহৃদয়তায় বিশিষ্ট প্রয়োগ। তবে ভাবব্যঞ্জনায় প্রথম উদাহরণটিই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দপ্রসঙ্গে সমধিক স্মরণীয়।

ইংরেজীশিক্ষিত লোকদের রামকৃষ্ণদেব কখনো কখনো Englishman (ইংলিশম্যান) বলতেন—যেমন দেখি কথামৃতের দ্বিতীয় খণ্ডে। "মণি ঠাকুরের কাছে প্রায় দুইবৎসর আসিতেছেন। তিনি ইংরাজী পড়েছেন। ঠাকুর তাঁহাকে কখন কখন ইংলিশম্যান বলিতেন।" [৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩]

এই ইংরেজীনবীশদের মধ্যে কেউ 'তিনটে পাস' (pass) কেউ 'আড়াইটে'। বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষা প্রবর্তিত হবার পর পাসকরা বিদ্যার তক্‌মা তখন সামাজিক মর্যাদা বা চাকুরিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলেছে। পাসকরা বিদ্বান সন্তানদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যেমন অনুরাগ, তেমনি অনুরাগ পরীক্ষায় ফেলকরা ভক্তের প্রতি। একান্ত স্নেহের বাবুরাম প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করেছে শুনে বলছেন—"ভালই তো, ও পাশমুক্ত হল। যার যটা পাস তার তটা পাশ।' পরীক্ষা পাশ যে আর একদিক থেকে সংসারপাশ হয়ে দেখা দেয়, সে কথাটি এই ত্যাগিশ্রেষ্ঠের বাণীতেই আমরা মনে রাখতে পারি।

সেকালের ইংরেজী পড়ুয়াদের বোলচাল দেখে অভ্যস্ত রামকৃষ্ণদেবের উপমায়ও এদের কথা এসে পড়েছে। মানবজীবনে সঙ্গগুণের প্রভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একদিন ব্রাহ্মভক্তদের বলছেন—"মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙে ছোপাবে সেই রঙে ছুপবে।···দেখ না, যদি একটু ইংরাজী পড়, তো অমনি মুখে ইংরাজী কথা এসে পড়ে। ফুট-কাট। ইট-মিট (সকলের হাস্য)। আবার পায়ে বুটজুতা, শিস্ দিয়ে গান করা—এই সব এসে জুটবে।···"

[কথামৃত · ১ম ভাগ : ২৭শে অক্টোবর ১৮৮২]·

অল্প কথার আঁচড়ে সেকালের ইংরেজী শিক্ষাভিমানীদের ধরণধারণ সুন্দর ফুটেছে, একটু অদলবদল করে নিলে একালের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। সেকালের বাবুদের ঈশ্বরপ্রীতিতেও বিলিতি ঢঙ্-মাখানো। বিষয়ীদের ক্ষণ-কালের ঈশ্বরচিন্তার উপমায় তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক আশ্চর্য জীবন্ত ছবি এঁকেছেন—"···যেমন কোন ফিট্‌বাবু পান চিবুতে চিবুতে, ষ্টিক হাতে করে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি ফুল তুলে বন্ধুকে বলে—ঈশ্বর কি বিউটিফুল (beautiful-সুন্দর) ফুল করেছেন।' (কথামৃত : ১ম :) ফিট্‌বাবুর ফিট্

এসেছে ইরেজী fit থেকে। বাংলায় অনুকার শব্দযোগে তা হয়েছে ফিট্‌ফাট, আর সমাসবদ্ধ হয়ে ফিট্‌বাবু। লক্ষণীয়, ফিট্‌বাবুর বর্ণনার সঙ্গে ষ্টিক (লাঠি) হাতে বিউটিফুল (সুন্দর) ফুল দেখার বর্ণনায় তিনটি ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত।

জগৎসত্যকে যিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন, তাঁর কাছে সুখদুঃখ ভালোমন্দ সবই অনন্ত ইচ্ছাময়ের অভিব্যক্তি। বাজিকর আর বাজিকরের খেলা। শ্রীবামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতে—"বাজিকরই সত্য। তাঁর খেলা সব অনিত্য—স্বপ্নের মত।"

বিশ্বসত্যের এই মায়ারূপ যিনি দেখেন, তিনিও সেই বাজিকরেরই সৃষ্টি, তাঁরই ইচ্ছায় দেখছেন। একথাটি বোঝাতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, "হাজার বাজী ত্যাখো, তবু তাঁর অণ্ডরে (under) (অধীনে)। পালাবার জো নাই, তুমি স্বাধীন নও। তিনি যেমন করান তেমনি করতে হবে। যতক্ষণ একটু আমি থাকে ততক্ষণ সেই আদ্যাশক্তির এলাকা। তাঁব অণ্ডরে—তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার যো নেই।" [২০শে জুন, ১৮৮৪ : কথামৃত : ৪র্থ ভাগ]

সেকালের শিক্ষিত সমাজে স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) এবং পরোপকার ও মানবসেবামূলক মতবাদগুলির প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই 'under-এ'—অণ্ডরে—শব্দপ্রয়োগটি লক্ষণীয়। বিদ্যাসাগরেব অন্তরে সাত্ত্বিক দয়া—সেও ঈশ্বরেরই প্রেরণা। জগতের উপকার যে মানুষে করে না ঈশ্বরই করেন, সে কথাটি মনে করিয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—'তাঁব অণ্ডরে'।

"ইংলিশম্যানরা[১] যাকে স্বাধীন ইচ্ছা (Free will)[২] বলে, সেই স্বাধীন ইচ্ছা বোধ তিনিই দিয়ে রাখেন।"—এই বাক্যবন্ধে ইংরেজি শব্দ 'ফ্রি উইল' যেভাবে স্বাধীন ইচ্ছায় রূপান্তরিত হয়েছে, তা শ্রীবামকৃষ্ণদেবের ইংরেজি ভাষা-অনুধাবন-শক্তির আশ্চর্য উদাহরণ। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য—"যাঁরা তাঁকে লাভ করেছে, তাঁরা জানে দেখতেই 'স্বাধীন ইচ্ছা'—বস্তুত: তিনিই যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। তিনি ইঞ্জিনীয়ার,[৩] আমি গাড়ী।" উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারাকে একটু অন্যভাবে তিনি স্বীকার করেছেন। তাঁব মতে এই

১ Englishman : ইংবেজ এখানে ইংবেজী পণ্ডিত অর্থে ব্যবহৃত।

২ Free will : ফ্রি উইল ইংরেজী শব্দটি অনুলেখক মহেন্দ্রনাথকর্তৃক ব্যবহৃত। শ্রীবামকৃষ্ণদেবেব প্রয়োগ নয়।

৩ Engineer : যন্ত্রবিদ, এখানে যন্ত্রী।

স্বাধীন ইচ্ছার অভিমান মানুষের যথেচ্ছাচার-নিবারণেরই প্রয়োজনে। নইলে "পাপের আরও বৃদ্ধি হত।" [কথামৃত : ৪র্থ ভাগ : ৫ই জানুয়ারী, ১৮৮৪]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দগুলি অবলম্বনে সেকালের পাশ্চাত্য-প্রভাবিত কলকাতার নানা ছবি আমাদের মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হতে পারে, যার সঙ্গে আজকের কলকাতারও অনেকখানি যোগ। প্রথমেই ধরুন, সেকালের ধর্ম ও সমাজ-বিষয়ক আন্দোলনে মুখরিত কলকাতায় অজস্র বক্তৃতার আয়োজন, লেকচার (lecture) দেওয়ার দিকে সেকালে শিক্ষিত সমাজের প্রবল ঝোঁক। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা (বিশেষভাবে তাঁরই সামনে দেওয়া) রামকৃষ্ণদেব আগ্রহভরে শুনেছিলেন। কিন্তু যথার্থ বক্তৃতা যে ঐশ্বরিক প্রেরণাতেই সম্ভব এ বিষয়ে তিনি নানাভাবেই অভিমত ব্যক্ত করেই গেছেন। তাই বক্তৃতা বা লেকচারের দিকে সেকালের শিক্ষাভিমানীদের অতিমাত্রায় ঝোঁকের প্রতি তাঁর সমালোচনা আজকের দিনের বক্তাদেরও স্মরণীয়।

'কথামৃত'কার তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনের দ্বিতীয় দিনটিতে (কথামৃত : ১ম ভাগ : ১৮৮২—ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে) এ বিষয়ে একটি আলাদা বিভাগই করেছেন—'লেকচার (lecture) ও শ্রীরামকৃষ্ণ'। কথা উঠেছিল সাকার-নিরাকারে বিশ্বাস নিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রশ্ন—"আচ্ছা, তোমার সাকারে বিশ্বাস, না নিরাকারে?" মাস্টার—"আজ্ঞা নিরাকার—এইটি আমার ভাল লাগে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুনে অনুমোদন করলেন এবং সেইসঙ্গে বললেন—"তবে এ বুদ্ধি করো না যে, এইটি কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য।"…তখনকার ব্রাহ্ম পরিবেশের প্রভাবে শিক্ষাভিমানী মাস্টারমশাই দুটিই সত্য—একথা সহজে মানতে পারলেন না। মাটির প্রতিমা কেমন করে সত্য হবে? শুনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, "মাটি কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।" একথার অর্থ অনুধাবন করা মাস্টারমশাইয়ের পক্ষে তখনই সম্ভব হয় নি। স্বভাবসারল্যে বলে ফেলেছিলেন—"আচ্ছা, যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের ত বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পূজা করো; মাটিকে পূজা করা উচিত নয়।" এর পরের অংশটুকুর নাম 'লেকচার ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) "তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক। কেবল লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায় তার

ঠিক নাই, তুমি বুঝাবার কে? যাঁর জগৎ তিনি বুঝাবেন।"...এ প্রসঙ্গের শেষে মায়ের উদাহরণ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যার পেটে যা সয় বা অধিকারীভেদে উপাসনায় বৈচিত্র্যের কথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ ইঞ্জিনীয়ার বা যন্ত্রীকে মনে থাকে না বলেই আমরা বাক্‌যন্ত্রের ব্যবহারে সদা সমুদ্যত। কথার ইঞ্জিনে দম দিয়ে থাকার ফলই কথায় কথায় লেকচারের প্রবণতা।

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাপ্রসঙ্গেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরোপলব্ধির গভীরতাপ্রসঙ্গে এই লেকচারের অসম্পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর ভাষায়—[শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্দেশ্যে] "হ্যাঁগা, তোমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য এত বর্ণনা কর কেন? আমি কেশব সেনকে ঐ কথা বলেছিলাম। একদিন তারা সব ওখানে গিছিল। আমি বললুম, তোমরা কি রকম লেকচার দাও, আমি শুনবো। তা গঙ্গার ঘাটের চাঁদনীতে সভা হল, আর কেশব বলতে লাগল। বেশ বললে, আমার ভাব হয়ে গিছিল। পরে কেশবকে আমি বললুম, তুমি এগুলো এত বল কেন?—'হে ঈশ্বর, তুমি কি সুন্দর ফুল করিয়াছ, আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ',—এই সব? যারা নিজে ঐশ্বর্য ভালবাসে তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে ভালবাসে।..."

[কথামৃত : ১ম : ২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২]

ঈশ্বরপ্রসঙ্গ যে অধিকারীভেদে করা প্রয়োজন, একথা তথাকথিত লেকচার-দাতা বা বক্তার দল মনে রাখেন না। শশধর পণ্ডিতকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—"হাজার লেকচার দাও, বিষয়ী লোকদের কিছু করতে পারবে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়?...তোমার লেকচারে বিষয়ী লোকের বড় কিছু হচ্ছে না। তবে তুমি ক্রমে ক্রমে জানতে পারবে।..." (কথামৃত : ১ম : ২৫শে জুন, ১৮৮৪)

আগে সাধনা, অনুভব, তারপর তার প্রকাশ। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ বক্তৃতাই তো আত্মপ্রচার, আত্মচিন্তন নয়! আমেরিকায় বক্তৃতার ঝড় তুলতে তুলতে স্বামীজী কিন্তু অনুভব করেছিলেন, 'বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।' তাঁর সব বাণীরই উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। তাঁর লেকচার বা বক্তৃতা তাই মানবজাতির জাগরণের উদ্দেশ্যে চিরকালের জন্য ধ্বনিত।

সেকালের নবীন প্রবীণ যেসব ইংরেজীনবীশ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যাতায়াত করতেন, তাঁদের কথায় ফিলসফি (Philosophy) (দর্শন) আর সায়েন্স

(Science) (বিজ্ঞান) শব্দ দুটি তিনি বহুবার শুনেছেন। পুথিপড়া বিদ্যা অথবা বস্তুগত জ্ঞান যে সীমাবদ্ধ সেকথা বারবার মনে করিয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শিক্ষাভিমানীদের তথাকথিত পাণ্ডিত্যের অহমিকা দূর করতে সর্বদা সচেষ্ট।

বুদ্ধিগত পাণ্ডিত্য পরমসত্যের অনুভবের ক্ষেত্রে নিতান্ত অর্থহীন প্রলাপ মনে হয়। সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসুকে বলছেন, "তোমার ফিলজফিতে কেবল হিসাব কিতাব করে! কেবল বিচার করে। ওতে তাঁকে পাওয়া যায় না।" (কথামৃত : ৪র্থ : ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩) শশধর পণ্ডিতকে একদিন মনে করিয়ে দিয়েছিলেন—"গুচ্ছির শাস্ত্র পড়লে কি হবে? ফ্যালাজফী!" (কথামৃত : ৩য় : ৩০শে জুন ১৮৮৪) শব্দবৈচিত্র্যে এই 'ফ্যালাজফী' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হাস্যভঙ্গিমার এক অনবদ্য প্রকাশ! উপলব্ধির অতল সমুদ্রে যারা ডুবেছে, তারা বিচার বিতর্কেব পর্যায় ছাড়িয়ে যায়, তখনই সত্যের উদ্ভাসন।

ফিলসফি (দর্শন) বা সায়েন্স (বিজ্ঞান) প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি এসব ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিব প্রসঙ্গেই স্মরণীয়। বিচার বিতর্কে বা বস্তু-বিদ্যাতেই যাঁরা জ্ঞানের সার্থকতা খোঁজেন, তাঁদের প্রসঙ্গেই এ সব কথা প্রযোজ্য। কিন্তু বহিরঙ্গ বিজ্ঞান প্রসঙ্গে তাঁর বিভিন্ন সময়ের উক্তি আমাদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে দৃষ্টিকে আরো সজাগ করে। যেমন ধরুন, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আলাপচারীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্তব্য—"কেউ কেউ মনে করে শাস্ত্র না পড়লে, বই না পড়লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তারা মনে করে, আগে জগতের বিষয়, জীবের বিষয়, জানতে হয়, আগে সায়েন্স (Science) পড়তে হয়। তারা বলে ঈশ্বরের সৃষ্টি এ সব না বুঝলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তুমি কি বল? আগে সায়েন্স না আগে ঈশ্বর?" (কথামৃত : ৫ম : ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪)

'দেবী চৌধুরাণী'র শিক্ষাব্যবস্থা মনে করলেই অনুশীলনতত্ত্বের প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু পরমজ্ঞানের পক্ষে এজাতীয় বিদ্যাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আদৌ প্রয়োজনীয় মনে করেন নি। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের মতো বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গেও তাঁর ঐ কথা—"শিবনাথ বলেছিল, বেশী ঈশ্বর চিন্তা করলে বেহেড[১] হয়ে যায়। বলে জগৎ-চৈতন্যকে চিন্তা করে অচৈতন্য হয়।...আর তোমার Science (সায়েন্স বা বিজ্ঞান)—এটা মিশলে

১ বেহেড—আরবী বে ও ইংরেজী হেড্ (Head) শব্দের মিশ্রণে উৎপন্ন। বিকৃতমস্তিষ্ক অর্থে বাংলাভাষায় ব্যবহৃত।

ওটা হয়, ওটা মিশলে এটা হয়, ওগুলো চিন্তা করলে বরং বোধশূন্য হতে পারে, কেবল জড়গুলো ঘেঁটে!" (কথামৃত : ৩য় : ৩০শে অক্টোবর, ১৮৮৫)

বস্তুবিজ্ঞান প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আর একটি মন্তব্য—"ঈশ্বরকে দেখা যায়; তপস্যা করলে তাঁর কৃপায় ঈশ্বর দর্শন হয়। ঋষিরা আত্মার সাক্ষাৎকার করেছিলেন। সায়েন্স এ ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না, তাতে কেবল ওটার সঙ্গে এটা মিশলে এই হয়, এই সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসের খবর পাওয়া যায়। তাই এ বুদ্ধির দ্বারা এ সব বুঝা যায় না। সাধুসঙ্গ করতে হয়।"

(কথামৃত : ৫ম : ২৪শে মে, ১৮৮৪)

বস্তুবিজ্ঞানের ঐক্যানুসন্ধান যখন আত্মোপলব্ধির ঐক্যানুভবে পূর্ণতা লাভ করে তখনই তা অধ্যাত্মবিজ্ঞানে পরিণত। তার আগে অবধি সায়েন্স বা বিজ্ঞান-চর্চা একান্ত বহিরঙ্গ সত্যসন্ধান। কথায় কথায় এ যুগে বিজ্ঞানের উপর নির্ভরতার বিপরীত মেরুতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'আগে ঈশ্বর লাভ, তার পরে সৃষ্টি'-জাতীয় সিদ্ধান্তের নিশ্চিন্ত প্রত্যয় আমাদের বিজ্ঞান বা সায়েন্স সম্বন্ধে সচকিত করে। বিশেষতঃ বস্তুবাদীরা (মার্কসবাদীরা তাঁদের অন্যতম) যখন বস্তু থেকে চৈতন্যের উদ্ভবের কথা একেবারে নিশ্চিত হয়ে ঘোষণা করতে চান, তখন একথা মনে রাখেন যেন, এ মতবাদও বৈজ্ঞানিক প্রমাণসাপেক্ষ।

ঈশ্বরপ্রসঙ্গে অনভিজ্ঞদের এ বিষয়ে মতামত সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ অপূর্ব পরিহাসের ভঙ্গীতে মহেন্দ্রনাথ সরকার-প্রমুখদের সেই ইংরেজী লেখাপড়া-জানা খবরের কাগজের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী লোকটির গল্প শুনিয়েছিলেন।

সেদিন অবতার প্রসঙ্গে কথা উঠেছিল। মহেন্দ্রলাল কিছুতেই অবতার মানবেন না। ওদিকে গিরিশ ঘোষ প্রমুখেরা অবতারবাদে একান্ত বিশ্বাসী। এ বিতর্কের মাঝখানে হাসতে হাসতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন—"ঈশ্বর অবতার হতে পারেন, একথা যে ওঁর 'সায়েন্স'-এ নাই। তবে কেমন করে বিশ্বাস হয়?" (সকলের হাস্য) (কথামৃত : ১ম : ২২শে অক্টোবর, ১৮৮৫)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই ভাষায়—'সুতোর ব্যবসা না করলে সুতার প্রভেদ বুঝা যায় না।'

ইংরেজী জানা অনেক লোকই শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের আকর্ষণে সমবেত হতেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা তো ছিলই; কেশবচন্দ্র, প্রতাপ মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতিরাও ছিলেন। যাঁরা যথার্থ জিজ্ঞাসু, বিনয়ী—তাঁদের প্রতি

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসন্নতা নানা কথায় ফুটে উঠতো। কারু কারু পরিচয় দেবার সময় সে ক'টি পাস, সেকথা নিজেই উল্লেখ করতেন। 'কথামৃত'-সংকলয়িতা মহেন্দ্রনাথ নিজের নানা ছদ্মনামের মধ্যে 'মণি' নাম দিয়ে যেখানে যেখানে উল্লেখ করেছেন, তারই এক জায়গায় রয়েছে—"ঠাকুর তাঁহাকে কখন কখন ইংলিশম্যান্ (Englishman) বলিতেন।"

(কথামৃত : ২য় : ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩)

ইংলিশম্যান এখানে ইংরেজী বিদ্যায় সুপণ্ডিত অর্থেই গ্রহণীয়। এক হিসাবে তা আধুনিক পাশ্চাত্যভাবাপন্ন মানুষদেরই প্রতীক। কিন্তু মহেন্দ্রনাথের প্রতি ইংলিশম্যান সম্বোধনের মধ্যে যে সস্নেহ প্রশ্রয় ও প্রশংসা রয়েছে, তা গুণগ্রাহী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাববৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। মহেন্দ্রনাথ আত্মবিশ্লেষণে লিখেছেন —"তিনি (মণি) কেশব ও অন্যান্য পণ্ডিতদের লেকচার শুনিতেন, ইংরাজী দর্শন ও বিজ্ঞান পড়িতে ভালবাসেন। কিন্তু ঠাকুরের কাছে আসা অবধি ইউরোপীয় পণ্ডিতদেব গ্রন্থ ও ইংরাজী বা অন্য ভাষায় লেকচার তাঁহার আলুনি বোধ হয়েছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাসংগ্রহে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দ অবলম্বনে আমরা সেকালের শিক্ষিত-সমাজের মানসচিত্রটি অনেক পরিমাণে দেখতে পাই। এই শিক্ষিত-সমাজের আনাগোনা শুরু হয় প্রধানতঃ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের যোগাযোগের পর থেকে।

স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের 'গুরুভাব : দ্বিতীয়ার্ধে'র দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা উদ্ধৃত করেছেন—"কেশব সেনের আসবার পর থেকে তোদের মত 'ইয়ং বেঙ্গলে'র (Young Bengal—নব্য বঙ্গ বা তরুণ বাঙালী) দলই সব এখানে আসতে শুরু করেছে। আগে আগে এখানে কত সাধু-সন্ত, ত্যাগী-সন্ন্যাসী, বৈরাগী-বাবাজি সব আসত যেতো, তা তোরা কি জানবি?" স্বামী সারদানন্দ বা শরৎচন্দ্র—প্রমুখ স্কুল-কলেজের তরুণ ছাত্রদল এবং অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বা মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—এই সব ইংরেজী-শিক্ষিতদের সংস্পর্শে এসেই যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইংরেজীশব্দ বেশী ব্যবহার করতেন, সেকথা তাঁর কথাসংগ্রহে স্পষ্টই প্রতিভাত।

এই 'ইয়ং বেঙ্গল' বা নব্য বঙ্গদের নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর শেষ অসুখের সূচনা-সময়ে পাণিহাটিতে 'চিড়ার মহোৎসবে' যোগদান করতে গিয়েছিলেন।

এ উৎসবে যোগদানের জন্য তাঁদের বলেছিলেন, "সেখানে ঐ দিন আনন্দের মেলা, হরিনামের হাট-বাজার বসে—তোরা সব 'ইয়ং বেঙ্গল', কখন ঐরূপ দেখিস্ নাই, চল দেখে আসবি।" (লীলাপ্রসঙ্গ : দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ)

'ইয়ং বেঙ্গল' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ ডিরোজিওর সুখ্যাত বা কুখ্যাত ছাত্রবৃন্দ সম্বন্ধে। পাশ্চাত্য শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাবে এই ছাত্রদলের আচার-আচরণে যে সংস্কারমুক্তির প্রচেষ্টা দেখা যেত, তাতে অনেক বাড়াবাড়ি ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ছাত্রদের উন্মার্গগামিতা যেমন সত্য, তেমনি সত্য পরবর্তীকালে স্বদেশের কল্যাণব্রতে এঁদের আত্মনিয়োগ। এঁদের অধিকাংশই পরিণত বয়সে গভীরভাবে ধর্মচিন্তার পথে অগ্রসর হয়েছেন। তবু সাধারণতঃ 'ইয়ং বেঙ্গল' শব্দটির ব্যঞ্জনা ছিল অবিশ্বাসী, উৎকেন্দ্রিক, স্বেচ্ছাচারী তরুণদল হিসাবে। সেই 'ইয়ং বেঙ্গল' ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্ম আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়, পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চারপাশে সমবেত হয়। নরেন্দ্রনাথ দত্ত এক হিসাবে সেকালের ইয়ং বেঙ্গলের অন্যতম প্রতিনিধি। শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে এই 'ইয়ং বেঙ্গল'-ই পরম সত্যের অনুসন্ধানী সর্বস্বত্যাগী তরুণদলে পরিণত।

ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থায় সেকালের তরুণমানসকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছিল পাশ্চাত্যদর্শন। এমন কি বিদ্যাসাগর পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে চেয়ে প্রাচ্যদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যদর্শনের পঠন-পাঠনের উপর সমধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এমন মন্তব্যও করেছিলেন যে,—"বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই।" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : পৃঃ ৩৫) অবশ্য এ সম্বন্ধে কোনো বিশদ যুক্তি দেননি। কিন্তু সাধারণভাবে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর চিন্তাধারা সম্বন্ধে এ থেকে ধারণা করা চলে। ব্রাহ্ম-আন্দোলন বা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারায় অবশ্য বেদান্তই সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে। যদিচ দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্য যথেষ্ট। সেকালের ইয়ং বেঙ্গলদের (পাশ্চাত্য) দর্শন বা ফিলসফি চর্চার প্রতি অতিমাত্রায় ঝোঁক বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বুদ্ধিগত, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ব্যাকুলতা সঞ্জাত নয়। স্বভাবতঃই এ জাতীয় দর্শনচর্চার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আস্থা ছিল না।

"তোমার ফিলজফিতে কেবল হিসাব কিতাপ করে!"

[কথামৃত : ৪র্থ : ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩]

উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক চিন্তাধারার যুক্তিসর্বস্বতা পরমসত্য থেকে আমাদের তরুণমানসকে বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারতো; সে সম্ভাবনাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর সাধনা ও উপলব্ধির দ্বারা এইভাবে সংযত করে আত্মস্থতার পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক গ্রন্থপাঠের চেয়ে একটু উপলব্ধি যে মহত্তর সত্য, সেকথা সেদিনের "ফ্যালাজফী"-চর্চাকারীদের মতো এ যুগের দর্শন-অনুরাগীদের পক্ষেও সমান স্মরণীয়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তা কিন্তু ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে আর এক অধ্যায়ের সূচনা।

কাণ্ট, হেগেল, শোপেনহাওয়ার, মিল, বেন্থাম, স্পেন্সার প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকবৃন্দের চিন্তায় প্রভাবিত তদানীন্তন তরুণ বঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই কাছে মানবজীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে ঈশ্বরলাভের কথা শুনলো। আগে ঈশ্বরলাভ, তার পরে তাঁর জীবজগতের রহস্য। আগে যদুমল্লিকের সঙ্গে আলাপ, তারপর তাঁর বিষয়সম্পত্তির বিবরণ। আগে আম খাওয়া, পরে তার সংখ্যাতত্ত্বের বিবরণ।

* * *

বিলেতফেরত লোকেদের শিক্ষিতসমাজে তখন বিশেষ উচ্চস্থান। কেশবচন্দ্র শুধু ইংলণ্ডে যাননি, স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার (Queen Victoria) সঙ্গে আলাপ করে এসেছেন। সে প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি—"…কেশব সেনকে কত লোকে গণে মানে, বিলাতে পর্যন্ত জানে—কুইন (রাণী ভিক্টোরিয়া) কেশবের সঙ্গে কথা কয়েছে!" (কথামৃত : ৪র্থ : ৫ই অক্টোবর, ১৮৮৪)

আবার অন্যত্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আধ্যাত্মিক উপমাই এই 'কুইন' থেকে জগজ্জননীর অনুধ্যানে উত্তীর্ণ—"অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে কি সকলে ধরতে পারে? কিন্তু নিত্যে উঠে যে বিলাসের জন্য লীলায় থাকে, তারই পাকা ভক্তি। বিলাতে কুইনকে দেখে এলে পর, তখন কুইন-এর কথা; কুইন-এর কার্য, এ সকল বর্ণনা করা চলতে পারে। কুইন-এর কথা তখন ঠিক ঠিক বলা হয়।"

[কথামৃত : ২য় : ১১ই মার্চ, ১৮৮৩]

ইংরেজশাসনে তখন রাণী ভিক্টোরিয়ার যুগ; কুইন বা রাণীর কথা সাধারণ মানুষেরও মুখে মুখে ফিরতো। কলকাতার বাবুসমাজ ও তরুণসমাজে কুইনের উপমাটি সুপ্রযুক্ত।

সেকালের ইংরেজিশিক্ষিত সমাজের গৃহসজ্জায় কুইন বা কুইনের ছেলের ছবি

প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের মন্তব্য—"দেখ, সাধু সন্ন্যাসীর পট ঘরে রাখা ভাল। সকালবেলা উঠে অন্ত মুখ না দেখে সাধু সন্ন্যাসীদের মুখ দেখে ওঠা ভাল। ইংরাজী ছবি দেওয়ালে—ধনী, রাজা, কুইন-এর ছবি—কুইন-এর ছেলের ছবি; সাহেব মেম বেড়াচ্ছে তার ছবি রাখা—এসব রজোগুণে হয়। যেরূপ সঙ্গের মধ্যে থাকবে সেরূপ স্বভাব হয়ে যায়।"

[কথামৃত : ২য় : ১১ই অক্টোবর, ১৮৮৪]

সমকালীন বাবুসমাজে সহজেই ব্যবহৃত হতো চিকিৎসাসংক্রান্ত হাসপাতাল (Hospital), ডিসপেন্সারী (Dispensary), ফিভর মিক্শ্চার (Fever Mixture), মেডিকেল কলেজ (Medical College) জাতীয় শব্দ। লোকমান্যের সঙ্গে ঈশ্বরশরণাগতির অনেক দূরত্ব। সেকথাটি বোঝাতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—"ইচ্ছা করে বেশী কাজ জড়ানো ভালো নয়,—ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়।···শম্ভুকে তাই বললুম, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়, তাঁকে কি বলবে কতকগুলো হাসপাতাল ডিস্পেন্সারী করে দাও ?"

[কথামৃত : ১ম : ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২]

সেকালে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতির পরিবেশে কবিরাজি ওষুধ ক্রমে অচল হয়ে আসছিল, এ্যালোপ্যাথির জ্বরের ওষুধ বা ফিবর মিক্শ্চারই তখন বেশী প্রচলিত। যুগোপযোগী সাধনা হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তিকেই নির্দিষ্ট করে বলছেন—"কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি!—শাস্ত্রে যে সকল কর্মের কথা আছে, তার সময় কৈ ? আজকাল জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়, আজকাল ফিবার মিক্শ্চার (Fever Mixture)." [কথামৃত : ১ম : ২৫শে জুন, ১৮৮৪]

জ্ঞান, কর্ম, যোগের চেয়ে ভক্তিকেই শ্রীচৈতন্য থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাধকেরা যুগধর্মরূপে গ্রহণ করেছেন। আর সমকালীন রোগযন্ত্রণায় ফিবর মিক্শ্চারের উপমাটি এই যুগোচিত সাধনপন্থারই প্রতীক হয়ে উঠেছে।

শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবিকাগত পরিচয়ে ডেপুটি (Deputy), মাষ্টার (Master), হেডমাষ্টার (Headmaster), জজ (Judge), প্রভৃতি শব্দ অধর সেন, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা অন্যান্যদের প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অনেক সময়ই ব্যবহার করেছেন। নেপালের রাজার উকিল রাজপ্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন কাপ্তেন (Captain)। চাকরিস্থল হিসাবে 'আফিস'

(Office) শব্দটিও অনেক সময়ই ব্যবহার করেছেন—'আফিসের কাজ' 'আফিসের হিসাবপত্র' ইত্যাদি। ম্যাজিষ্ট্রেট অর্থে বলতেন 'ম্যাজিষ্টর'।

জজ (Judge) শব্দটির ব্যবহারের দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্যকে নিপুণভাবে ফুটিয়েছেন 'কথামৃতে'র কয়েকটি ক্ষেত্রে। পিতৃবিয়োগে নরেন্দ্রনাথের নানা ঝঞ্ঝাট দেখা দিয়েছে—এ প্রসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে একদিন হাজরামশায় বলছেন—'নরেন্দ্র আবার মোকদ্দমায় পড়েছে।' শুনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, "শক্তি মানে না। দেহধারণ করলে শক্তি মানতে হয়।" তখন অবধি নিরাকার ব্রহ্মবাদী নরেন্দ্রনাথের অন্তরে ব্রহ্ম ও শক্তি দুই-ই মানা সম্বন্ধে সংশয় আছে। সেই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন—"...এখন শক্তিরই এলাকায় এসেছে। জজসাহেব পর্যন্ত যখন সাক্ষী দেয়, তাঁকে সাক্ষীর বাক্সে নেমে এসে দাঁড়াতে হয়।"

[কথামৃত : ৪র্থ : ৩রা আগস্ট, ১৮৮৪]

ঈশ্বরেব দিকে জীবের মন যায় না মায়ার প্রভাবে। সেকথা বোঝাতে গিয়ে আর একদিন বলেছিলেন, "কেন ঈশ্বরের দিকে (জীবের) মন যায় না? ঈশ্বরের চেয়ে তাঁর (মহামায়ার) আবার জোর বেশী। জজের চেয়ে প্যায়দার ক্ষমতা বেশী।" [কথামৃত : ৫ম : ৯ই মে, ১৮৮৫]

অহংকারপ্রসঙ্গে—'এই অহংকার আড়াল আছে বলে তাই ঈশ্বরকে দেখা যায় না। অহংকার করা বৃথা। এ শরীর, এ ঐশ্বর্য কিছুই থাকবে না। একটা মাতাল দুর্গাপ্রতিমা দেখছিল। প্রতিমার সাজগোজ দেখে বলছে, 'মা যতই সাজো-গোজো, দিনদুই পরে তোমায় টেনে গঙ্গায় ফেলে দিবে। (সকলের হাস্য) তাই সকলকে বলছি, জজই হও আর যেই হও, সব দুদিনের জন্য।"

[কথামৃত : ১ম : ১১শে অক্টোবর, ১৮৮৪]

ব্রহ্ম ও শক্তির সম্বন্ধ, জগৎরূপে শক্তির খেলা, অহংমুক্ত ঈশ্বরচেতনা—অধ্যাত্মতত্ত্বের এই বিভিন্ন দিকগুলি জজের উদাহরণ অবলম্বনে শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে কতখানি স্বচ্ছ হয়ে উঠতো তা সহজেই অনুমেয়।

সেকালের বাবুসমাজে বহুল প্রচলিত বিরক্তির প্রকাশরূপে ড্যাম্ (Damn) শব্দটির ব্যবহারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনবদ্য কৌতুকরসাত্মক গল্পটি স্মরণীয়। ইংরেজীভাষায় শব্দটি অধঃপাতে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত। ইংরেজপ্রভুদের কাছে বশংবদ বাবুরা এ শব্দটি অনেকবারই শুনতেন। সেই অভ্যাসটি ইংরেজী অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগের ফল—"একজন নাপিত কামাতে গিয়েছিল।

একজন ভদ্রলোক কামাচ্ছিল। এখন কামাতে কামাতে তার একটু লেগেছিল। আর সে লোকটি ড্যাম বলে উঠেছিল। নাপিত কিন্তু ড্যামের মানে জানে না। তখন সে ক্ষুরটুর সব সেখানে রেখে, শীতকাল, জামার আস্তিন গুটিয়ে বলে, তুমি আমায় ড্যাম্ বললে, এর মানে কি, এখন বল। সে লোকটি বললে, আরে তুই কামা না; ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে একটু সাবধানে কামাস। নাপিত সে ছাড়বার পাত্র নয়, সে বলতে লাগল, ড্যাম্ মানে যদি ভাল হয়, তাহলে আমি ড্যাম, আমার বাপ ড্যাম, আমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। (সকলের হাস্য) আর ড্যাম মানে যদি খারাপ হয়, তাহলে তুমি ড্যাম, তোমার বাবা ড্যাম, তোমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। (সকলের হাস্য) আর শুধু ড্যাম নয়। ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যা ড্যাম্ ড্যাম্।" (সকলের হাস্য)

এই ভাষাবিভ্রান্তির উদাহরণটি বলার উপলক্ষ্য অধর সেনের বাড়ীতে বঙ্কিমচন্দ্রপ্রমুখ অধর সেনের বন্ধুদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলাপচারী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ যখন একসময়ে একটু থেমেছে, তখন অধরের বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে ইংরেজীতে আলাপ করতে থাকেন। হঠাৎ এই ভাষান্তরে আলাপ দেখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই গল্পটি মনে পড়ে।

(কথামৃত : ৫ম খণ্ড : পরিশিষ্ট [ক])

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, বঙ্কিমাদির প্রতি)—"কি গো। আপনারা ইংরাজীতে কি কথাবার্তা করছো?" (সকলের হাস্য)

অধর—আজ্ঞে, এই বিষয়ে একটু কথা হচ্ছিল, কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যার কথা।" একটু আগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব রাধাকৃষ্ণতত্ত্বব্যাখ্যা করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, সকলের প্রতি)—"একটা কথা মনে পড়ে আমার হাসি পাচ্ছে। শুনো, একটা গল্প বলি।"—এইভাবেই 'ড্যাম্' শব্দ নিয়ে বিপত্তির গল্পটি এসেছিল। কিন্তু ওই সঙ্গে একথাও মনে হয় যে, কোনো বিশেষ ভাষায় অনভিজ্ঞ কেউ সামনে থাকলে, তার সামনে সর্বজনবোধ্য ভাষায় কথা বলাই শিষ্টাচার। সেকথা আমাদের ইংরেজীনবীশদের সবসময় মনে থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পটির মধ্যে কি সেদিকেও একটু কৌতুককটাক্ষ ছিল?

'কথামৃতে'র পাতায় পাতায় শ্রীরামকৃষ্ণব্যক্তিত্বের পরেই যে চরিত্রটি সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে, স্বাভাবিকভাবেই তিনি নরেন্দ্রনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় 'খাপখোলা তলোয়ার' এই চরিত্র, স্বভাবতঃই কারু মুখাপেক্ষী হতে

পারেন না। শ্রীরামকৃষ্ণসান্নিধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যে তরুণেরা তখন সমবেত হ'তেন, তাঁদের প্রসঙ্গে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, "নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, এরা সব নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ। দেখ না, নরেন্দ্র কাহাকেও কেয়ার (Care) (গ্রাহ্য) করে না। আমার সঙ্গে কাপ্তেনের গাড়ীতে যাচ্ছিল—কাপ্তেন ভাল জায়গায় বসতে বললে—তা চেয়েও দেখলে না। আমারই অপেক্ষা করে না।" আপাত অনপেক্ষ নরেন্দ্রনাথ অবশ্য একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেয়ার (গ্রাহ্য) করেছেন, সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণশক্তি শ্রীমা সারদাদেবীকেও। তবু তরুণ নরেন্দ্রনাথের দ্যুতিময় ব্যক্তিত্ব ওই 'কেয়ার' না করার ভঙ্গীতে অসামান্য সার্থকতা লাভ করেছে।

(কথামৃত : ১ম : ১৯শে আগস্ট, ১৮৮৩)

ইংরেজী শব্দ প্রয়োগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি বিশিষ্টতা 'ডাইলিউট' (Dilute) শব্দটির ক্ষেত্রে। গলে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত এই শব্দটি পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির ক্ষেত্রে তিনি যেভাবে প্রয়োগ করেছেন, তাতে ভক্তি-তন্ময়তার দ্বারা ব্যক্তিচরিত্রের সম্পূর্ণ রূপান্তরের ব্যঞ্জনা। পণ্ডিত শশধর সেদিন (কথামৃত : ৩য় : ৩০শে জুন, ১৮৮৪) দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে এসেছিলেন তাঁর অপূর্ব কথামৃতপানের আশায়। শ্রীরামকৃষ্ণকণ্ঠে মাতৃসংগীত শুনে চোখের জলে ভেসেছেন। এও শুনেছেন—'পড়ার চেয়ে শুনা ভাল,—শুনার চেয়ে দেখা ভাল।' শ্রীরামকৃষ্ণব্যক্তিত্বে তখন শাস্ত্রের সারাৎসার মূর্তিমন্ত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সব কথার শেষে ফিরে যাবার আগে পণ্ডিতকে আবার আসতে বলছেন, 'গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে দেখলে আহ্লাদ করে'। পণ্ডিত চলে যাওয়ার পর বলছেন, 'ডাইলিউট'[১] হয়ে গেছে একদিনেই! দেখলে কেমন বিনয়ী—আর সব কথা লয়!" শাস্ত্রলব্ধ বিদ্যার জীবনময় প্রকাশে সেদিন শশধর একান্ত জিজ্ঞাসু ভক্তে পরিণত!

আবার 'ডাইলিউট' কথাটি একান্ত বিষয়াসক্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথনে। একান্ত আপন প্রিয় বাল্যসঙ্গী শ্রীরাম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে—"সেদিন এসেছিল, দুদিন এখানে ছিল। শ্রীরাম বললে, ছেলেপিলে হয় নাই। ভাইপোটিকে মানুষ করছিলাম, সেটি মরে গেছে।

---

১ এ ঘটনার ছয়দিন আগে রথযাত্রার দিন পণ্ডিত শশধরের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের প্রথম দেখা হয়।

বলতে বলতে শ্রীরাম দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে···আবার বললে, ছেলে হয় নাই বলে স্ত্রীর যত স্নেহ ঐ ভাইপোর উপর পড়েছিল, এখন সে শোকে অধীর হয়েছে। আমি তাকে বলি, ক্ষেপী। আর শোক করলে কি হবে? তুই কাশী যাবি? বলে, 'ক্ষেপী'—একেবারে ডাইলিউট হয়ে গেছে। তাকে ছুঁতে পারলাম না। দেখলাম তাতে আর কিছু নাই।" সেদিনের শ্রোতাদের মধ্যে সদ্য কন্যাবিয়োগে ব্যথাতুরা 'শোকাতুরা ব্রাহ্মণী' অন্যতম। বিষয় সংসারে একান্ত মগ্ন ব্যক্তিদের যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কী চোখে দেখতেন, সেকথা মনে রেখে 'ঈশ্বরই সত্য'—এ আদর্শের অনুপ্রেরণাদানই সেদিনের কথোপকথনের লক্ষ্য।

(কথামৃত : ২য় : ১৩ই জুন, ১৮৮৫)

'কুইন' (Queen) এবং কোম্পানি[১] (Company) শব্দ দুটি সেকালে শাসকশ্রেণী প্রসঙ্গে প্রায়ই ব্যবহৃত হতো। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারত শাসনের ভার প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করেন রাণী ভিক্টোরিয়া। অবশ্য ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণী পার্লামেন্টের দ্বারাই পরিচালিত। তবু ভিক্টোরিয়া কুইন বা রাণী হিসাবে এ দেশে বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। মানুষ হিসাবে তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ইতিহাসস্বীকৃত।

শশধর পণ্ডিতের সঙ্গে পূর্বোক্ত আলোচনাপ্রসঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, 'তুমি তো গীতা পড়েছ—যাকে সকলে গণে মানে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।···তোমার ভিতর অবশ্য তাঁর শক্তি আছে।' 'শক্তি মানতে হয়।··· কুইন ভিক্টোরিয়ার এত মান, নাম কেন—যদি শক্তি না থাকতো?"

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে লোকে বলতো 'কোম্পানির আমল।' তখন রাজাদেশ অর্থে কোম্পানির আদেশ। এই কোম্পানির (Company) আদেশের কার্যকারিতাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টান্তস্থাপনের ও রঙ্গরসের অন্যতম সেরা উদাহরণ—"ও-দেশে হালদার পুকুর বলে একটা পুকুর আছে। পাড়ে রোজ সকালবেলা লোকে বাহ্যে করে রাখতো। যারা সকালবেলা আসে তারা খুব গালাগাল দেয়। আবার তারপর দিন সেইরূপ। বাহ্যে আর থামে না। (সকলের হাস্য)। তখন লোকে কোম্পানিকে জানালে। তারা একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিলে। সেই চাপরাসী যখন একটা কাগজ মেরে দিলে, 'বাহ্যে

১ কথামৃত : ৩য় ; ৩০শে জুন, ১৮৮৪

২ Company (East India Company—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি)

করিও না', তখন সব বন্ধ হলো। (সকলের হাস্য)" কোম্পানির আদেশ এ গল্পে ঈশ্বরাদেশের প্রতীক। ঈশ্বরাদেশ না পেলে প্রচার করতে যাওয়া যে বৃথা এই ছিল সেদিনের আলোচনার তাৎপর্য। মুখ্য শ্রোতা কেশবচন্দ্র।

(কথামৃত : ১ম : ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২)

সেকালে কোম্পানির কাগজ বা শেয়ার বিত্তশালী লোকদের অন্যতম সম্পদ। যারা বাবুর সম্পত্তি সম্বন্ধে কৌতূহলী, তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো উপায় বাবুর সঙ্গে আলাপ করা। যারা ঈশ্বরের সঙ্গেই আলাপ করেছে, তারাই তাঁর জগৎ-সংসারময় ঐশ্বর্যের সন্ধান পায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমায় 'কোম্পানির কাগজ' কথাটি দেখা দিয়েছে। "যদু মল্লিকের ক'খানা বাড়ি, কত কোম্পানির কাগজ আছে এ সব আমার কি দরকার! আমার দরকার, যো সো করে বাবুর সঙ্গে আলাপ করা।"

তাঁর ভাষায় ঈশ্বর কখনো 'বড়বাবু', কখনো 'গ্যাসকোম্পানী' (Gas Company) কখনো 'সার্জন'[১] (Sergeant)। "প্রার্থনা কর—সেই পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবেরই যোগ হতে পারে। গ্যাসের নল সব বাড়ীতেই খাটানো আছে। গ্যাস কোম্পানীর কাছ থেকে গ্যাস পাওয়া যায়। আরজি কর; করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে—ঘরেতে আলো জ্বলবে। শিয়ালদহে আপিস আছে।" (কথামৃত : ২য় : ৮ই এপ্রিল, ১৮৮৩)

"কৃপা হলেই দর্শন হয়। তিনি জ্ঞানসূর্য। তাঁর একটি কিরণে এই জগতে জ্ঞানের আলো পড়েছে, তবেই আমরা পরস্পরকে জানতে পারছি, আর জগতে কতরকম বিদ্যা উপার্জন করছি। তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজের মুখের উপর ধরেন, তাহলে দর্শন লাভ হয়। সার্জনসাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে করে বেড়ায়; তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখতে পায়; আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখতে পায়।

"যদি কেউ সার্জনকে দেখতে চায়, তা হলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়। বলতে হয়—সাহেব, কৃপা করে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফিরাও, তোমাকে একবার দেখি।"

---

১ Photo (কথামৃত দ্রষ্টব্য)

"ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর, কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।"

(কথামৃত : ১ম : ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮২)

ঈশ্বর আর ঈশ্বর-ধারণার যোগ্য অধিকারীপ্রসঙ্গে সেকালের আধুনিকতম বিজ্ঞানও দেখা দিয়েছে ফটো (Photo) এবং ফটোগ্রাফের (photograph) উপমায়। সাকার-পূজার অর্থ কি, এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার উত্তরে "যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমায় পূজা করতে করতে সত্যের রূপ উদ্দীপনা হয়।" (কথামৃত : ৪র্থ : ১লা জানুয়ারী, ১৮৮৩)

ঈশ্বরপ্রসঙ্গ যথার্থ ধারণার অধিকারীপ্রসঙ্গে—"যার কাঁচা ভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা, উপদেশ, ধারণা করতে পারে না। পাকা ভক্তি হলে ধারণা করতে পারে। ফটোগ্রাফের কাঁচে যদি কালি মাখান থাকে, তা হলে যা ছবি পড়ে তা রয়ে যায়। কিন্তু শুধু কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়ুক একটাও থাকে না—একটু সরে গেলেই যেমন কাচ, তেমনি কাচ। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না থাকলে উপদেশ ধারণা হয় না।" (কথামৃত : ১ম : ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮২)

আর একদিন প্রসঙ্গ ছিল—'এক ঈশ্বর, তাঁর নানা নাম।' 'সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়।' এই প্রসঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুকুরের উপমাটি বারে বারে কথামৃতে দেখা দিয়েছে। "...ভক্তেরা তাঁকেই নানা নামে ডাকছে; এক ব্যক্তিকেই ডাকছে। এক পুকুরের চারিটি ঘাট। হিন্দুরা জল খাচ্ছে এক ঘাটে বলছে জল ; মুসলমানরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে বলছে পানি ; ইংরেজরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে বলছে ওয়াটার ;[১] আবার অন্য লোক এক ঘাটে বলছে aqua (একোয়া)।[২]" (কথামৃত : ৫ম : ১৩ই আগস্ট, ১৮৮২) এই উদাহরণমালার মূল বক্তব্য—"তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে গড[৩], কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম।" (কথামৃত : ৩য় : ২১শে জুলাই, ১৮৮৩)

অধ্যাত্মপ্রসঙ্গে তন্ময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতে একসময় এই কলকাতা শহরই

---

১ Water

২ লাটিন শব্দ।

৩ God,

ঈশ্বরের প্রতীকস্বরূপ। কলকাতার মিউজিয়ম, মনুমেণ্ট, সোসাইটি (Asiatic Society), ফুটপাথ এ সবই নানাভাবে ঈশ্বরপ্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।

"আমি একবার মিউজিয়মে[১] গিছলুম; তা দেখালে ইট পাথর হয়ে গেছে, জানোয়ার পাথর হয়ে গিয়েছে। দেখলে সঙ্গের গুণ কি। তেমনি সর্বদা সাধুসঙ্গ করলে তাই হয়ে যায়।" (কথামৃত : ৫ম : ৯ই মার্চ, ১৮৮৪)

"ভক্ত, ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখতে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চায়, প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুশি হয় তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন। কলকাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়তে পারে, তাহলে গড়ের মাঠ, সুসাইটি, সবই দেখতে পায়। কথাটা এই, এখন কলকাতায় কেমন করে আসি।"

(কথামৃত : ১ম : ২৫শে জুন, ১৮৮৪)

এই কলকাতায় আসাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমায় ভগবানের কাছে আসা। ভাবতে আশ্চর্য লাগে বৈ কি!

এশিয়াটিক সোসাইটির যাদুঘরে কঙ্কাল দেখার সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একবার একটি প্রার্থনা মনে জেগেছিল। "অনেক দিন হলো যখন পেটের ব্যামোতে বড় ভুগছি, হৃদে বললে—মাকে একবার বল না, যাতে আরাম হয়। আমার রোগের জন্য বলতে লজ্জা হ'লো। বললুম—মা, সুসাইটিতে মানুষের হাড় দেখেছিলাম, তার দিয়ে জুড়ে জুড়ে মানুষের আকৃতি, মা! এরকম করে শরীরটা একটু শক্ত করে দাও, তা হলে তোমার নাম গুণকীর্তন করবো।"

(কথামৃত : ৩য় : ২রা মার্চ, ১৮৮৪)

ঈশ্বরকে জানলে সব জানা সম্ভব। যেমন, কলকাতায় যে এসেছে সেই জানে এখানকার কোথায় কি আছে! একজন প্রশ্ন করেছিলেন—'আচ্ছা, তিনি সাকার না নিরাকার?'

শ্রীরামকৃষ্ণ—'দাঁড়াও আগে কলকাতায় যাও তবে ত জানবে, কোথায় গড়ের মাঠ, কোথায় এশিয়াটিক সোসাইটি, কোথায় বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক!'

"খড়দা বামুনপাড়া যেতে হলে আগে ত খড়দায় পৌঁছুতে হবে।"

(কথামৃত : ৫ম : ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩)

আবার কলকাতার মনুমেণ্ট, তার উচ্চতা, সেই উচ্চতা থেকে নিচের দৃশ্য

১ মিউজিয়াম বা যাদুঘর তখন এশিয়াটিক সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এবং উর্ধ্বলোকের অবাধ মুক্তি এ সবই অধ্যাত্মরাজ্যের বিভিন্ন স্তরের ব্যঞ্জনা নিয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর মনোহর সংলাপে। "অনেকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কয়, কিন্তু নীচের জিনিস লয়ে থাকে। ঘর-বাড়ী, টাকা, মান, ইন্দ্রিয়সুখ। মনুমেণ্ট-এর নীচে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণ গাড়ী-ঘোড়া সাহেব মেম—এইসব দেখা যায়। উপরে উঠলে কেবল আকাশ, সমুদ্র, ধু-ধু কচ্ছে! তখন বাড়ী, ঘোড়া গাড়ী, মানুষ এ সব আর ভাল লাগে না; এ সব পিঁপড়ের মত দেখায়!"

(কথামৃত : ৫ম : ১লা জানুয়ারী, ১৮৮৩)

ঈশ্বরের জন্য চাই সম্পূর্ণ আসক্তিশূন্যতা; 'ষোল আনা মন', যে মনের আর এক উপমা সূচে পরাবার সুতো, যাতে এতটুকু আঁশ থাকবে না। এমন নিরাসক্তির উদাহরণেই এসেছে টেলিগ্রাফের তারের উপমা। "তুমি যদি ষোল আনার কাপড় চাও, তাহলে কাপড়ওয়ালাকে ষোল আনা তো দিতে হবে। একটু বিঘ্ন থাকলে আর যোগ হবার যো নাই। টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে, তাহলে আর খবর যাবে না।"

(কথামৃত : ২য় : ১১ই অক্টোবর, ১৮৮৪)

মনের এই গঠনপর্বে প্রয়োজন নির্জন নিঃসঙ্গ সাধনা। কলকাতার ফুটপাথের ধারে লাগানো চারাগাছের বেড়া থেকে শ্রীরামকৃষ্ণমানসে আর একটি উপমা দেখা দিলো—'ফুটপাতের[১] গাছ দেখেছ? যতদিন চারা, ততদিন চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। না হলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলবে। গাছের গুঁড়ি মোটা হলে আর বেড়ার দরকার নাই। তখন হাতী বেঁধে দিলেও গাছ ভাঙবে না।'

(কথামৃত : ১ম : ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩)

জ্ঞানলাভের পর যে মহাপুরুষেরা নিজের মুক্তিতে সন্তুষ্ট না থেকে মানুষের কল্যাণের জন্য অধ্যাত্মজ্ঞান বিতরণ করে যান, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমায় তাঁরা কলকাতার গঙ্গায় ভাসমান বাহাদুরি কাঠ বা স্টীমবোটের (Steamboat) মতো। "হাবাতে কাঠ যখন ভেসে যায়, পাখী একটি বসলে ডুবে যায়, কিন্তু বাহাদুরী কাঠ যখন ভেসে যায়, তখন গরু, মানুষ এমন কি হাতী পর্যন্ত তার উপর যেতে পারে। স্টীমবোট আপনিও পারে যায়, আবার কত মানুষকে পার

---

১ ইংরেজী Footpath কথাটির অর্থ পায়ে চলার পথ হিসাবে ব্যবহৃত। শহরাঞ্চলে গাড়ী-ঘোড়ার প্রয়োজনে যে রাজপথ, তার দুপাশে পায়ে চলার জন্য আলাদাভাবে উঁচু করে বাঁধানো পথ।

করে দেয়। নারদাদি আচার্য বাহাদুরী কাঠের মত, ষ্টীমবোটের মত।" (কথামৃত : ১ম : ২২শে অক্টোবর, ১৮৮৫) প্রসঙ্গত মনে জাগে বুদ্ধ, শংকর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ—এঁদের উপমা কি তবে জাহাজ ? না এরোপ্লেন ?

এমনিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথনে আরো অনেক ইংরেজী শব্দই হয়তো সন্ধান করলে পাওয়া যাবে। ভাষাতত্ত্বের বিচারে আপাতত সাধারণ মানুষের ভাষায়ও বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশের দৃষ্টান্ত হিসাবে এরা নিশ্চয়ই কৌতূহলের সামগ্রী। কিন্তু ইংরেজীশব্দ ব্যবহারের এইসব উদাহরণে তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে অধ্যাত্ম পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন সেইটিই সাহিত্যের বিচারে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাঁর সান্নিধ্যে এসে কেশবচন্দ্রের পরিবর্তন প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন বলেছিলেন, 'কেশব সেন এত বদলালো কেন বল দেখি ? এখানে কিন্তু খুব আসতো।' এ পরিবর্তনের গূঢ়তম কারণ যে তিনি নিজে, সেই কথার আভাস দিয়ে বলছেন, 'হরিশ বেশ বলে, এখান থেকে সব চেক (Cheque) পাশ করে নিতে হবে, তবে ব্যাঙ্কে টাকা পাওয়া যাবে।'… মণি অবাক হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন। বুঝিলেন, গুরুরূপে সচ্চিদানন্দ চেক পাশ করেন।" (কথামৃত : ২য় : ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩) শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ভাষার প্রসাদে ইংরেজীভাষারও চেক পাশ হয়ে গেছে।